বিপিনের সংসার

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

বিপিন সকালে উঠিয়া কলাই-চটা পেয়ালাটায় সবে এক পেয়ালা চা লইয়া বসিয়াছে, এমনসময়ে দেখা গেল তেঁতুলতলার পথে লাঠি হাতে লম্বা চেহারার কে যেন হনহন করিয়াউহাদের বাড়ির দিকেই চলিয়া আসিতেছে।

বিপিনের স্ত্রী মনোরমা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিল, দেখ তো কে একটা মিনসে এদিকেআসছে!

বিপিন বলিল, জমিদারবাড়ির দরওয়ান গো—আমি বুঝতে পেরেছি—ডাকের ওপরডাক, চিঠি দিয়ে ডাক, আবার লোক পাঠিয়ে ডাক!

মনোরমা বলিল, তা এসেছ তো ধরো আজ দিন কুড়ি। ডাক দেওয়ার আর দোষ কি? বিপিনের বড় ভ্রাতৃবধূ এই সময় ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, পলাশপুর থেকে বোধ হয় লোক আসছে—এগিয়ে যাও তো ঠাকুরপো।

বিপিন বিরক্তমুখে চায়ের পেয়ালাটায় চুমুক দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া উঠানে গিয়াদাঁড়াইল এবং আগন্তুক লোকটির সঙ্গে দুই একটি কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় দিয়া একখানি চিঠি-হাতে সোজা রান্নাঘরে গিয়া মাকে বলিল, এই দেখ মা, ওরা আবার চিঠি লিখেছে—দু'দিনযে জিরোব তার উপায় নেই।

বিপিনের মা বলিলেন, তা তো এয়েছ বাপু, কুড়ি-বাইশ দিন কি তার বেশি! তাদের কাজের সুবিধের জন্যেই তো তোমায় রেখেছে? এখানে তুমিব'সে থাকলে তাদের চলে?

সকলের মুখেই ওই এক কথা। যেমনই মা, তেমনই স্ত্রী। কাহারও নিকটে একটু সহানুভূতি পাইবার উপায় নাই। কেবল 'যাও-যাও' শব্দ, টাকা রোজগার করিতে পারো—সবাই খুশি। তোমার সুখ-দুঃখ কেহই দেখিবে না।

বিরক্তির মাথায় বিপিন স্ত্রীকে বলিল, আর একটু চা দাও দিকি!

মনোরমা বলিল, চা আর হবে কি দিয়ে? দুধ যা ছিল সবটুকুদিয়ে দিলাম।বিপিন বলিল, র চা খাব। তাই করে দাও।

—চিনিও তো নেই, র চা-ই বা কেমন করে খাবে? —মাকে বল, ওঁর গুড়ের নাগরি থেকে একটু গুড় বের করে দিতে—তাই দিয়ে করো।

মনোরমা ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, মাকে তুমি বলো গিয়ে। বুড়ো মানুষ; দশমী আছে, দোয়াদশী আছে—ওই তো একখানা গুড়ের নাগরি, তাও চা খেয়ে খেয়ে আদ্ধেক খালি হয়েগিয়েছে। এখনও তিন মাস চললে তবে নতুন গুড় উঠবে—ওঁর চলবে কিসে? এদিকে তো নতুন এক নাগরি আখের গুড় কিনে দেবার কড়ি জুটবে না সংসারে। মায়ের কাছ থেকে রোজরোজ গুড় চাইতে লজ্জা করে না?

বিপিন আর কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার মনটা আজ কয়দিন হইতেইভাল নয়। প্রথম তো সংসারে দারুণ অনটন, তার উপর স্ত্রীর যা মিষ্টি বুলি! বেশ, সেপলাশপুরই যাইবে। আজই যাইবে। আর বাড়ি থাকিয়া লাভ কি? বাড়ির কেহই তেমন পছন্দকরে না যে সে বাড়ি থাকে।

এমন সময় বাহির হইতে গ্রামের কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী ডাকিয়া বলিলেন, বিপিন, বাড়ি আছহে?

বিপিন পাশের ঘরের উদ্দেশে বলিল, কেষ্টকাকা আসছেন, স'রে যাও। পরে অপেক্ষাকৃতসুর চড়াইয়া বলিল, 'আসুন কাকা আসুন, এই ঘরেই আসুন।'

কৃষ্ণলালের বয়স চুয়াল্লিশ বছর, কিন্তু চুল বেশি পাকিয়া যাওয়ায় ও অর্ধেক দাঁত পড়িয়াযাওয়ার দরুন দেখায় যেন ষাট বছরের বৃদ্ধ। তিনি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বলিলেন, ও কেএসেছিল হে, তোমার বাড়ি একজন খোট্টা-মতো?

—ও পলাশপুর থেকে এসেছিল। আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

—বেশ তো, যাও না। এখানে বসে মিছে কষ্ট পাওয়া—

—আহা, সেজন্যে না কেষ্টকাকা। পলাশপুরে বাবা যখন চাকরি করতেন, সে একদিন গিয়েছে। এখন প্রজা ঠেঙিয়ে খাজনা আদায় করার দিন নেই। অথচ টাকা না আদায় করতে পারলে জমিদারের মুখ ভার। আমি ধোপাখালির কাছারিতে থাকি; আর পলাশপুর থেকে ক্লাপ্তলোক আসছে; ক্লাপ্ত লোক আসছে,ক্লাপ্ত টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও—এই বুলি। বলুন দিকি, আদায় না হলে আমি বাপের বিষয় বন্ধক দিয়ে এনে তোমাদের টাকা যোগাব মশায় ?

কৃষ্ণ চক্রবর্তী বলিলেন, তোমার বাবার আমলের সেই পুরোনো মনিবই আছে তো? তারা তো জানে, তুমি বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে—তোমার বাপের দাপটে—

—জানে বলেই তো আরও মুশকিল। বাবা যে ভাবে খাজনা আদায় করতেন, এখনকারআমলে তা চলে না কাকা,—অসম্ভব। দিনের হাওয়া বদলেছে, এখন চোখ কান ফুটেছেসবারই। সত্যি কথা বলছি, আমার ও কাজ ভাল লাগে না। প্রজা ঠেঙাবারজন্যেও না—তাতে আমার তত ইয়ে হয় না, কিন্তু জমিদার আর জমিদারগিন্নি ঘৃণ একেবারে। কেবল 'দাও দাও' বুলি। না দিলেই মুখ ভার।

—তা আর কি করবে বলো! পরের চাকরি করার তো কোনো দরকার ছিল না তোমার, বিনোদদাদা যা করে রেখে গিয়েছিলেন—পায়ের ওপরে পা দিয়ে বসে খেতে পারতে—সবই যে উড়িয়ে দিলে! বিনোদদাদাও চোখ বুজলেন, তোমরাও ওড়াতে শুরু করলে! এখন আর হা-হুতাশ করলে কি হবে, বলো?

এ সব কথা বিপিনের তেমন ভাল লাগিতেছিল না। স্পষ্ট কথা কাহারও ভাল লাগে না।সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, সে যাক কাকা, আমায় একটা শশার চারা দিতে পারেন? আছে বাড়িতে?

এই সময় বিপিনের বিধবা বোন বীণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, দাদা, ডাকছে, একবাররান্নাঘরের দিকে শুনে যাও।

ইহার অর্থ সে বোঝে। সংসারে হেন নাই, তেন নাই—লম্বা ফর্দ শুনিতে হইবে—মানয়, স্ত্রীর নিকট হইতে। কৃষ্ণলাল বসিয়া থাকার দরুন মায়ের নাম দিয়া ডাক আসিতেছে।

বিপিন বলিল, বসুন কাকা, আসছি।

কৃষ্ণলাল উঠিয়া পড়িলেন, সকালবেলা বসিয়া থাকিলে তার চলিবে না, অনেক কাজ তার।

মনোরমা দালানের দোরে আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল, কেষ্টকাকার সঙ্গে বসে গল্প করলে চলবে তোমার?

—ঘুরিয়ে না ব'লে সোজা ভাবেই কথাটা বলো না কেন? কি নেই?

—কিছু নেই। এক দানা চাল নেই, তেল নেই, ডাল নেই, একটি আলু নেই। হাঁড়ি চড়বে না এ বেলা।

বিপিন ঝাঁঝের সঙ্গে বলিল, না চড়ে না চড়ুক, রোজ রোজ পারিনে। এক বেলা উপোস করে সব পড়ে থাক।

মনোরমা কড়াসুরে জবাব দিল, লজ্জা করে না এ কথা বলতে? আমি আমার নিজেরজন্যে বলিনি। মা কাল একাদশীর উপোস করে রয়েছেন, উনিও কি আজও উপোস করে পড়ে থাকবেন? সব কি আমার জন্যে

সংসারে আসে? ওই বীণারও গিয়েছে কালএকাদশী—ও ছেলেমানুষ, কপালই না হয় পুড়েছে, খিদেতেষ্টা তো পালায়নি তা বলে ?

মনোরমার যুক্তি নিষ্ঠুর...অকাট্য।

বিপিন বাড়ি হইতে বাহির হইয়া তেমাথার মোড়ের বড় তেঁতুলতলার ছায়ায় একখানাযে কাঠের গুঁড়ি পড়িয়া আছে, তাহারই উপর আসিয়া বসিল।

চাল নাই, ডাল নাই, এ নাই, ও নাই—সে তো চুরি করিতে পারে না! একটি পয়সা নাইহাতে, বাজারের কোনো দোকানে ধার দিবে না, বহু জায়গায় দেনা—উপায় কি এখন?

না, পলাশপুরেই যাওয়া স্থির। বাড়ির এ নরকযন্ত্রণার চেয়ে সে ভাল, দিনরাত মনোরমারমধুর বাক্যি আর কেবল 'নাই নাই' বুলি তো শুনিতে হইবে না। প্রজা ঠেঙানোর অনিচ্ছা ইত্যাদি বাজে ওজর, ও কিছু না, সে বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে, প্রজা ঠেঙাইতে পিছপাও না; কিন্তু আর একটা কথাও আছে তাহার সেখানে যাইবার অনিচ্ছার মূলে।

ধোপাখালি কাছারির তহবিল হইতে সে জমিদারদের না জানাইয়া চল্লিশটি টাকা ধার করিয়াছিল, তাহা আর শোধ দেওয়া হয় নাই। বিপিনের ভয় আছে, হয়তো এই ব্যাপারটা ধরাপড়িয়া গিয়াছে, সেই জন্যই জমিদারের এত ঘন ঘন তাগাদা তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য!

বিপিনের ছোট ভাই বলাই আজ চার-পাঁচ মাস অসুস্থ। তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্যই টাকা কয়টির নিতান্ত দরকার ছিল। বলাইকে রাণাঘাটে লইয়া গিয়া বড় ডাক্তারকেদেখানো হইয়াছে এবং এখন আগের চেয়ে সে অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে বলিয়া ডাক্তারআশ্বাস দিয়াছেন। বলাই বর্তমানে রাণাঘাটেই মিশনারি হাসপাতালে আছে।

২

পরদিন পলাশপুরে যাওয়ার পথে বিপিন রাণাঘাট হাসপাতালে গেল। স্টেশন থেকে হাসপাতাল প্রায় মাইলখানেক দূরে। বেশ ফাঁকা মাঠের মধ্যে। বলাই দাদাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

—দাদা, আমায় এখানে এরা না খেতে দিয়ে মেরে ফেললে, আমায় বাড়ি নিয়ে যাবে কবে? আমি তো সেরে গেছি, না খেয়ে মলাম; তোমার পায়ে পড়ি দাদা, বাড়ি কবে নিয়ে যাবে বলো।

—খেতে দেয় না তোর অসুখ বলেই তো। আচ্ছা আচ্ছা, পলাশপুর থেকে ফিরবারপথে তোকে নিয়ে যাব ঠিক। কি খেতে ইচ্ছে হয়?

—মাংস খাইনি কতদিন। মাংস খেতে ইচ্ছে হয়—বউদিদির হাতে রান্না মাংস—

—আচ্ছা হবে হবে। এই মাসেই নিয়ে যাব।

বিপিন আড়ালে নার্সকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার ভাই মাংস খেতে চাইছে—একটু আধটু—নার্স এদেশী খ্রিস্টান, পূর্বে কৈবর্ত্য ছিল, গোলগাল, দোহারা, বেশি বয়েস নয়— ভ্রূকুটি করিয়া বলিল, মাংস খেয়ে মরবে যে! নেফ্রাইটিসের রুগী, অত্যন্ত ধরাকাঠের মধ্যে না রাখলেযা একটু সেরে আসছে, তাও যাবে—মাংস!

বৈকালের দিকে পাঁচ মাইল পথ হাঁটিয়া বিপিন পলাশপুরে পৌঁছিল।

বিপিনের বাবা ৺বিনোদ চাটুজ্জে এখানে কাজ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং বিপিনের জমিদারবাড়ির সর্বত্র অবাধ গতি। সে অন্দরে ঢুকিতেই জমিদার-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, আরেএসো এসো বিপিন, কখন এলে? তারপর, তোমার ভাই এখনও সেই হাসপাতালেই রয়েছে? কেমন আছে আজকাল?

জমিদার অনাদি চৌধুরী বিপিনের গলার স্বর শুনিয়া দোতলা হইতে ডাক দিয়া বলিলেন, ও কে? বিপিন না ? এলে এতদিন পরে? দশ দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়ে করলে দু'মাস! এরকম করে কাজ চলবে? দাঁড়াও, আমি আসছি।

বিপিন জমিদার-গৃহিণীকে প্রণাম করিল। গৃহিণীর বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে, রং ফর্সা, মোটাসোটা চেহারা, পরনে চওড়া লালপাড় শাড়ি, হাতে দুই গাছা সোনার বালা ছাড়া অন্যকোনো গহনা নাই। তিনি বলিলেন, এসো এসো, বেঁচে থাক। তোমাকে ডাকার আরও বিশেষ দরকার, খুকিকে নিয়ে জামাই আসছেন বুধবারে। ঘরে একটা পয়সা নেই। ধোপাখালির কাছারি আজ দু'মাস বন্ধ। তাগাদাপত্র না করলে জামাই এলে একেবারে মুশকিলে পড়ে যেতে হবে।সেইজন্যে কর্তা তোমার ওখানে কাল লোক পাঠিয়েছিলেন তোমায় নিয়ে আসতে।

অনাদি চৌধুরী ইতিমধ্যে নামিয়া আসিয়াছিলেন। তার বয়স ষাটের উপর, বর্তমান গৃহিণীতার দ্বিতীয় পক্ষ। বাতের রোগী বলিয়া খুব বেশি নড়াচড়া করিতে পারেন না, যদিও শরীরএখনও বেশ বলিষ্ঠ। এক সময়ে দুর্দান্ত জমিদার বলিয়া ইহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল।

অনাদি চৌধুরী বলিলেন, খুকি আসছে বুধবারে। এদিকে ধোপাখালি কাছারি আজ দু'মাস বন্ধ। একটি পয়সা আদায়-তশিল নেই। তোমার কাণ্ডজ্ঞানটা যে কি, তাও তো বুঝিনে!তোমার বাবার আমলে এই মহল থেকে তিনশো টাকা ফি মাসে আদায় ছিল তার এখন সেই জায়গায় পঞ্চাশ-ষাট টাকা আদায় হয় না! তুমি কাল সকালেই চলে যাও কাছারিতে। মঙ্গলবার রাতের মধ্যে আমার চল্লিশটা টাকা চাইই, নইলে মান যাবে, জামাই আসছে এতকাল পরে, কিমনে করবে, আদর-যত্ন করব কি দিয়ে?

জমিদার-গৃহিণী বলিলেন, আর আসবার সময় কিছু কুমড়া, বেগুন, থোড় কিংবা মোচা আর 'যদি পারো ভাল মাছ একটা রঘুদের পুকুর থেকে, আর কিছু শাকসবজি আনবে।ঘানি-ভাঙানো সর্ষে তেল এনো আড়াই সের, আর এক ভাঁড় আখের গুড় যদি পাও—

বিপিন মনে মনে হাসিল। জমিদার-গৃহিণী যে এই সমস্ত আনিতে বলিতেছেন, সবই বিনামূল্যে প্রজা ঠেঙাইয়া! নতুবা পয়সা ফেলিলে জিনিসের অভাব কি, 'যদি পাও'কথারমানেই হইল 'যদি বিনামূল্যে পাও'—এমন ছোট নজর, আর এমন কৃপণ স্বভাব! পরের জিনিসএমনই যোগাইতে পারো, খুব খুশি! দায় পড়িয়াছে বিপিনের পরের শাপমন্যি কুড়াইয়া তাঁহাদের জন্যে বেসাতি আনিবার, এমনই তো ছোট ভাইটা হাসপাতালে পড়িয়া শুষিতেছে। এই সবজন্যই এখানকার চাকুরির অন্ন তাহার গলা দিয়া নামে না।

৩

পলাশপুর হইতে ধোপাখালির কাছারি আট ক্রোশ। নায়েবের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করিবেন।তেমন পাত্র নন অনাদি চৌধুরী—সুতরাং সারা পথ হাঁটিয়া সন্ধ্যার পূর্বে বিপিন কাছারি পৌঁছিল। কাছারি-ঘরে ক্যানেস্ত্রা-কাটা টিনের দেওয়াল, চাল খড়ের। স্থানীয় জনৈক নাপিতের পুত্র মাসিকবারো আনা বেতনে কাছারিতে ঝাঁটপাটের কাজকর্ম করে। বিপিন তাহাকে সংবাদ দিয়া আনাইল, সে ঘর খুলিয়া ঝাঁট দিয়া কাছারি-ঘরটাকে রাত্রিবাসের কতকটা উপযোগী করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু বিপিনের ভয় হইতেছিল, মেঝেতে যে রকম বড় বড় চারপাঁচটা ইঁদুরের গর্ত হইয়াছে, রাত্রিবেলা সাপখোপ না বাহির হয়!

চাকর ছোকরা একটি কাচভাঙা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরের মেঝেতে রাখিয়া বলিল, নায়েববাবু রাত্রে কি খাবা?

কিছু খাব না। তুই যা।

—সে কি বাবু! তা কখনও হতি পারে? খাবা না কিছু, রাত কাটাবা কেমন করে? একটুদুধ দেখে আসি পাড়ার মধ্যে, আপনি বসেন বাবু।

এই ছোকরা চাকর যে যত্ন করে, দরদ দেখায়, বিপিন অনেক আপনার লোকের কাছেও তেমন ব্যবহার পায় নাই, একথা তাহার মনে হইল।

অন্ধকার রাত্রি।

কাছারির সামনে একটু ফাঁকা মাঠ, অন্য সব দিকে ঘন বাঁশবন, এক কোণে একটা বড়বাদাম গাছ। অনাদি চৌধুরীর বাবা হরিনাথ চৌধুরী কাছারিবাড়িতে এটি শখ করিয়াপুঁতিয়াছিলেন, ফলের জন্য নয়, বাহার ও ছায়ার জন্য। বাঁশবনে অন্ধকার রাত্রে ঝাঁকে ঝাঁকেজোনাকি ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্রাকারে উড়িতেছে, ঝিঁঝি ডাকিতেছে, মশা বিন্ বিন্ করিতেছে কানেরকাছে—কাছারির কাছাকাছি লোকজনের বাস নাই—ভারী নির্জন।

বিপিন একা বসিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। কত কথাই মনে আসে!বাড়ি হইতে আসিয়া মন ভাল নয়, হাসপাতালে ছোট ভাইটার রোগশীর্ণ মুখ মনে পড়িল।মনোরমার ঝাঁঝাল টক-টক কথাবার্তা। সংসারে ঘোর অনটন। বাজারে হেন দোকান নাই, যেখানে দেনা নাই। আজ শনিবার, সামনের বুধবারে মহাল হইতে চল্লিশটা টাকা ও একগাদা ফল, তরকারিপত্র, মাছ, দই জমিদারবাড়ি লইয়া যাইতে হইবে জামাইয়ের অভ্যর্থনার যোগাড় করিতে। তিন দিনের মধ্যে এ গরিব গাঁয়ে চল্লিশ টাকা আদায় হওয়া দূরের কথা, দশটি টাকা হয় কিনা সন্দেহ—অথচ জমিদার বা জমিদার-গিন্নি তা বুঝিবেন না—দিতে না পারিলেই মুখভার হইবে তাঁদের। কি বিষম মুশকিলেই সে পড়িয়াছে! অথচ চিরকাল তাহাদের এমন অবস্থাছিল না। বিপিনের বাবা এই কাছারিতে এক কলমে উনিশ বছর কাটাইয়া গিয়াছেন, এইজমিদারদের কাজে। যথেষ্ট অর্থ রোজগার করিতেন, বাড়িতে লাঙল রাখিয়া চাষবাস করাইতেন, গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট নামডাক, প্রতিপত্তি ছিল।

বাবা চক্ষু বুজিবার সঙ্গে সঙ্গে সব গেল। কতক গেল দেনার দায়ে, কতক গেল তাহারই বদখেয়ালিতে। অল্প বয়সে কাঁচা টাকা হাতে পাইয়া কুসঙ্গীর দলে ভিড়িয়া স্ফূর্তি করিতে গিয়া টাকা তো উড়িলই, ক্রমে জমিজমা বাঁধা পড়িতে লাগিল।

তারপর বিবাহ। সে এক মজার ব্যাপার!

তখনও পর্যন্ত যতটুকুনামডাক ছিল পৈতৃক আমলের, তাহারই ফলে এক অবস্থাপন্ন বড়গৃহস্থের ঘরের মেয়ের সহিত হইল বিবাহ। মেয়ের বাবা নাই, কাকা বড় চাকুরি করেন, শালাশালীরা সব কলেজে-পড়া, বিপিন ইংরাজিতে কোনো রকমে নাম সই করিতে পারে মাত্র। মনোরমা শ্বশুরবাড়ি আসিয়াই বুঝিল বাহির হইতে যত নামডাকই থাকুক, এখানকার ভিতরেরঅবস্থা অন্তঃসারশূন্য। সে বড় বংশের মেয়ে, মন গেল তার সম্পূর্ণ বিরূপ হইয়া; স্বামীর সহিতসদ্ভাব জমিতে পাইল না যে, ইহাতে বিপিন মনেপ্রাণে স্ত্রীকে অপরাধিনী করিতে পারে কই?

—এই যে লায়েববাবু কখন আলেন? দণ্ডবৎ হই।

বিপিনের চমক ভাঙিল, আগন্তুক এই গ্রামেরই একজন বড় প্রজা, নরহরি দাশ, জাতিতেমুচি, শুয়োরের ব্যবসা করিয়া হাতে দু'পয়সা করিয়াছে।

বিপিন বলিল, এসো নরহরি, বড় মুশকিলে পড়েছি, বুধবারের মধ্যে চল্লিশটি টাকার যোগাড় কি করে করি বলো তো! বাবুর জামাই-মেয়ে আসবেন, টাকার বড্ড দরকার। আমি তো এলাম দু'মাস পরে। টাকা যোগাড় না করতে পারলে আমার তো মান থাকে না—কি করি, ভারী ভাবনায় পড়ে গেলাম যে!

নরহরি বলিল, এসব কথা এখন নয় বাবু। খাওয়া-দাওয়া করুন, কাল বেন্‌বেলা আমিআসবো কাছারিতে—তখন হবে।

ইতিমধ্যে কাছারির ছোকরা চাকর একটা ঘটিতে কিছু দুধ ও কোঁচড়ে কিছু মুড়ি লইয়াফিরিল। নরহরি বলিল, আপনি সেবা করুন লায়েববাবু, আজ আসি। কাল কথাবার্তা হবে।। কাছারি-ঘরের দোরটা একটু ভাল করে আগড় বন্ধ করে শোবেন রাতে—বড্ড বাঘের ভয় হয়েছে আজ কডা দিন।

বিপিন সকালে একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বাঁচিল। তহবিলের টাকার ঘাটতি ইহারা টের পায় নাই। তবুও টাকাটা এবার তহবিলে শোধ করিয়া দিতে হইবে, জমিদার হিসাব তলব করিতে পারেন, এতদিন পরে যখন সে আসিয়াছে! তাহা হইলে অন্তত আশি টাকার আপাতত দরকার, এই তিনদিনের মধ্যে।

তিনটি দিন বাকি মোটে। এখন কোনো ফসলের সময় নয়, আশি টাকা আদায় হইবেকোথা হইতে? পাইক গিয়া প্রজাপত্র ডাকাইয়া আনিল, সকলের মুখেই এক বুলি, এখন টাকাতারা দেয় কি করিয়া?

নরহরি দাশ পনেরোটি টাকা দিল। ইহার বেশি তাহার গলা কাটিয়া ফেলিলেও হইবে না।বিপিন নিজে প্রজাদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরিয়া আরও দশটি টাকা আদায় করিল দুইদিনে। ইহার বেশিহওয়া বর্তমানে অসম্ভব।

বিপিন একবার কামিনী গোয়ালিনীকে ডাকাইল।

এ অঞ্চলের অনেকে জানে যে, বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জের সঙ্গে কামিনীর নাকি বেশ একটু ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখন কামিনীর বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন, একহারা, শ্যামবর্ণ— হাতেমোটা সোনার অনন্ত। সে বিপিনকে স্নেহের চক্ষে দেখে, বিপিন যখন দশ-বারো বছরের বালক, বাবার সঙ্গে কাছারিতে আসিত, তখন হইতেই সে বিপিনকে জানে। বিপিনও তাহাকে সমীহকরিয়া চলে।

কামিনী প্রথমে আসিয়াই বিপিনের ছোট ভাইয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিল।

—বাবা, তারে তুমি কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বড় একটা ডাক্তার-টাক্তার দেখাও—ওখানেবাঁচবে না। রাণাঘাটের হাসপাতালে কি হবে? ছোঁড়াডাকে তোমরা সবাই মেলে মেরে ফেলবাদেখছি!

—করি কি মাসিমা, জানো তো অবস্থা। বাবা মারা যাওয়ার পরে সংসারে আগের মতোজুত নেই। বাবার দেনা শোধ দিয়ে—

কামিনী ঝাঁঝিয়া উঠিয়া বলিল, কর্তার দেনার জন্যে যায়নি—গিয়েছে তোমার উড়ঞ্চুড়েস্বভাবের জন্যে—আমি জানি নে কিছু! কর্তা যা রেখে গিয়েছিলেন করে, তাতে তোমাদের দুইভায়ের ভাতের ভাবনা হত না। বিষয়-আশয়, গোলাপালা, তোমার পৈতের সময় হাজার লোক পাত পেড়ে বসে খেয়েছিল—কম বিষয়ডা করে গিয়েছিলেন কর্তা। তোমরা বাবা সব ঘুচুলে। তাঁর মতো লোক তোমরা হলে তো!

বিপিন দেখিল সে ভুল করিয়াছে। বাবার কোনো ত্রুটির উল্লেখ ইহার সামনে করা উচিতহয় নাই—সে বরাবর দেখিয়া আসিয়াছে কামিনী মাসি তাহা সহ্য করিতে পারে না। ইহার কাছেকিছু টাকা আদায় করিতে হইবে, রাগাইয়া লাভ নাই। সুর বেশ মোলায়েম করিয়া বলিল, ও কথাযাক মাসিমা, কিছু টাকা দিতে পারো, এই গোটা চল্লিশ টাকা ! কিস্তির সময় আদায় করে আবার দেব।

কামিনী পূর্ববৎ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলিল, টাকা, টাকা! টাকার গাছ দেখেছ কিনা আমার!সেবার এককাঁড়ি টাকা যে নিলে আর উপুড়-হাত করলে না, আর একবার দেলাম কুড়ি টাকা পুজোর সময়; তোমার কেবল টাকার দরকার হলেই—মাসি মাসি! বাতে যে পঙ্গু হয়ে পড়েছিলাম কুড়ি-পঁচিশ দিন—খোঁজ করেছিলে মাসিমা বলে?

বিপিন কামিনী মাসিকে কি করিয়া চালাইতে হয় জানে। তরুণ-তরুণীদের কাছে প্রৌঢ় বাপ্রৌঢ়াদের দুর্বলতা ধরা পড়িতে বেশিক্ষণ লাগে না। তাহারা জানে উহাদের কি করিয়া হাতে রাখিতে হয়। সুতরাং বিপিন হাসিয়া

বলিল, খোকার ভাতের সময় তোমায় নিয়ে যাব বলেসব ঠিক মাসি, এমন সময় বলাইটা অসুখে পড়ল। তোমার টাকাকড়িও সব তো এতদিন শোধ হয়ে যেত, ওর অসুখটা যদি না হত!

কামিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিল, তারপর হঠাৎ জবাব দিল, আচ্ছা হয়েছে ঢের, আর বলার কাজ নেই বাপু। বেলা হয়েছে, চললাম আমি। ক'দিন আছ এখানে?

—মঙ্গলবার সন্ধেবেলা কি বুধবার সকালে যাব। মাসিমা, যা বললাম কথাটা মনে রেখ।টাকাটা যদি যোগাড় করে দিতে পারতে, তবে বড্ড উপকার হত। তোমার কাছে না চাইব তো কার কাছে চাইব, বলো!

কামিনী সে কথায় তত কান না দিয়া আপনমনে চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, তোমার পাইককে কি ওই নটবরের ছেলেটাকে আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ো, পেঁপেপেকেছে—সঙ্গে দেব।

মঙ্গলবার বৈকালে কামিনীর কাছে পাওয়া গেল পঁচিশটি টাকা। ধোপাখালির হাট হইতে জমিদার-গিন্নির ফরমাশমতো জিনিসপত্র কিনিয়া বিপিন বুধবার শেষরাত্রির দিকে গরুরগাড়িকরিয়া রওনা হইল এবং বেলা দশটার সময় পলাশপুর আসিয়া পৌঁছিল। জমিদারবাড়ি পৌঁছিবার পূর্বে শুনিল, জামাইবাবু কালরাত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। জমিদারবাবুর অবস্থা এখন তত ভাল নয় বলিয়া তেমন বড় পাত্রে মেয়েকে দিতে পারেন নাই।জামাই আইন পাস করিয়া আলিপুর কোর্টে ওকালতি করেন। কলিকাতায় বাড়ি আছে—পৈতৃকবাড়ি, যদিও দেশ এই পলাশপুরের কাছেই নোনাপাড়া।

তরিতরকারির ধামা গরুরগাড়ি হইতে নামাইতে দেখিয়া জমিদার-গৃহিণী খুশি হইয়া বলিলেন, ওই দেখ, বিপিন মহাল থেকে কত জিনিসপত্র এনেছে! কুমড়োটা কে দিলে বিপিন? কি চমৎকার কুমড়োটি!

বিপিন বলিল, দেবে আবার কে? কাল হাটে কেনা!

—আর এই পটল, ঝিঙে, শাকের ডাঁটা?

—ও সব হাটে কেনা। দেবে কে বলুন, কার দোরেই বা আমি চাইতে যাব?

—ওমা, সব হাটে কেনা! তা এত জিনিস পয়সা খরচ করে না আনলেই হত। মহলথেকে আগে তো দেখেছি কত জিনিসপত্র আসত, তোমার বাবাই আনতেন, আর আজকাল ছাইবলতে রাইও তো কখনও দেখিনে। ওটা কি, মাছ দেখছি যে, বেশ মাছ! ওটাও কেনা নাকি?

—আড়াই সের, সাত আনা দরে, সাড়ে সতেরো আনায় নগদ কেনা।

জমিদার-গিন্নি বিরক্তির মুখে বলিলেন, কে বাপু তোমায় বলেছিল নগদ পয়সা ফেলেআড়াই সের মাছ কিনে আনতে? মহালে নেই এক পয়সা আদায়, এর ওপর তরিতরকারি মাছেদু'টাকার ওপর খরচ করে ফেলতে কে বলেছিল, জিগ্যেস করি!

বিপিন বলিল, দু'টাকার ওপর কি বলছেন, সাড়ে তিন টাকা খরচ হয়েছে। আপনি সেইএক নাগরি আখের গুড় আনতে বলেছিলেন, তাও এনেছি। সাড়ে সাত সের নাগরি, তিন আনা করে সের হিসেবে—

জমিদার-গিন্নি রাগিয়া বলিলেন, থাক, আর হিসেব দেখাতে হবে না! তোমাকে আমিওসব কিনে আনতে কি বলেছিলাম যে আমার কাছে হিসেব দেখাচ্ছ!

বিপিন খুশির সহিত ভাবিল, বেশ হয়েছে, মরছেন জ্বলে পয়সা খরচ হয়েছে বলে! কি কঞ্জুস আর কি ছোট নজর রে বাবা!

মুখে সে কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

৪

জামাইটির সঙ্গে তাহার দেখা হইল বিকালের দিকে। বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ বছর, একটুহৃষ্টপুষ্ট, চোখে চশমা, গম্ভীর মুখ—বৈঠকখানায় বসিয়া কি ইংরেজি কাগজ পড়িতেছিলেন।বিপিন বার কয়েক বৈঠকখানায় যাওয়া-আসা করিল বটে, কিন্তু জামাইবাবু বোধ করি তাহার অস্তিত্বের প্রতি বিশেষ কিছু মনোযোগ না দিয়াই একমনে খবরের কাগজপড়িয়া যাইতেলাগিলেন।

বিপিনের রাগ হইল। তখনই সে সংকল্প করিল, সেও দেখাইবে, বড়লোকের জামাইকে সে গ্রাহ্যও করে না। তুমি আছ বড়লোকের জামাই, তা আমার কি!

বিপিন বৈঠকখানা-ঘরে ঢুকিয়া ফরাশ বিছানো চৌকির এক পাশে বসিয়া রহিলখানিকক্ষণ নিঃশব্দে। দশ মিনিট কাটিয়া গেল, জামাইবাবু তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন নাবা একটা কথাও বলিলেন না।

বিপিন পকেট হইতে বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইল এবং ইচ্ছা করিয়াই ধোঁয়া ছাড়িতেলাগিল এমন ভাবে যাহাতে জামাইয়ের চোখে পড়ে।

জামাইবাবু বোধ হয় এবার ধূম্র হইতে বহ্নিমান পর্বতের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া খবরের কাগজ চোখের সম্মুখ হইতে নামাইলেন। বিপিনকে তিনি চেনেন, বিবাহের পর দুই তিন বার দেখিয়াছেন, শ্বশুরের জমিদারির জনৈক কর্মচারী বলিয়া জানেন। তাহাকে এরূপ নির্বিকার ও বেপরোয়া ভাবে তাহার সম্মুখে বিড়ি ধরাইয়া খাইতে দেখিয়া তিনি বিস্মিত তো হইলেনই, লোকটার বেয়াদবিতে একটু রাগও হইল।

কিন্তু সে বেয়াদবি সীমা অতিক্রম করিয়া তাহাকে সম্পূর্ণ নির্বাক করিয়া দিল, যখন সেইলোকটা দাঁত বাহির করিয়া একগাল হাসিয়া বলিল, জামাইবাবু, কেমন আছেন? চিনতে পারেন? বিড়ি-টিড়ি খান নাকি? নিন না, আমার কাছে আছে!

কথা শেষ করিয়া লোকটা একটা দেশলাই ও বিড়ি তাহার দিকে আগাইয়া দিতে আসিল। নিতান্ত বেয়াদব ও অসভ্য।

জামাইবাবু বিপিনের দিকে না চাহিয়া গম্ভীর মুখে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, থাক, আছেআমার কাছে।—বলিয়া পকেট হইতে রৌপ্যনির্মিত সিগারেটের কেস বাহির করিয়া একটিসিগারেট ধরাইলেন। বিপিন ইহাতে অপমানিত মনে করিল। প্রতিশোধ লইবার জন্য পাল্টাঅপমানের অন্য কোনো ফাঁক খুঁজিয়া না পাইয়া সে বলিয়া উঠিল, জামাইবাবু, ও কি সিগারেট ? একটা এদিকে দিন দিকি!

বাড়ির গোমস্তা জমিদারবাবুর জামাইয়ের নিকট সিগারেট চায়, ইহার অপেক্ষা বেয়াদবি ও অপমান আর কি হইতে পারে! বিপিন সিগারেটের জন্য গ্রাহ্য করে না; কিন্তু লোকটাকে অপমান করিয়াই তাহার সুখ।

জামাইবাবু কিন্তু রৌপ্যনির্মিত সিগারেট-কেস হইতে একটা সিগারেট বাহির করিয়া তাহার দিকে ছুঁড়িয়া দিলেন, কোনো কথা বলিলেন না।

বিপিন সিগারেট ধরাইয়া বলিল, তারপর জামাইবাবু, কবে এলেন?

কাল রাত্রে।

বাড়ির সব ভাল তো?

—হুঁ।

—আপনি এখন সেই আলিপুরেই ওকালতি করছেন?

—হুঁ।

—বেশ বেশ।

দিদিমণি আর ছেলেপুলেদের সব এখানে এনেছেন নাকি?

—হুঁ।

এতগুলি কথার উত্তর দিতে গিয়া জামাইবাবু একবারও তাহার দিকে চাহিলেন না বাখবরের কাগজ সেই যে আবার চোখের সামনে ধরিয়া আছেন তাহা হইতে চোখও নামাইলেননা।

বিপিনের ইচ্ছা হইল, আরও একটু শিক্ষা দেয় এই শহুরে চালবাজ লোকটাকে। অন্যকোনো উপায় না ঠাওরাইতে পারিয়া বলিল, মানীর শরীর বেশ ভাল আছে তো?

মানী জমিদারবাবুর মেয়ে সুলতার ডাকনাম। ডাকনামে গ্রামের মেয়েকে ডাকা এমন কিছুআশ্চর্য নয়, যদি বিপিনের বয়স বেশি হইত। কিন্তু তাহার বয়স জামাইয়ের চেয়ে এমন কিছুবেশি নয় বা সুলতাও নিতান্ত বালিকা নয়, কম করিয়া ধরিলেও সুলতা বাইশ বছরে পড়িয়াছে।গত জ্যৈষ্ঠ মাসে।

এইবার প্রত্যাশিত ফল ফলিল বোধ হয়, জামাইবাবু হঠাৎ মুখ হইতে খবরের কাগজনামাইয়া বিপিনের দিকে চাহিয়া একটু কড়া গম্ভীর সুরে প্রশ্ন করিলেন, মানী কে?

অর্থাৎ মানী কে তিনি ভাল রকমেই জানেন, কিন্তু জমিদারবাড়ির মেয়েকে 'মানী' বলিয়া সম্বোধন করিবার বেয়াদবি তোমার কি করিয়া হইল—ভাবখানা এইরূপ।

বিপিন বলিল, মানী মানে দিদিমণি—বাবুর মেয়ে, আমরা মানী বলেই জানি কিনা।আমাদের চোখের সামনে মানুষ—

ঠিক এই সময়ে চা ও জলযোগের জন্য অন্দর-বাড়ি হইতে জামাইবাবুর ডাক পড়িল।

বিপিন বসিয়া আর একটি বিড়ি ধরাইল, শহুরে জামাইবাবুর চালবাজি সে ভাঙিয়াদিয়াছে। বিপিনকে এখনও ও চেনে নাই। চাকুরির পরোয়া সে করে না, আর কেহ যে তাহারসামনে চাল দেখাইয়া তাহাকে ছোট করিয়া রাখিবে—তাহার ইহা অসহ্য।

ঝি আসিয়া বলিল, নায়েববাবু, মা-ঠাকরুন বললেন, আপনি কি এখন জল-টল কিছুখাবেন?

রাগে বিপিনের গা জ্বলিয়া গেল। এইভাবে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলে অতি বড় নির্লজ্জলোকও কি বলিতে পারে যে সে খাইবে! ইহাই ইহাদের বলিয়া পাঠাইবার ধরন। সাধে কি সেএখানে থাকিতে নারাজ!

রাত্রে খাওয়ার সময়েও এই ধরনের ব্যাপার অন্য রূপ লইয়া দেখা দিল।

দালানের একপাশে জামাইবাবু ও তাহার খাবার জায়গা হইয়াছে। জামাইয়ের পাতেরচারিদিকে আঠারোটা বাটি, তাহাকে দিবার সময় সব জিনিসই পাতে দিয়া যাইতেছে। তাহার পরে দেখা গেল, জামাইবাবুর পাতে পড়িল পোলাও, তাহার পাতে সাদা ভাত। অথচ বিপিনবিকাল হইতেই খুশির সহিত ভাবিয়াছে, রাত্রে পোলাও খাওয়া যাইবে। পোলাও রান্নার কথাসে জানিত।

কি ভাগ্য, জামাইয়ের পাতে লুচি দেওয়ার সময় জমিদার-গিন্নি তাহার পাতেও খান চার লুচি দিলেন।

বিপিন খাইয়ে লোক, চারখানি লুচি শেষ করিয়া বসিয়া আছে দেখিয়া জমিদার-গিন্নি বলিলেন, বিপিনকে লুচি দেব?

ইহা জিজ্ঞাসা নয়, দিব্য পরিস্ফুট স্বগত উক্তি। অর্থাৎ ইহা শুনিয়া যদি বিপিন লুচিআনিতে বারণ করিয়া দেয়। কিন্তু বিপিন তরুণ যুবক, ক্ষুধাও তাহার যথেষ্ট, চক্ষুলজ্জা করিলেতাহার চলে না। সে চুপ করিয়া রহিল। জমিদার-গিন্নি আবার চারখানা গরম লুচি আনিয়াতাহার পাতে দিলেন, বিপিন সে ক'খানা শেষ করিতে এবার কিছু বিলম্ব করিল চক্ষুলজ্জায়পড়িয়া। কারণ ওদিকে জামাইবাবু হাত গুটাইয়াছেন। জমিদার-গিন্নি ঘরের দোরে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, বলিলেন, বিপিনকে লুচি দেব?

ইহাও জিজ্ঞাসা নয়, পূর্ববৎ স্বগত উক্তি, তবে বিপিনকে শুনাইয়া বটে। বিপিন ভাবিল, ভাল মুশকিলে পড়া গেল। লুচি দেব, লুচি দেব! দেবার ইচ্ছে হয় দিয়ে ফেললেই তো হয়, মুখেঅমন বলার কিদরকার!

জমিদার-গৃহিণী যদি ভাবিয়া থাকেন যে, বিপিন আর লুচি আনিতে বারণ করিবে, তবে তাহাকে নিরাশ হইতে হইল, বিপিন কোনো কথা কহিল না। আবার চারখানা লুচি আসিল।

চারখানি করিয়া ফুলকো লুচিতে বিপিনের কি হইবে? সে পাড়াগাঁয়ের ছেলে, খাইতেপারে, ওরকম এক ধামা লুচি হইলে তবে তাহার কুলায়। কাজেই সে বলিল, না মাসিমা, লুচিখাওয়া অভ্যেস নেই, ভাত না হলে যেন খেয়ে তৃপ্তি হয় না।

জমিদার-গিন্নি ভাত আনিয়া দিলেন, মনে হইল তিনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছেন।বিপিন মনে মনে হাসিল।

খাওয়া শেষ করিয়া সে বাহিরের ঘরে যাইতেছে, রোয়াকের কোণের ঘরের জানলারকাছ দিয়া যাইবার সময় তাহাকে কে ডাকিল, ও বিপিনদা!

বিপিন চাহিয়া দেখিল, জানালার গরাদ ধরিয়া ঘরের ভিতরে জমিদারবাবুর মেয়ে মানী দাঁড়াইয়া আছে।

মানী দেখিতে বেশ সুশ্রী, রংও ওর মায়ের মতো ফর্সা, এখনও একহারা চেহারা আছে, তবে বয়স হইলে মায়ের মতো মোটা হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে, বেশভূষার প্রতি চিরকালই তাহার সযত্ন দৃষ্টি, এখনও যে ধরনের একখানি রঙিন শাড়ি ওহাফহাতা ব্লাউজ পরিয়া আছে, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা তেমন আটপৌরে সাজ করিবার কল্পনাওকরিতে পারে না, একথা বিপিনের মনে হইল।

বিপিনের বাবা বিনোদ চাটুজ্জে যখন এঁদের স্টেটে নায়েব ছিলেন, বিপিন বাপের সঙ্গেবাল্যকালে কত আসিত এঁদের বাড়িতে, মানীর তখন নয়-দশ বছর বয়স। মানীর সঙ্গে সে কত খেলা করিয়াছে, মানীর সাহায্যে উপরের ঘরের ভাঁড়ার হইতে আমসত্ত্ব ও কুলের আচার চুরিকরিয়া দুইজনে সিড়ির ঘরে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া খাইয়াছে, মানীর পড়া বলিয়া দিয়াছে। বিপিনেরপৈতা হইবার পর মানী একবার বিপিনের ভাতের থালায় নিজের পাত হইতে কি একটা তুলিয়াদিয়া বিপিনের খাওয়া নষ্ট করার জন্য মায়ের নিকট হইতে খুব বকুনি খায়। সেই মানী, কতবড় হইয়া গিয়াছে। ওর দিকে যেন আর তাকানো যায় না!

বিপিন বলিল, মানী, কেমন আছ?

—ভাল আছি। তুমি কেমন আছ বিপিনদা ?

বিপিনের মনে হইল, তাহার সহিত কথা বলিবার জন্যই মানী এই জানালার ধারেঅনেকক্ষণ হইতে দাঁড়াইয়া আছে।

মানীকে এক সময় বিপিন যথেষ্ট স্নেহের চক্ষে দেখিত, ভালবাসা হয়তো তখনও ঠিকজন্মায় নাই; কিন্তু বিপিনের সন্দেহ হয়, মানী তাহাকে যে চক্ষে দেখিত তাহাকে শুধু 'স্নেহ' বা 'শ্রদ্ধা' বলিলে ভুল হইবে, তাহা আরও বড়, ভালবাসা ছাড়া তাহার অন্য কোনো নাম দেওয়া বোধ হয় চলে না।

মানীর কথা বিপিন অনেকবার ভাবিয়াছে। একসময়ে মানী ছিল তাহার চোখে নারীসৌন্দর্যের আদর্শ! মনোরমাকে বিবাহ করিবার সময় বাসরঘরে মানীর মুখ কতবার মনে আসিয়াছে, তবে সে আজ ছয়-সাত বছরের কথা, তাহার নিজের বয়সই হইতে চলিল সাতাশ-আটাশ।

—বিপিন বলিল, খুব ভাল আছি। তুমি যে মাথায় খুব বড় হয়ে গিয়েছ মানী! —বিপিনদা, ওরকম করে কথা বলছ কেন? আমি কি নতুন লোক এলাম?

বিপিনের মনে পড়িল, মানীকে সে কখনও 'তুমি' বলে নাই, চিরকাল 'তুই' বলিয়াআসিয়াছে। এখন অনেক দিন পরে দেখা, প্রথমটা একটু সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, বলিল, কলকাতার লোক এখন তোরা, তুই কি আর সেই পাড়াগেঁয়ে ছোট্ট মানীটি আছিস?

—তুমি কি আমাদের কাছারিতে কাজে ঢুকেছ?

—হ্যাঁ। না ঢুকে করি কি, সংসার একেবারে অচল। তোর কাছে বলতে কোনো দোষনেই মানী, যেদিন এখানে এলুম এবার, না হাতে একটি পয়সা, না ঘরে একমুঠো চাল। আর ধরোলেখাপড়াই বা কি জানি, কিছুই না।

—কিন্তু তুমি এখানে টিকতে পারবে না বিপিনদা। তুমি ঘোর খামখেয়ালী মানুষ, তোমায়আর আমি চিনি নে! বিনোদকাকা যে রকম করে কাজ করে টিকে থেকে গিয়েছেন, তুমি কিতেমন পারবে? আজই কি সব করেছ, দু' তিন টাকা খরচ করে দিয়েছ—মা বলছিলেন বাবাকে! বলিয়া মানী হাসিল।

বিপিন বলিল, যদি খরচই করে থাকি, সে তো তোদেরই জন্যে। তুই এসেছিস এতকালপরে, একটু ভাল মাছ না খেতে পেলে তুই-ই বাকি ভাববি!

মানী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, মহাল থেকে মাছ আনলে না কেন?

—কে মাছ দেবে বিনি পয়সায় তোদের মহালে? বাবার আমলের সে ব্যাপার আর আছেনাকি? এখন লোক হয়ে গিয়েছে চালাক, তাদের চোখ কান ফুটেছে—তোর মা কি সে খবর রাখেন?

—তা নয়, বিনোদকাকার মতো ডানপিটে দুঁদেও তো তুমি নও বিপিনদা। তুমিভালমানুষ ধরনের লোক, জমিদারির কাজ করা তোমার দ্বারা হবে না।

শেষ কথাগুলি মানী যথেষ্ট গাম্ভীর্যের সহিত বলিল।

বিপিন হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তাই তো রে মানী, একেই না বলে জমিদারের মেয়ে! দস্তুরমতো জমিদারি-চালের কথাবার্তা হচ্ছে যে!

মানী বলিল, কেন হবে না, বল? আমি জমিদারের মেয়ে তো বটেই। সংস্কৃত তো পড়নি বিপিনদা, সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে—সিংহের বাচ্চা জন্মেই হাতির মুণ্ডু খায় আর—

—থাক্ থাক্, তোর আর সংস্কৃত বিদ্যে দেখাতে হবে না, ও সবের ধার মাড়াইনিকখনও। আচ্ছা আসি মানী, রাত হয়ে যাচ্ছে।

মানী বলিল, শোনো শোনো, যেও না, রাত এখন তো ভারী! আচ্ছা বিপিনদা, ভারী দুঃখ হয়আমার, লেখাপড়াটা কেন ভাল করে শিখলে না? তোমার চেহারা ভাল, লেখাপড়া শিখলে চাকরিতে তোমায় যেচে আদর করে নিত—এ আমি বলতে পারি।

বিপিন বলিল, আচ্ছা মানী, একবার তুই আর আমি ভাঁড়ারঘর থেকে কুলচুর চুরি করেখেয়েছিলাম, মনে পড়ে? সিঁড়ির ঘরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়েছিলুম?

মানী বলিল, তা আর মনে নেই। সে সব এক দিন গিয়েছে। কিন্তু আমার কথা ওভাবেচাপা দিলে চলবে না। লেখাপড়া শিখলে না কেন, বলো?

বিপিন হাসিয়া বলিল, উঃ, কি আমার কৈফিয়ত-তলবকারিণী রে!

পরে ঈষৎ গম্ভীর মুখে বলিল, সে অনেক কথা। সে কথা তোর শুনে দরকারও নেই।তবে তোর কাছে মিথ্যে কথা বলব না। হ'ল কি জানিস, বাবা মারা গেলেন বিস্তরবিষয়সম্পত্তি ও কাঁচা টাকা রেখে। আমি তখন সবে কুড়ি বছরে পা দিয়েছি, মাথার ওপর কেউনেই, টাকা উড়ুতে আরম্ভ করে দিলাম, পড়াশুনো ছাড়লাম, বিষয়সম্পত্তি নগদ টাকা পেয়ে কম দরে মৌরসী বিলি করতে লাগলাম। বদখেয়ালের পরামর্শ দেবারও লোক জুটে গেল অনেক। কতদূর যে নেমে গেলাম—

মানী একমনে শুনিতেছিল, শিহরিয়া উঠিয়া বলিল, বল কি বিপিনদা!

—তোর কাছে বলতে আমার কোনো সঙ্কোচ নেই, সঙ্কোচ হলেও কোনো কথা লুকোব না। আজ এত দুঃখু পাব কেন মানী, এখানে চাকরি করতে আসব কেন—কিন্তু এখন বয়স হয়েবুঝেছি, কি করেই হাতের লক্ষ্মী ইচ্ছে করে বিসর্জন দিয়েছিলাম তখন!

—তারপর?

—তারপর ওই যে বলছিলাম, নানারকম বদখেয়ালে টাকাগুলো এবং বিষয়-আশয়জলাঞ্জলি দিয়ে শেষে পড়লাম ঘোর দুর্দশায়। খেতে পাইনে—এমন দশায় এসে পৌঁছলাম।

মানীর মুখ দিয়া এক ধরনের অস্ফুট বিস্ময় ও সহানুভূতির স্বর বাহির হইল, বোধ হয়তাহার নিজেরও অজ্ঞাতসারে। বিপিনের বড় ভাল লাগিল মানীর এই দরদ ও তাহার সতেজ সহজ সজীব সহানুভূতি।

—সে সব কথাগুলো তোর কাছে বলব না, মিছে তোর মনে কষ্ট দেওয়া হবে। এইরকমে দেড় বছর কেটে গেল, তারপর তোর বাবার কাছে এলুম চাকরির চেষ্টায়, চাকরি পেয়েও গেলাম। এই হল আমার ইতিহাস। তবে এ চাকরি পোষাবে না, সত্যি বলছি। এ আমার অদৃষ্টে টিকবে না। দেখি, অন্য কোথাও ভাগ্য পরীক্ষা করে।

মানী অত্যন্ত একমনে কথাগুলি শুনিতেছিল। গম্ভীর মুখে বলিল, একটা কথা আমার শুনবে?

—কি?

—আমায় না জানিয়ে তুমি এ চাকরি ছাড়বে না, বলো?

—সে কথা দেওয়া শক্ত মানী। সত্যি বলছি, তুই এসেছিস এখানে তাই, নইলে বোধ হয়এবার বাড়ি থেকে আসতাম না। তবে যে ক'দিন তুই আছিস, সে ক'দিন আমিও থাকব। তারপর কি হয় বলতে পারছিনে।

চিরকালটা তোমার একভাবে গেল বিপিনদা! নিজের গোঁ ও বুদ্ধিতে কষ্ট পেলে চিরদিন। আমার কথা একটিবার রাখো বিপিনদা, তেজ দেখানোটা একবারের জন্যে বন্ধ রাখো। আমায় না জানিয়ে চাকরি ছেড়ো না, আমি তোমার ভালর চেষ্টাই করব।

বিপিন হাস্যমিশ্রিত ব্যঙ্গের সুরে বলিল, উঃ, মানী পরের উপকারে মন দিয়েছে দেখছি!এমন মূর্তিতে তো তোকে কখনও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না মানী!

মানী রাগতভাবে বলিল, আবার?

—না না, আচ্ছা তোর কথাই শুনব, যা-রাগ করিস নে।

—কথা দিলে?

এইসময় ঘরের মধ্যে মানীর ছোট ভাই সুধীর আসিয়া পড়াতে মানী পিছন ফিরিয়া চাহিল। বিপিন তাড়াতাড়ি বলিল, চলি মানী, শুইগে, রাত হয়েছে। শরীর ক্লান্ত আছে খুব, সারাদিন মহালে ঘুরেছি টো টো ক'রে রোদ্দুরে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

রাত্রে বিপিনের ভাল ঘুম হইল না। মানীর সঙ্গে দেখা হওয়াতে তাহার মনের মধ্যে কেমন যেন সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে। মানী তাহার সঙ্গে কথা বলিবার জন্যই জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিল, তাহা হইলে সে আজও মনে রাখিয়াছে!

—তবে যে বলে, বিয়ে হলেই মেয়েরা সব ভুলে যায় ?

বিপিনের পৌরুষগর্ব একটু তৃপ্ত হইয়াছে। মানী জমিদারের মেয়ে, সে গরিব, লেখাপড়াএমন কিছু জানে না, দেখিতেও খুব ভাল নয়, তবু তো মানী তাহারই সঙ্গে নির্জনে কথাবলিবার জন্য লুকাইয়া জানালায় দাঁড়াইয়া ছিল।

দুই-তিন দিনের মধ্যে মানীর সঙ্গে আর দেখা হইল না। অনাদিবাবু তাহাকে লইয়া হিসাবপত্র দেখিতে বসেন, রোকড় আজ দুই মাস লেখা হয় নাই, খতিয়ান তৈয়ারি নাই, মাসকাবারি হিসাবের তো কাগজই কাটা হয় নাই। খাইবার সময় বাড়ির মধ্যে যায়, খাইয়াআসিয়াই কাছারিবাড়িতে গিয়া জমিদারবাবুর সামনে বসিয়া কাজ করিতে হয়।

অনাদিবাবু লোক খারাপ নন, তবে গম্ভীর প্রকৃতির লোক, কথাবার্তা বেশি বলেন না।। জমিদারির কাজ খুব ভাল বোঝেন, তিনি আসনে বসিয়া থাকিলে কাজে ফাঁকি দেওয়া শক্ত।

—বিপিন, গত মাসের প্রজাওয়ারী হিসেবটা একবার দেখি!

বিপিন ফাঁপরে পড়িল। সে-খাতায় গত তিন মাসের মধ্যে সে হাতই দেয় নাই।

—ও খাতা এখন তৈরি নেই।

—তৈরি নেই, তৈরি করো! কিস্তির আর দেরি কি, এখনও যদি তোমার সে হিসেব তৈরিথাকে—

তারপরে আছে নানা ঝঞ্ঝাট। জেলেরা কোমর-জাল ফেলিয়াছিল পুঁটিখালির বাঁওড়ে, বিপিনই জাল পিছু পাঁচটাকা হিসাবে তাহাদের বন্দোবস্ত দিয়াছিল; আজ চার মাস হইয়া গেল, কেহ একটি পয়সা আদায় দেয় নাই। সেজন্যও জমিদারবাবুর কাছে কৈফিয়ত দিতে দিতে প্রাণ গেল।

আজই অনাদিবাবু বলিলেন, তুমি খেয়ে-দেয়ে বীরু হাড়িকে সঙ্গে নিয়ে নিজেই একবারঘোষপুরে যাও, আজ কিছু বেটাদের কাছ থেকে আনতেই হবে। মেয়ে-জামাই এখানে রয়েছে, খরচের অন্ত নেই। আজ অন্তত কুড়িটি টাকা নিয়ে এসো।

এই রৌদ্রে খাইয়া উঠিয়াই ঘোষপুরে ছুটিতে হইবে। নায়েব গোমস্তা প্রজাবাড়ি তাগাদা করিতে দৌড়ায় কোনো জমিদারিতে! ইঁহাদের এখানে এমনই ব্যবস্থা। পাইক- পেয়াদার মধ্যে বীরু হাড়ি এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক। বাজে পয়সা খরচ ইঁহারা করিবেন না, সুতরাং আদায়ের অবস্থাও তথৈবচ।

সন্ধ্যার সময় ঘোষপুর হইতে সে ফিরিল।

জেলেদের পাড়ায় আজ দুই তিন মাস হইতে ঘোর ম্যালেরিয়া লাগিয়াছে। কেহ কাজেবাহির হইতে পারে নাই। কোমর-জাল যেমন তেমনই জলে ফেলা রহিয়াছে। তবুও সে নিজে গিয়াছিল বলিয়া তাহার খাতিরে টাকা চারেক মাত্র আদায় হইয়াছে।

২

রাত্রে অনাদিবাবু ডাকিয়া পাঠাইলেন বাড়ির মধ্যে। গিন্নিও সেখানে ছিলেন।

—কত আদায় করলে বিপিন?

বিপিন মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, চার টাকা।

অনাদিবাবু গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া তাকিয়া ছাড়িয়া সোজা হইবার বসিলেন। চার টাকামোটে! বলো কি! এঃ, এর নাম আদায়? তবেই তুমি মহালের কাজ করেছ!

গিন্নি বলিয়া উঠিলেন, জেলেদের মহালে গেলে বাপু, এক-আধটা বড় মাছই না হয় নিয়ে এসো। মেয়ে-জামাই এখানে রয়েছে, তা তোমার কি সে হুঁশ-পব্ব আছে? সেদিন বললামধোপাখালির হাট থেকে মাছ আনতে, না আড়াই সের এক কাৎলা মাছ পয়সা দিয়ে কিনে এনেহাজির !

বিপিনের ভয়ানক রাগ হইল। একবার ভাবিল, সে বলে, বেশ, এমন লোক রাখুন, যে প্রজা ঠেঙিয়ে বিনি পয়সায় মাছ আপনাদের এনে দিতে পারবে। আমি চললুম, আমার মাইনে যা বাকি পড়েছে আজই চুকিয়ে দিন। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলাইয়া গেল। কেবল বলিল, মাছ কেউ এখন ধরছে না মাসিমা। সবাই মরছে ম্যালেরিয়ায়, মাছ ধরবার একটা লোকও নেই।...বিপিনসামলাইয়া গেল মানীর কথা মনে করিয়া। মানী এখানে থাকিতে তাহার বাপ-মায়ের সঙ্গে সেঅপ্রীতিকর কিছু করিতে পারিবে না।

জমিদার-গিন্নি বলিলেন, আর বার-বাড়িতে যাচ্ছ কেন, একেবারে খেয়ে যাও!

ইহাদের বাড়িতে রাঁধুনী আছে—এক বৃদ্ধা বামুনের মেয়ে। সে রাত্রে চোখে দেখিতে পায় নাবলিয়া গিন্নি নিজেই পরিবেশন করেন। জামাইবাবুও একসঙ্গেই বসিয়া খান, তবে তিনিনরলোকের সঙ্গে বড় একটা কথাবার্তা বলেন না। আজও বিপিন দেখিল, একই জায়গায় খাইতেবসিয়া জামাইয়ের পাতে পড়িল মিষ্টি পোলাও, তাহার পাতে দেওয়া হইল সাদা ভাত। তবে একসঙ্গে বসাইবার মানে কি? সেদিনও ঠিক এমন হইয়াছে সে জানে, ইঁহারা কৃপণের একশেষ জামাইয়ের জন্য কোনো রকমে ক্ষুদ্র হাঁড়ির এক কোণে দুটি পোলাও রাঁধিয়াছেন, তাহা হইতে তাহাকে দিতে গেলে চলিবে কেন? তবু রোজ পোলাওয়ের ব্যবস্থা করিয়া বড়মানুষি দেখানোচাই। খাওয়ার পরে সে চলিয়া আসিতেছে বাহির-বাড়িতে, জানালায় মানী দাঁড়াইয়া তাহাকেডাকিল, ও বিপিনদা!

—এই যে মানী, ক'দিন দেখিনি।

—তুমি কখন যাও, কখন খাও, তোমার নিজেরই হিসেব আছে? আজ পোলাও কেমনখেলে?

—বেশ।

—না, সত্যি বলো না। ভাল হয়েছিল?

—কেন বলো তো?

—আগে বলো না, কেমন হয়েছিল?

—বললুম তো, বেশ হয়েছিল।

—আমি রেঁধেছি। তুমি মিষ্টি পোলাও খেতে ভালবাসতে, মনে আছে?

—খুব মনে আছে। আচ্ছা, আমি যাই মানী, রাত হয়ে গেল খুব।

মানী একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, মা তোমাকে পেটভরে খেতে দিয়েছিল তো পোলাও ? আমি ওখানে যেতাম, কিন্তু—

বিপিন বুঝিতে পারিল, মানীর স্বামীও সেখানে, এ অবস্থায় মায়ের সামনে পল্লীগ্রামের রীতি অনুসারে মানীর যাওয়াটা অশোভন।

—হ্যাঁ, সে সব ঠিক হয়েছিল—আমি যাই।

মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে। মায়ের হাত সে খুব ভাল রকমই জানে, জানে বলিয়াই সে এ প্রশ্নবিপিনকে করিল। কিন্তু বিপিনের উড়ুউড়ু ভাব দেখিয়া সে একটু বিস্মিত না হইয়া পারিল না।বিপিনদা তো কখনও তাহার সঙ্গে কথা বলিবার সময় এমন যাই-যাই করে না! হয়তো ঘুমপাইয়াছে, রাত কম হয় নাই বটে!

ইহার পর দুই দিন সে জমিদারবাবুর হুকুমে জেলেদের খাজনার তাগাদা করিতেঘোষপুর গিয়া রহিল। ওখানকার মাতব্বর প্রজা রাইচরণ ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপে ইহার পূর্বেও সে কিস্তির সময় কয়েকদিন ছিল। নিজেই রাঁধিয়া খাইতে হয়, তবে আদর-যত্ন যথেষ্ট। সঙ্গতিপন্নগোয়ালাবাড়ি, দুধ-দই-ঘিয়ের অভাব নাই। জমিদারের ব্রাহ্মণ নায়েব বাড়িতে অতিথি, বাড়িরসকলে হাতজোড়, তটস্থ।

কিন্তু বিপিন মনে মনে ভাবে, এতে কি জমিদারের মান থাকে ? এমন হয়েছেন আমাদেরজমিদার, যে একখানা কাছারি-ঘর করবেন না! অথচ এই মহালে সালিয়ানা আড়াই হাজার টাকা আদায়। একখানা দো-চালা ঘর তুলে রাখলেও তো হয়; কিন্তু তাতে যে পয়সা খরচ হয়েযাবে! ওরে বাবা রে!

তিন দিনের দিন রাত্রে বিপিন জমিদারবাড়ি ফিরিল। যাহা আদায়-পত্র হইয়াছেঅনাদিবাবুকে তাহার হিসাব বুঝাইয়া দিয়া একটু বেশি রাত্রে বাড়ির ভিতর হইতে খাইয়া ফিরিতেছে, জানালায় দাঁড়াইয়া মানী ডাকিল, বিপিনদা!

—এই যে মানী, কেমন? তোর নাকি মাথা ধরেছিল শুনলুম, মাসিমার মুখে?

মানী সে কথার কোনো উত্তর দিল না। বলিল, দাঁড়াও, একটা কথা বলি।

—কি রে?

—তুমি সেদিন মিথ্যে কেন বলে গেলে আমার কাছে? তুমি পোলাও খেয়েছিলেসেদিন?

মেয়েমানুষ তুচ্ছ কথা এতও মনে করিয়া রাখিতে পারে! বাসী কাসুন্দি ঝাঁটা ওদের স্বভাব! দুই দিনের আদায়পত্রের ভিড়ের মধ্যে, কাছারির কাজের চাপে তাহার কি মনে আছে, সেদিন কি খাইয়াছিল, না খাইয়াছিল! মানীর যেমন পাগলামি!

বিপিন মৃদু হাসিয়া বলিল, কেন, খাইনি, তাতে কি?

মানী বিপিনের কথার সুরে কৌতুকের আভাস পাইয়া ঝাঁঝাল সুরে বলিয়া উঠিল, তাতেকিছু না, কিন্তু তুমি মিথ্যে কথা কেন বলে গেলে? বললেই হত, খাইনি? আমি তোমায় ফাঁসিদিতাম ?

বিপিন পুনরায় মৃদু হাসিমুখে বলিল, সেইটেই কি ভাল হত? তোর মনে কষ্ট দেওয়া হত ?

মানী সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া জানালা হইতে সরিয়া গেল।

বিপিন হতবুদ্ধির মতো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বলিল, ও মানী, রাগ করবার কি আছেএতে ! শোনো না, ও মানী!কোনো সাড়াশব্দ না পাইয়া বিপিন বাহির-বাড়ির দিকে চলিল। মনে মনে ভাবিতে ভাবিতে চলিল, মেয়েমানুষ সব সমান—যেমন মনোরমা, তেমনিই মানী। আচ্ছা কি করলাম, বলো তো? দোষটা কি আমার?

মনে মনে, কি জানি কেন, বিপিন কিন্তু শান্তি পাইল না। মানীটা কেন যে তাহার উপররাগ করিল? করাই বা যায় কি? মানীর তাহার প্রতি এতটা টান, তাহা বিপিন কি জানিত ?

জানিয়া মনে মনে যেমন একটু বিস্মিতও হইল, সঙ্গে সঙ্গে খুশি না হইয়াও পারিল না।

৩

পরের দিন সকালে বিপিন বাড়ির মধ্যে খাইতে বসিয়াছে, জমিদার-গিন্নি আসিয়া বলিলেন, হ্যাঁবাবা বিপিন, সেদিন আমি তোমাকে কি পোলাও দিইনি ?

বিপিন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল, কোন্ দিন?

—সেই যেদিন রাত্রে তুমি আর সুধাংশু একসঙ্গে খেলে?

—কেন বলুন তো?

—মেয়ে তো আমায় খেয়ে ফেলছে কাল থেকে, একসঙ্গে খেতে বসেছিলে দুজনে, তোমায় পোলাও দিইনি কেন? তাই নিয়ে। তোমায় কি পোলাও দিইনি, বলো তো বাবা?

—কেন দেবেন না? আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি দু হাতা, আমার ঠিক মনে হচ্ছে নামাসিমা, একমনে খেয়ে যাই, কত কাজ মাথায়, অতশত কি মনে থাকে? কিন্তু আপনি যেন দুহাতা কি তিন হাতা—

জমিদার-গৃহিণী রান্নাঘরের দোরের কাছে সরিয়া গিয়া ঘরের ভিতর কাহার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওই শোন, নিজের কানে শোন। ও খেয়ে তো মিথ্যে কথা বলবে না। কারমুখে কি শুনিস, আর তোর অমনিই মহাভারতের মতো বিশ্বাস হয়ে গেল। আর এত লাগানি-ভাঙানিও এ বাড়িতে হয়েছে! এ রকম করলে সংসার করি কি করে?

সেদিন রাত্রে খাইবার সময় বিপিন সবিস্ময়ে দেখিল, ভাতের পরিবর্তে মিষ্টি পোলাওপাতে দেওয়া হইয়াছে। ভোজনের আয়োজনও প্রচুর। এবেলা জামাই সঙ্গেই খাইতে বসিয়াছে, বিপিন কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা সঙ্গত মনে করিল না। তাহার ইহাও মনে হইল, জমিদারগৃহিণীযে ওবেলা মানীর রাগের কথা তুলিয়াছিলেন, সে কেবল সেখানে জামাই ছিল না বলিয়াই।

জামাই প্রতিদিনই আগে খাইয়া দোতলায় চলিয়া যায়। বিপিন একটু ধীরে ধীরে খায় বলিয়া রোজই তাহার দেরি হয় খাইতে। বিপিন খাওয়া শেষ করিয়া বহির্বাটীতে যাইবার সময়দেখিল, মানী তাহারই অপেক্ষায় যেন জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে দেখিয়াহাসিমুখে বলিল, কেমন হল, বিপিনদা?

—চমৎকার হয়েছে। সত্যি, সুন্দর পোলাও হয়েছিল! খুব খাওয়া গেল! কে রেঁধেছিল, তুই?

মানী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, বলো না, কে?

—তুই।

—ঠিক ধরেছ। তা হলে আজ খুশি তো? মনে কোনো কষ্ট থাকে তো বলো।

—খুশি বইকি, সেদিন যে কাঁদতে কাঁদতে যাচ্ছিলুম পোলাও না খেতে পেয়ে—তবেকষ্ট একটা আছে।

—কি, বলো না?

—কাল তুই অত রাগ করলি কেন আমার ওপরে হঠাৎ? আমার কি দোষ ছিল?

মানী স্থিরদৃষ্টিতে বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, বলব? বলতাম না, কিন্তু যখন বলতেবললে, তখন বলি। আমার কাছে কখনও কোনো কথা গোপন করতে না বিপিনদা, মনে ভেবে দেখ। বাবার হাত-বাক্স থেকে চাকু-ছুরি পড়ে গিয়েছিল, তুমি কুড়িয়ে পেয়ে কাউকে বলোনি, শুধু আমায় বলেছিলে, মনে আছে?

—উঃ, সে কতকালের কথা। তোর মনে আছে এখনও।

মানী সে কথার কোনো উত্তর না দিয়া বলিয়াই চলিল, সেও তুমি জীবনে এই প্রথমআমার কাছে কথা গোপন করলে! এতে আমায় যে কত কষ্ট দিলে তা বুঝতে পারো? তুমি দূরেরেখে চলতে পারলে যেন বাঁচো!

—ভুল কথা মানী। সেজন্যে নয়, কথাটা তোমার মার বিরুদ্ধে বলা হত নয় কি? ছেলেমানুষি করো না, অন্য কথা গোপনে আর এ কথা গোপনে তফাত নেই?

মানী হাসিমুখে কৃত্রিম বিদ্রুপের সুরে বলিল, বেশ গো ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির, বেশ। এখন যাবলি, তাই শোনো।

এই সময়ে ভেতরের রোয়াকে জমিদার-গৃহিণীর সাড়া পাইয়া বিপিন চট করিয়াজানালার ধার হইতে সরিয়া গেল।

৪

পরদিনই বিপিনকে ধোপাখালির কাছারিতে ফিরিতে হইল।

আজকাল বেশ লাগে পলাশপুরে জমিদারবাড়ি থাকিতে, বিশেষত স্বামীর সঙ্গে পুনরায়আলাপ জমিবার পর হইতে সত্যই বেশ লাগে।

কিন্তু সেখানে বসিয়া থাকিবার জন্য অনাদি চৌধুরী তাহাকে মাহিনা দিয়া নায়েব নিযুক্তকরেন নাই।

সমস্ত দিন মহালের কাজে টোটো করিয়া ঘুরিয়া সন্ধ্যাবেলা বিপিন কাছারি ফিরিয়া একা বসিয়া থাকে। ভারী নির্জন বোধ হয় এই সময়টা। পৃথিবীতে যেন কেহ কোথাও নাই। কাছারিরভৃত্যটি রান্নার যোগাড় করিতে বাহির হয়, কাঠ কাটে, কখনও বা দোকানে তেল নুন কিনিতে যায়। সুতরাং বিপিনকে থাকিতে হয় একেবারে একা।

এই সময় আজকাল মানীর কথা অত্যন্ত মনে হয়।

সেদিন পোলাও খাওয়ানোর পর হইতেই বিপিন মানীর কথা ভাবে। এমন একদিন ছিল, যখন মানী ছিল তাহার খেলার সাথী। সে কিন্তু অনেক দিনের কথা। যৌবনের প্রথমে বদখেয়ালের ঝোঁকে অন্ধকার রাত্রে পথের ধারে ঘাসের উপর অর্ধচেতন অবস্থায় শুইয়া মানীরমুখ কতবার মনে পড়িত।

আর একবার মনে পড়িয়াছিল বিবাহের দিন। উঃ, বড় বেশি মনে পড়িয়াছিল। নববধূর মুখ দেখিয়া বিপিন ভাবিয়াছিল, মানীর মুখের কাছে এর মুখ! কিসের সঙ্গে কি?

এ কথা সত্য, মানীর ষোলো বছরের সে লাবণ্যভরা মুখশ্রী আর নাই। এবার কয়েকদিন পরে মানীকে দেখিয়া বুঝিল যে মেয়েদের মুখে পরিবর্তন যত শীঘ্র আসে, বয়স তাহার বিজয়অভিযানের দৃপ্ত রথচক্ররেখা যত শীঘ্র আঁকিয়া রাখিয়া যায় মেয়েদের মুখে, পুরুষদের মুখে তত শীঘ্র পারে না।

কিন্তু তাহাতে কিছু আসে যায় না, সেই মানী তো বটে।

বিপিন ভালই জানিত, জমিদারের মেয়ে মানীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে পারে না, সে জিনিসটা সম্পূর্ণ অসম্ভব; তবুও মানীর বিবাহের সংবাদে সে যেন কেমন নিরাশ হইয়াপড়িয়াছিল, আজও তাহা মনে আছে।

তখন বিপিনের বাবা বাঁচিয়া ছিলেন। মনিবের মেয়ের বিবাহের জন্য তিনি গ্রামেরগোয়ালপাড়া হইতে ঘি কিনিয়া টিনে ভর্তি করিতেছিলেন। গাওয়া ঘি বিপিনদের গ্রামে খুবসস্তা, এজন্য অনাদিবাবু নায়েবকে ঘি যোগাড়

করিবার ভার দিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্বদিনবৈকালের ট্রেনে বিপিনের বাবা তিন টিন গাওয়া ঘি, তিন টিনে ঘানি-ভাঙ্গা সরিষার তৈল, তরিতরকারি, কয়েক হাঁড়ি দই লইয়া জমিদারবাড়ি রওনা হইলেন। বিপিন কিছুতেই যাইতে চাহিল না দেখিয়া তাহার বাবা ও মা কিছু আশ্চর্য হইয়াছিলেন। বিপিন তখন গ্রামের মাইনরস্কুলে তৃতীয় পণ্ডিতের পদে সবে ঢুকিয়াছে, মাত্র কুড়ি বছর বয়স।

তারপর সব একরকম চুকিয়া গিয়াছিল। আজ সাত বছর আর মানীর সঙ্গে তাহার দেখাশুনা হয় নাই। তারপর কত কি পরিবর্তন ঘটিয়া গেল তাহার নিজের জীবনে! তাহারবাবা মারা গেলেন, কুসঙ্গে পড়িয়া সে কি বদখেয়ালিটাই না করিল! বাবার সঞ্চিত কাঁচা পয়সাহাতে পাইয়া দিনকতক সে ধরাকে সরা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপর তাহার নিজের বিবাহ হইল, বিবাহের বছরখানেক পরে বিপিন হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করিল যে সেসম্পূর্ণরূপে নিঃস্ব, না আছে হাতে পয়সা, না আছে তেমন কিছু জমিজমা। সে কি ভয়ানকঅভাব-অনটনের দিন আসিল তারপরে!

সচ্ছল গৃহস্থের ছেলে বিপিন, তেমন অভাব কখনও কল্পনা করে নাই। ধাক্কা খাইয়া বিপিন প্রথম বুঝিল যে, সংসারে একটি টাকা খরচ করা যত সহজ, সেই টাকাটি উপার্জন করাতত সহজ নয়। টাকা যেখানে-সেখানে পড়িয়া নাই, আয় করিয়া তবে ঘরে আনিতে হয়।

কিছুকাল কষ্টভোগের পর বিপিন প্রতিবেশীদের পরামর্শে বাবার পুরানো চাকুরিস্থলে গিয়া উমেদার হল। অনাদিবাবু বিপিনের বাবাকে যথেষ্ট ভালবাসিতেন, এক কথায় বিপিনকেচাকুরি দিলেন।

আজ প্রায় এক বছরের উপর বিপিন এখানে চাকুরি করিতেছে। কিন্তু তাহার এ চাকুরি আদৌ ভাল লাগে না। যত দিন যাইতেছে, ততই বিপিনের বিতৃষ্ণা বাড়িতেছে চাকুরির উপর। ইহার অনেক কারণ আছে,—প্রথম ও প্রধান কারণ, অনাদিবাবু ও তাঁহার স্ত্রীর টাকার তাগাদায়তাহার রাত্রে ঘুম হয় না। রোজ টাকা আদায় হয় না—ছোট জমিদারি, তেমন কিছু আয়েরসম্পত্তি নয়, অথচ তাঁহাদের প্রতিদিনের বাজারখরচের জন্যও নায়েবকে টাকা পাঠাইতে হইবে। কেবল টাকা পাঠাও, টাকা পাঠাও-এই বুলি।

রাত্রে ঘুমাইয়া সুখ হয় না, কাল সকালেই অনাদিবাবুর চিরকুট লইয়া বীরু হাড়ি পলাশপুরহইতে আসিয়া হাজির হইবে। খাইয়া ভাত হজম হয় না উদ্বেগে।

আর একটি কারণ, ধোপাখালির এই কাছারিতে একা বারো মাস থাকা তাহার পক্ষে ভীষণকষ্টকর।

বিপিন এখনও যুবক, চার-পাঁচ বছর আগেও সে বাপের পয়সা হাতে পাইয়া যথেষ্ট স্ফূর্তি করিয়াছে, সে আমাদের রেশ এখনও মন হইতে যায় নাই। বন্ধুবান্ধব লইয়া আড্ডাদেওয়ার সুখ সে ভালই বোঝে, যদিও পয়সার অভাবে আজ অনেকদিন হইল সে সব বন্ধ আছে, তবুও গল্পগুজব করিতেও তো মন চায়, তাহাতে তো পয়সা লাগে না। বাড়িতেথাকিতে বাড়িতেই দুই বেলা কত লোক আসিত, গল্প করিত। এই দুরবস্থার উপরও বিপিনতাহাদিগকে চা খাওয়ায়, তামাক খাওয়ায়, বন্ধুবান্ধবদের পান খাওয়ানোর জন্য প্রতি হাটে তাহার এক গোছ পান লাগে। অত পান সাজিতে হয় বলিয়া মনোরমা কত বিরক্তি প্রকাশ করে; কিন্তু বিপিন মানুষ-জনের যাতায়াত বড় ভালবাসে, তাহাদের আদর-আপ্যায়ন করিতে ভালবাসে। দুরবস্থায় পড়িলেও তাহার নজর ছোট নয় নাই, জমিদারবাবু ও তাহার গৃহিণীরমতো।

ধোপাখালি গ্রামে ভদ্রলোকের বাস নাই, যত মুচি, গোয়ালা, জেলে প্রভৃতি লইয়া কারবার। তাহাদের সঙ্গে যতক্ষণ কাজ থাকে, ততক্ষণই ভাল লাগে। কাজ ফুরাইয়া গেলেতাহাদের সঙ্গ বিপিনের আর এতটুকুও সহ্য হয় না। অথচ একা থাকাও তাহার অভ্যাস নাই।নির্জন কাছারিঘরে সন্ধ্যাবেলা একা বসিয়া থাকিতে মন হাঁপাইয়া উঠে। এমন একটা লোক নাই, যাহার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করা যায়। আজকাল এই সময়ে মানীর কথাই বেশি করিয়া মনেপড়ে। কাছারির চাকর ছোকরা ফিরিয়া আসে, কোনো কোনো দিন তাহার সঙ্গে সামান্য একটুগল্প-গুজব হয়। তারপর সে রান্নার যোগাড় করিয়া দেয়, বিপিন রাঁধিতে বসে। কাছারির বাদামগাছটার পাতায় বাতাস লাগিয়া কেমন একটা শব্দ হয়, ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকি জ্বলে, জেলে-পাড়ার গদাধর পাড়ুইয়ের

বাড়িতে রোজ রাত্রে পাড়ার লোক জুটিয়া হরিনাম করে, তাহাদের খোল-করতালের আওয়াজ পাওয়া যায়, ততক্ষণ রান্না-বাড়া সারিয়া বিপিন খাইতেবসে।

৫

এক-একদিন এই সময় হঠাৎ কামিনী আসিয়া উপস্থিত হয়। হাতে একবাটি দুধ। রান্নাঘরে উঁকিমারিয়া বলে, খেতে বসলে নাকি বাবা?

—এসো মাসি, এসো। এই সবে বসলাম খেতে।

—এই একটু দুধ আনলাম। ওরে শম্ভু, বাবুকে বাটিটা এগিয়ে দে দিকি। আমি আররান্নাঘরের ভেতর যাব না।

—না, কেন আসবে না মাসি? এসো তুমি। বসো এখানে, খেতে খেতে গল্প করি।

কামিনী কিন্তু দরজার চৌকাঠ পার হইয়া আর বেশি দূর এগোয় না। সেখান হইতে গলাবাড়াইয়া বিপিনের ভাতের থালার দিকে চাহিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলে, কি রাঁধলে আজএবেলা?

—আলুভাতে, আর ওবেলার মাছ ছিল।

—ওই দিয়ে কি মানুষ খেতে পারে? না খেয়ে খেয়ে তোমার শরীর ওইরকমরোগাকাঠি! একটু ভাল না খেলে-দেলে শরীর সারবে কেমন করে? তোমার বাবার আমলেদুধ-ঘিয়ের সোত বয়ে গিয়েছে কাছারিতে। এই বড় বড় মাছ! তরিতরকারির তো কথাই—

বিপিন জানে, কামিনী মাসি বাবার কথা একবার উঠাইবেই কথাবার্তার মাঝখানে। সেকথা না উঠাইয়া বুড়ি যেন পারে না। সময়ের স্রোত বিনোদ চাটুজ্জে নায়েবের পর হইতেই বন্ধহইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছে, কামিনী মাসির পক্ষে তাহা আর এতটুকুঅগ্রসর হয় নাই।

পৃথিবী নবীন ছিল, জীবনে আনন্দ ছিল, আকাশ-বাতাসের রং অন্যরকমই ছিল। দুধ ঘিঅপর্যাপ্ত ছিল, কাছারির দাপট ছিল, ধোপাখালিতে সত্যযুগ ছিল—বিনোদ চাটুজ্জে নায়েবেরআমলে।

সেসব দিন আর কেহ ফিরাইয়া আনিতে পারিবে না। বিনোদ চাটুজ্জের সঙ্গে সঙ্গে সবশেষ হইয়া গিয়াছে।

ভোজনের উপকরণের স্বল্পতার জন্য কামিনী মাসির অনুযোগ এক প্রকার নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তাহা ছাড়া, কামিনী মাসি প্রায়ই দুধটুকু, ঘিটুকু, কোনো দিন বা এক ছড়া পাকা কলাখাইবার সময় লইয়া হাজির হইবেই।

খানিকটা আপনমনে পুরানো আমলের কাহিনীর বর্ণনা করিয়া বৃদ্ধা উঠিয়া চলিয়া যায়।সে বর্ণনা প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিপিন শুনিয়া আসিতেছে আজ এক বছর। তবুও আবার শুনিতেহয়, তাহারই পরলোকগত পিতার সম্বন্ধে কথা, না শুনিয়া উপায় কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

দিন দশেক পরে বিপিন বাড়ি হইতে স্ত্রীর চিঠি পাইয়া জানিল, তাহার ভাই বলাই রাণাঘাট হাসপাতালে আর থাকিতে চাহিতেছে না। বউদিদিকে অনবরত চিঠি লিখিতেছে দাদাকে বলবউদিদি, আমায় এখান থেকে বাড়ি নিয়ে যেতে। আমার অসুখ সেরে গিয়েছে, আর এখানেথাকতে ভাল লাগে না।

স্ত্রীর চিঠি পাইয়া বিপিন খুব খুশি হইল না। ইহাতে শুধু কয়েকটি মাত্র সাংসারিক কাজেরকথা ছাড়া আর কিছুই নাই। এমন কিছু বেশি দিন তাহাদের বিবাহ হয় নাই যে, দুই একটিভালবাসার কথা চিঠিতে সে স্ত্রীর নিকট হইতে আশা করিতে পারে না।

আজ বলিয়াই বা কেন, মনোরমা কবেই বা চিঠিতে মধু ঢালিয়াছিল? অবশ্য এ কথা খানিকটা সত্য যে, এতদিন সে বাড়িতেই ছিল, মনোরমার কোনো প্রয়োজন ঘটে নাই তাহাকেচিঠি লিখিবার। তবুও তো সে এক বৎসর পলাশপুরে চাকুরি করিতেছে, তাহার এই প্রথম স্ত্রীরনিকট হইতে দূরে বিদেশে প্রবাসযাপন, অন্য অন্য স্ত্রীরা কি তাহাদের স্বামীদের নিকট এ অবস্থায়এই রকম কাঠখোট্টা চিঠি লেখে?

বিপিন জানে না, এ অবস্থায় স্ত্রীরা স্বামীদের কি রকম চিঠি লেখে। কিন্তু তাহার বিশ্বাস, বিরহিণী স্ত্রীর বিরহবেদনায় অস্থির হইয়া প্রবাসী স্বামীদের নিকট কত রকমে তাহাদের মনের ব্যথা জানায়, বার বার মাথার দিব্য দিয়া বাড়ি আসিতে অনুরোধ করে। নাটক-নভেলে সেএইরূপ পড়িয়াছেও বটে। প্রথম কথা, মনোরমা তাহাকে চিঠিই কয়খানা লিখিয়াছে এক বছরেরমধ্যে? পাঁচ-ছয়খানার বেশি নয়। অবশ্য তাহার একটা কারণ বিপিন জানে, সংসারে পয়সারঅনটন। একখানা খামের দাম চার পয়সা, সংসারের খরচ বাঁচাইয়া জোটানো মনোরমার পক্ষেসহজ নয়। সে যাক, কিন্তু সেই চার-পাঁচখানা চিঠিতেও কি দুই একটা ভাল কথা লেখা চলিত না? মনোরমার চিঠি আসে, টাকা পাঠাও, চাল নাই, তেল নাই, অমুকের কাপড় নাই, তুমিকেমন আছ, আমরা ভাল আছি। কখনও এ কথা থাকে না, একবার বাড়ি এসো,তোমাকে অনেকদিন দেখি নাই, দেখিতে ইচ্ছা করে।

বিপিন চিঠি পাইয়া বাড়ি যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল, স্ত্রীকে দেখিবার জন্য নয়, বলাইকে হাসপাতাল হইতে বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য। ছোট ভাইটিকে সে বড় ভালবাসে।রাণাঘাটের হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে তাহার কষ্ট হইতেছে, বাড়ি যাইতে চায়, ভরসা করিয়াদাদাকে লিখিতে পারে নাই, পাছে দাদা বকে। তাহাকে বাড়ি লইয়া যাইতেই হইবে। সেপলাশপুর রওনা হইল।

তিন দিনের ছুটি চাহিতেই জমিদারবাবু বলিলেন, এই তো সেদিন এলে হে বাড়ি থেকে, আবার এখুনি বাড়ি কেন?

বিপিন জমিদারকে সমীহ করিয়া স্ত্রীর চিঠির কথা পূর্বে বলে নাই, এখন বলিল। ভাইকেহাসপাতাল হইতে লইয়া যাইবার কথাও বলিল।

অনাদিবাবু অপ্রসন্ন মুখে বলিলেন, যাও, কিন্তু তুমি বাড়ি গেলে আর আসতে চাও না। জামাই চলে গিয়েছেন, মানী এখানে রয়েছে, সামনের শনিবারে আবার জামাই আসবেন। রোজ দু-তিন টাকা খরচ। তুমি মহাল থেকে চলে এলে আদায়-পত্তর হবে না, আমি পড়ে যাব বিষম বিপদে; তিন দিনের বেশি আর এক দিনও যেন না হয়, বলে দিলাম।

মানীর সঙ্গে দেখা করিবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও বিপিন দেখিল, তাহা একরূপ অসম্ভব। সেথাকে বাড়ির মধ্যে, তাহাকে ডাকিয়া দেখা করিতে গেলে হয়তো মানীর মা সেটা পছন্দ করিবেন না।

যাইবার পূর্বমুহূর্তে কিন্তু বিপিন ইচ্ছাটা কিছুতেই দমন করিতে পারিল না। একটিমাত্র ছুতা ছিল, বিপিন সেইটাই অবলম্বন করিল। সে যাইবার পূর্বে একবার জমিদার-গৃহিণীর নিকট বিদায় লইতে গেল।

—ও মাসিমা, কোথায় গেলেন, ও মাসিমা?

ঝি বলিল, মা ওপরে পুজোয় বসেছেন, দেরি হবে নামতে, এই বসলেন।বিপিন একবার ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, তাই তো! বসবার তো সময় নেই!

রাণাঘাট হাসপাতালে যেতে হবে! একটা কথা ছিল, আচ্ছা আর কেউ আছে? কথাটা না হয়বলে যেতাম!

—দিদিমণিকে ডেকে দোব? দিদিমণি রান্না-বাড়িতে রয়েছে, দেখব?

—তা মন্দ নয়। তাই না হয় দাও, কথাটা বলেই যাই।

ঝি বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরে মানী বাহিরের রোয়াকে আসিয়াদাঁড়াইয়া বলিল, এই যে বিপিনদা! কখন এলে?

—এসেছি ঘণ্টা দুই হল। কর্তার কাছে কাজ ছিল, আমি তিন দিনের ছুটি নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি।

ঝি তখনও রোয়াকে দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া মানী বলিল, যা তো হিমি, ওপরে আমারঘর থেকে কর্পূরের শিশিটা নিয়ে বামুন-ঠাকরুণকে রান্নাঘরে দিয়ে আয়।

ঝি চলিয়া গেল।

মানী বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, দু'ঘণ্টা এসেছ বাইরে? কই, আমি তো শুনিনি ! চা খেয়েছ?

—না।

—তুমি কখন যাবে? কেন, এখন হঠাৎ বাড়ি যাচ্ছ যে?

বিপিন এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নকণ্ঠে বলিল, সে কৈফিয়ত তোমার বাবার কাছে দিতেহয়েছে একদফা, তোমার কাছেও আবার দিতে হবে নাকি!

—নিশ্চয় দিতে হবে। আমি তো জমিদারের মেয়ে, দেবে না কেন?

—তবে দিচ্ছি। আমার ভাই বলাইকে তোর মনে আছে? সে একবার কেবল বাবারসঙ্গে এখানে এসেছিল, তখন সে ছেলেমানুষ। সে রাণাঘাট হাসপাতালে—

তারপর বিপিন সংক্ষেপে বলাইয়ের অসুখের ব্যাপারটা বলিয়া গেল।

মানী বলিল, চা খেয়ে যাও। বসো,আমি করে আনি।

বিপিন রাজী হইল না। বলিল, থাক মানী, আমায় অনেকটা পথ যেতে হবে এইঅবেলায়। একটা কথা জিজ্ঞেস করি—যদি আমার আসতে দু-এক দিন দেরি হয়, কর্তাবাবুকে বলে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে দিতে পারবি?

মানী বরাভয় দানের ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া চাপা হাসিমুখে কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সুরে বলিল, নির্ভয়ে চলে যাও, বিপিনদা। অভয় দিচ্ছি, দিন তিনের জায়গায় সাত দিন থেকে এসো। বাবাকেশান্ত করবার ভার আমার ওপর রইল।

বিপিন হাসিয়া বলিল, বেশ, বাঁচলাম। দেবী যখন অভয় দিলে, তখন আর কাকে ডরাই!চলি তবে।

—না, একটু দাঁড়াও। কিছু না খেয়ে যেতে পারবে না। কোন্সকালে ধোপাখালি থেকেখেয়ে বেরিয়েছ, একটু জল খেয়ে যেতেই হবে। আমি আসছি।

মানী উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরে একখানা আসন আনিয়া রোয়াকের একপাশে পাতিয়া দিয়া বলিল, এসো,বোসো উঠে।— বলিয়াই সে আবার ক্ষিপ্রপদে অদৃশ্য হইল।

মানীর আগ্রহ দেখিয়া বিপিন মনে কেমন এক ধরনের অপূর্ব আনন্দ অনুভব করিল। এ অনুভূতি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন, এমন কি সেদিন পোলাও খাওয়ানোর দিনও হয় নাই। সেদিন সে সে-ব্যাপারটাকে খানিকটা সাধারণ ভদ্রতা, খানিকটা মানীর রাঁধিবার বাহাদুরিদেখানোর আগ্রহের ফল বলিয়া ভাবিয়াছিল। কিন্তু আজ মনে হইল, মানীর এ টান আন্তরিক, মানী তাহার সুখদুঃখ বোঝে। বিপিনের সত্যই ক্ষুধা পাইয়াছে। ভাবিয়াছিল, রাণাঘাটের বাজারে কিছু খাইয়া লইয়া তবে মিশন হাসপাতালে যাইবে। আচ্ছা, মানী কি করিয়া তাহা বুঝিল?

একটা থালায় মানী খাবার আনিয়া বিপিনের সামনে রাখিয়া বলিল, খেয়ে নাও। আমিচায়ের জল বসিয়ে এসেছি, দৌড়ে চা করে আনি।

থালার দিকে চাহিয়া বিপিনের মনে হইল, বাড়িতে এমন কিছু খাবার ছিল না, তেমন কৃপণই বটে জমিদার-গিন্নি! মানী বেচারি হাতের কাছে তাড়াতাড়ি যাহা পাইয়াছে—কিছু মুড়ি, এক থাবা দুধের সর, খানিকটা গুড়, এরই মধ্যে আবার দুইখানা থিন্ এরারুট বিস্কুট— তাহাই আনিয়া ধরিয়া দিয়াছে।

মানী ইতিমধ্যে একমালা নারিকেল ও একখানা দা হাতে ব্যস্তভাবে আসিয়া হাজির হইল।কোথা হইতে নারিকেল মালাটি খুঁজিয়া টানিয়া বাহির করিয়াছে এইমাত্র।

—নারকোল খাবে বিপিনদা? দাঁড়াও একটু নারকোল কেটে দিই। কুরুনিখানা খুঁজে পেলাম না। তোমার আবার দেরি হয়ে যাবে, কেটেই দিই, খাও। মুড়ি দিয়ে সর দিয়ে গুড় দিয়েমাখো না। আস্তে আস্তে বসে খাও, আবার কখন খাবে তার ঠিক নেইকো। চা আনি।

একটু পরে চা হাতে যখন মানী আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বিপিন যেন নূতন চোখে মানীকেদেখিল।

মানী যেন তাহার কাছে এক অননুভূতপূর্ব বিস্ময়ও তৃপ্তির বার্তা বহন করিয়া আনিল।এই আগ্রহভরা আন্তরিকতা, এই যত্ন বিপিন কখনও মনোরমার নিকট হইতে পায় নাই। মনোরমা যে তাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে, ভালবাসে না—তাহা নয়। সে অন্য ধরনের মেয়ে, গোটা সংসারটার দিকে তাহার দৃষ্টি—মা, বীণা, ছেলেমেয়ে, এমন কি বাড়ির কৃষাণের দিকে পর্যন্ত। একা বিপিনের সুখদুঃখ দেখিবার অবকাশ তাহার নাই, বিপিন নিজের সংসারেপাঁচজনের মধ্যে একজন হইয়া মনোরমার যৌথ সেবার কিছু অংশ পাইয়া আসিয়াছে এতদিন। তাহাতে এমন তৃপ্তি কোনো দিন সে পায় নাই।

চা পান শেষ করিয়া বিপিন উঠিল। বলিল, মাসিমার সঙ্গে দেখা হল না, বলিস আমার কথা মানী, চললুম।

—এসো। কিন্তু বেশি দিন দেরি করলে চাকরির জন্যে দায়ী আমি নয়, মনে থাকে যেন।

—খানিকটা আগে অভয় দিয়েছ দেবী, মনে আছে?

—দু'মাস দেরি করলেও কি অভয় দেওয়া বহাল হইল? বাঃ রে, আমি বলেছি তিনদিনের জায়গায় সাত দিন, না হয় ধরো দশ দিন!

—না হয় ধরো এক মাস!

—না হয় ধরো তিন মাস! সে সব হবে না, সোজা কথা শোনো বিপিনদা, আমার তো বাবার কাছে বলবার মুখ থাকা চাই।

পরে গম্ভীরমুখে বলিল, কথা দিয়ে যাও, ক'দিনে আসবে। না, সত্যি, তোমার কথা আমার বিশ্বাস হয় না, আমি কি বলেছিলুম প্রথম দিন, মনে আছে?

বিপিন কৃত্রিম ব্যঙ্গের সুরে বলিল, হ্যাঁ, বলেছিলে, চাকরিতে টিকে থাকলে তুমি আমারভালর চেষ্টা করবে।

মানী হাসিয়া বলিল, মনে আছে তা হলে? বেশ, এখন এসো তা হলে—বেলা গেল।

পথে উঠিয়াই মানীর কথা মনে করিয়া বিপিনের দুঃখ হইল। বেচারি ছেলেমানুষ, সংসারের কি জানে! জমিদারির যা অবস্থা, মানী কি উন্নতি করিয়া দিবে তাহার? দেনা ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজারে দাঁড়াইয়াছে রাণাঘাটের গোবিন্দ পালের গদিতে। সদর খাজনা দিবারসময় প্রতি বৎসর তাহার নিকট হ্যান্ডনোট কাটিতে হয়। ইহা অবশ্য বিপিন এখানে চাকুরিতেভর্তি হইবার পূর্বের ঘটনা, খাতাপত্র দেখিয়া বিপিন জানিতে পারিয়াছে। গোবিন্দ পাল নালিশ ঠুকিলেই জমিদারি নিলামে চড়িবে।

মানী মেয়েমানুষ, বিষয়-সম্পত্তির কি বোঝে! ভাবিতেছে, সে মস্ত জমিদারের মেয়ে, চেষ্টা করিলেই বিপিনদাদার বিশেষ উন্নতি করিয়া দিতে পারিবে। বিপিনের হাসি পাইল, দুঃখওহইল। বেচারি মানী!

২

রাণাঘাট হাসপাতালে বিপিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করিল। বলাই তাহাকে দেখিয়া কান্নাকাটিকরিতে লাগিল বাড়ি লইয়া যাইবার জন্য। কিন্তু বিপিনের মনে হইল, ভাই যে সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে তাহা নয়, এ অবস্থায় তাহাকে লইয়া যাওয়া কি উচিত হইবে?

বিপিন কৈবর্ত্যের মেয়ে সেই নার্সটিকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল, আমার ভাই বাড়ি যেতেচাইছে, কান্নাকাটি করছে, ওকে এখন নিয়ে যেতে পারি ?

নার্স বলিল, নিয়ে যাও বাবু, তোমার ভাই আমাকে পর্যন্ত জ্বালাতন করে তুলেছে বাড়িযাব বাড়ি যাব করে। নেফ্রাইটিসের রুগী, যা সেরেছে, ওর বেশি আর সারবে না। কেন এখানেমিথ্যে রেখে কষ্ট দেবে!

তাহার মনে হইল, নার্স যেন কি চাপিয়া যাইতেছে। সে বলিল, ও কি বাঁচবে না?

নার্স ইতস্তত করিয়া বলিল, না, তা কেন, তবে শক্ত রোগ। বাড়ি নিয়ে গিয়ে একটুসাবধানে রাখতে হবে। নিয়েই যাও বাড়ি, এখন তো অনেকটা সেরেছে।

বিপিনের মনটা খারাপ হইয়া গেল। সে গিয়া মিশনের বড় ডাক্তার আর্চার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিল।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। আর্চার সাহেব নিজের বাংলোর বারান্দায় ইজি-চেয়ারে চুপ করিয়াবসিয়া ছিলেন। বয়স প্রায় পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন, দীর্ঘাকৃতি, সবল চেহারা। মাথার সামনে টাক পড়িয়াগিয়াছে। আজ ত্রিশ বৎসর এখানে আছেন, বড় ভাল লোক, এ অঞ্চলের সকলে আর্চারসাহেবকে ভালবাসে।

বিপিন গিয়া বলিল, নমস্কার, ডাক্তার সাহেব।

আর্চার সাহেব বিপিনকে চেনেন না, বলিলেন, এসো,আপনি কি বলছেন?

আর্চার সাহেব বাংলা বলেন বটে, তবে একটু ভাবিয়া, একটু ধীরে ধীরে, যেখানে জোর দেওয়া উচিত সেখানে জোর না দিয়া এবং যেখানে জোর দেওয়া উচিত নয় সেখানে জোরদিয়া।

বিপিন বলিল, আমার ভাই বলাই চাটুজ্জে ছ' নম্বর ওয়ার্ডে আছে, নেফ্রাইটিসের অসুখ, তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারি? সে বড় ব্যস্ত হয়েছে বাড়ি যাবার জন্যে!

—হাঁ হাঁ, ওই ওয়ার্ডের ছোকরা রুগী। নিয়ে যান।

—সাহেব, ও কি সেরেছে?

—সে পূর্বের অপেক্ষা সেরেছে। কঠিন রোগ, একেবারে ভাল ভাবে সারতে এক বছর লাগবে। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যত্ন করবেন, মাংস খেতে দেবেন না।

—তা হলে কাল সকালে নিয়ে যাব?

—আপনি রাত্রে কোথায় থাকবেন? আমার বাড়িতে থাকুন, আমার এখানে ডিনারখাবেন। মুকুন্দ, ও মুকুন্দ!

—আমরা এখানে আত্মীয় আছেন সাহেব, তাদের বাড়ি বলে এসেছি, সেখানেই থাকব।আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।

বিপিন রাত্রে বাজারের নিকট তাহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ি থাকিয়া, পরদিন সকালে ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়া আনিয়া ভাইকে লইয়া স্টেশনে গেল।

বলাইয়ের বয়স বেশি নয় কুড়ি-একুশ। রোগ হওয়ার পূর্বে তার শরীর খুব ভাল ছিল, বিপিনের সংসারের ক্ষেতখামারের অনেক কাজ সে একাই করিত।

মধ্যে যখন বিপিনের বদখেয়ালিতে পৈতৃক অর্থ সব উড়িয়া গেল, সংসারে ভয়ানক কষ্ট, সংসার একেবারে অচল, তখন বলাই আঠারো বছরের ছেলে। বলাই দেখিল, দাদার মতিবুদ্ধি তাহাদের অনাহারের ও দারিদ্র্যের পথে লইয়া চলিয়াছে, যদি বাঁচিতে হয় তাহাকে লেখাপড়াছাড়িতে হইবে এবং বুক দিয়া খাটিতে হইবে।

নদীর ধারের কাঁঠালবাগান বাঁধা দিয়া সেই টাকায় সে একজোড়া বলদ কিনিয়া গরুর গাড়ি চালাইতে লাগিল নিজেই। লোকের জিনিসপত্র গাড়ি বোঝাই দিয়া অন্যত্র লইয়া যাইবারভাড়া খাটিত, স্টেশনে সওয়ারি লইয়া যাইত। অনেকে নিন্দা করিতে লাগিল। একদিন বৃদ্ধ যদু মুস্তাফি ডাকিয়া বলিলেন, হ্যাঁ হে বলাই, তুমি নাকি গরুরগাড়ির গাড়োয়ানি করো?

বলাই একটু ভয়ে ভয়ে বলিল, হ্যাঁ, জ্যাঠামশাই।

—সেটা কি রকম হল ? বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে হয়ে অমন বংশের নাম ডোবাবে তুমি!কাল শুনলাম, বাজারের নিবারণ সাহার বাড়ি তৈরি হচ্ছে, সেখানে আট-দশ গাড়ি বালি বয়েছনদীর ঘাট থেকে সারাদিন, এতে মান থাকবে?

বলাই একটু ভীতু ধরনের ছেলে। বয়সে বড় ভারিক্কি মুস্তাফিমহাশয়কে তাহার বাবাবিনোদ চাটুজ্জে পর্যন্ত সমীহ করিয়া চলিতেন। সেখানে সে আঠারো বছরের ছেলে কি তর্ককরিবে? তবুও সে বলিল, জ্যাঠামশাই, এ না করলে যে সংসার চলে না, মা বোন না খেয়ে মরে। দাদা তো ওই কাণ্ড করছে, দাদার ওপর আমি কিছু বলতে তো পারি না, মাঠের জমি, খাস জমি সব দাদা বিক্রি করছে আর মৌরুসী দিচ্ছে, মার হাতে একটা পয়সা রাখেনি— সবনেশাভাঙে উড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কি খেয়ে বাঁচব বলুন তো? এতে তবুও দিনে এক টাকাগড়ে আয় হচ্ছে। বালির গাড়ি ছ' আনা করে ভাড়া নদীর ঘাট থেকে বাজার পর্যন্ত। কাল সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত এগারো গাড়ি বালি বয়েছি—ছেষট্টি আনা—চার টাকা দু আনা একদিনের রোজগার। এ অন্যভাবে আমায় কে দিচ্ছে বলুন?

সে দুর্দিনে বলাই মান-অপমান বিসর্জন দিয়া বুক দিয়া না পড়িলে সংসার অচল হইত।বলাই গরুরগাড়ির গাড়োয়ানি করিয়া লাঙ্গল করিল, জমি চাষ করিয়া ধান বুনিল, আটির মাঠে কুমড়া করিল এবং সেই কুমড়া কলিকাতায় চালান দিয়া সেবার প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ টাকা লাভকরিল।

বিপিনকে বলিল, দাদা, বাগদী-পাড়ার নন্দ বাগদীর গোলাটা কিনে আনছি, এবার ধানরাখবার জায়গা চাই, ধান হবে ভাল।

বিপিন বলিল, নন্দ বাগদীর অত বড় গোলা এনে কি করবি, আমাদের তিন বিঘে জমিরধান এমন কি হবে যে তার জন্যে অত বড় গোলার দরকার! দামও তো বেশি চাইবে!

বলাই বলিয়াছিল, বারণ কোরো না দাদা। বড় গোলাটা বাড়ি থাকলে লক্ষ্মীশ্রী। আমার ওই গোলা দেখলে কাজে উৎসাহ হবে যে ওটা পুরিয়ে দিতেই হবে আসছে বছর। ওটাই আনি, কিবলো দাদা?

সংসারের জন্য অনিয়মিত খাটিয়া খাটিয়া বলাই পড়িয়া গেল শক্ত অসুখে। কিছুদিনদেশেই রাখিয়া চিকিৎসা চলিল। সে চিকিৎসাও এমন বিশেষ কিছু নয়, গ্রাম্য হোমিওপ্যাথিকডাক্তার শরৎ দাঁ দিন পনেরো সাদা শিশিতে কি ঔষধ দিতেন, তাহাতে কিছু না হওয়ায় গ্রামেরঅনেকের পরামর্শে বলাইকে রাণাঘাটের হাসপাতালে আনা হয়।

বলাই এখনও ছেলেমানুষ তাহার উপর অনেক দিন রোগশয্যায় শুইয়া থাকিবার পরেআজ দাদার সঙ্গে বাড়ি ফিরিয়া যাইবার আনন্দে সে অধীর হইয়া উঠিয়াছে। রেলগাড়িতেউঠিয়া একবার এ-জানালায় একবার ও-জানালায় ছুটাছুটি করিতেছে, কতকাল পরে আবার সে নীরোগ হইয়া মুক্ত স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিতে পাইয়াছে! নার্সের কথামত আর ভয়ে ভয়ে চলিতে হইবে না। হাসপাতালের রান্না কি বিশ্রী! মাছের ঝোল না ছাই! মায়ের হাতের, বউদিদির হাতের রান্না আজ প্রায় চার মাস খায় নাই, বউদিদির হাতের সুক্তুনির তুলনা আছে?

পাঁচিলের পশ্চিম কোণে বড় মানকচুটা সে নিজের হাতে পুঁতিয়াছিল। এখন না জানি কতবড় হইয়াছে! ভগবান যদি দিন দেন এবং তাহাকে খাটিতে দেন, তবে গাঙের ধারেকদমতলার বাঁকে ভাল জমি খাজনা করিয়া লইবে এবং তাহাতে শসা, বরবটি এবং পালংশাক করিবে।

হাসপাতালে থাকিতে নার্সের মুখে শুনিয়াছে, পালংশাক ও বরবটি নাকি খুব ভাল তরকারি। কলিকাতায় দামে বিক্রয় হয়।

বিপিনকে জিজ্ঞাসা করিল, দাদা, কাপালীপাড়ার রাইচরণের পিসির কাছে বলা ছিল, ওদের ঝাল হলে আমাদের সূর্যমুখী ঝালের বীজ দিয়ে যাবে। তুমি দেখনি, সে ঝাল রাঙা টুকটুককরছে, এক-একটা এত বড়—বীজ দিয়ে গিয়েছিল, জানো? আমি এবার চাট্টি ঝাল পুঁতে দেবআমড়াতলায় নাবাল জমিটাতে।

দাদার চাকুরি হওয়াতে বলাই খুব খুশি।

তখন সে একা খাটিয়া সংসার চালাইত। আজকাল দাদার মতিবুদ্ধি ফিরিয়াছে, দাদা আবার পুরানো জমিদার-ঘরে বাবার সেই পুরানো চাকুরি করিতেছে, ইহার অপেক্ষা আনন্দেরবিষয় আর কি আছে!

দুই ভাইয়ে মিলিয়া খাটিলে সংসারের উন্নতি হইতে কত দেরি লাগিবে? সে নিজেবিবাহ করে নাই, করিবেও না। মা, বউদিদি, ভানু, বীণা—এরা সুখী হইলেই তাহার সুখ।গোলা দেখিলে মায়ের চোখ দিয়া জল পড়ে। মা বলে, কর্তার আমলে এর চেয়েও বড় গোলাছিল বাড়িতে, আজকাল দুটো লক্ষ্মীর চিঁড়ে কোটার ধান পাই না।

মায়ের চোখের জল সে ঘুচাইবে। বাবার গোলা ছিল পনেরো হাতের বেড়, সে গোলাবাঁধিবে আঠারো হাতের বেড়।

৩

বেলা এগারোটার সময় বিপিন ও বলাই বাড়ি পৌঁছিল।

ইহাদের আজই বাড়ি আসিবার কোনো সংবাদ দেওয়া ছিল না। বিশেষত বলাইকেআসিতে দেখিয়া বিপিনের মা ছুটিয়া গিয়া রুগ্ন ছেলেকে জড়াইয়া ধরিলেন। বীণা, মনোরমা, ভানু, টুনি—সকলেই বাহির হইয়া আসিয়া রোয়াকে দাঁড়াইল।

উঃ, সেই রাণাঘাটের হাসপাতাল, আর এই বাড়ির তাহার প্রিয়জন সব—বউদিদি, মা, দিদি, খোকা, খুকি! বলাই আনন্দে কাঁদিয়াই ফেলিল ছেলেমানুষের মতো।

ভানু-টুনিও খুশিতে আটখানা। কাকাকে তাহারা ভালবাসে। এতদিন পরে কাকাকে ফিরিতে দেখিয়া তাহাদেরও আনন্দের সীমা নাই। কাকার গলা জড়াইয়া পিঠের উপর পড়িয়াতাহারা তাহাদের পুরাতন কাকাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চাহিতেছে।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিন পুঁটুলি নামাইয়া রাখিতেছে, মনোরমা আসিয়া হাসিমুখে বলিল, তা হলে আমার চিঠি পেয়েছিলে? কই, উত্তর তো দিলে না?

বিপিন বলিল, উত্তর আর কি দোব, এলাম তো চলে বলাইকে নিয়ে।

—ভালই করেছ। ঠাকুরপো তোমায় লিখতে সাহস করত না, কেবল আমায় চিঠি লিখত—আমায় বাড়ি নিয়ে যাও, আমায় বাড়ি নিয়ে যাও। আহা, ও কি সেখানে থাকতেপারে! ছেলেমানুষ, তাতে ওর প্রাণ পড়ে থাকে সংসারের ওপর। হ্যাঁগা, ওর অসুখ কেমন ? ডাক্তারে কি বললে?

—বললে তো, এখন ভালই। তবে সাবধানে রাখতে হবে। ওকে বেশি খেতে দেবে না।মাকে বলে দিয়ো, যেন যা-তা ওকে না খেতে দেয়। মাংস খেতে একেবারে বারণ কিন্তু।

তবেই হয়েছে! যা মাংস খেতে ভালবাসে ঠাকুরপো, ওকে ঠেকিয়ে রাখা ভীষণকঠিন! আর কি জানো, বাড়ি এসেছে, এখন ওর আবদারের জ্বালায় ওকে মাংস না দিয়ে পারাযাবে? তুমি যে ক'দিন বাড়ি আছ, তারপর ও কি কারও কথা মানবে? নিজেই পাড়া থেকে খাসিকাটিয়ে ভাগাভাগি করে বিলি করে দিয়ে নিজের ভাগে দেড় সের মাংস নিয়ে এসে ফেলবে!

—না না, তা হতে দিয়ো না, দিলেই অসুখ বাড়বে। ভয় দেখাবে যে, তোমার দাদাকেচিঠি লিখব, ওসব ছেলেমানুষি চলবে না।—বউদিদিকে দেখছি না?

—দিদি তো এখানে নেই। তাকে উলোর পিসিমা নিয়ে গেছেন আজ দিন পনেরো হল।তিনি এসেছিলেন গঙ্গাচ্চান করতে কালীগঞ্জে, আমাদের এখানেও এলেন, সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন যাবার সময়ে।

বিপিন এ সংবাদে খুব খুশি হইল না। বলিল, নিয়ে গেলেন মানে তো তার সংসারেদাসীবৃত্তি করার জন্যে নিয়ে যাওয়া। ওসব আমি পছন্দ করি না।

মনোরমা বলিল, পছন্দ তো করো না, কিন্তু এখানে খায় কি তা তো দেখতে হবে। তুমিচলে গেলে পলাশপুরে, আমাদের হাতে তো একটি পয়সা দিয়ে গেলে না।একদিন এমনহল—দুটিখানি পান্তা-ভাত ছিল, ভানু-টুনিকে দিয়ে আমরা সবাই উপোস করে রইলাম।কাউকে কিছু বলতেও পারি না, জাত যায়। পাড়ায় রোজ রোজ কে ধার চাইতে গেলে দেয় বল দিকি? আমি তো বললুম, উপোস করে মরি সেও ভাল, কারও বাড়ি, কি রায়গিন্নির কাছে, কিদুলুর মার কাছে, কি লালু চক্কত্তির মার কাছে চাইতে যেতে আমি পারব না।

কথাগুলি ন্যায্য এবং মনোরমা যে মিথ্যা বলিতেছে না, বিপিন তাহা বুঝিল। বুঝিলেওকিন্তু এসব কথা বিপিনের আদৌ ভাল লাগিল না।

যেমনই বাড়িতে পা দিয়াছে, অমনই সতরো গণ্ডা অভাব-অভিযোগের কাহিনী সাজাইয়ামনোরমা বসিয়া আছে। এও তো এক ধরনের তিরস্কার! সে কেন খালি হাতে সকলকে রাখিয়াগিয়াছিল, কেন একশো টাকার থলি মনোরমার হাতে দিয়া বাড়ির বাহির হয় নাই! স্ত্রীর মুখেতিক্ত তিরস্কার শুনিতে শুনিতেই তাহার জীবন গেল! স্ত্রী কি একটুও বুঝিবে না? স্বামীরঅক্ষমতার প্রতি কি সে এতটুকু অনুকম্পা দেখাইতে পারে না?

৪

বৈকালে বিপিন গ্রামের উত্তরে মাঠের দিকে বেড়াইতে গেল। মাঠের ওপারেই একটি ছোট মুসলমান গ্রাম, নাম বেল্‌তা। সন্ধ্যার এখনও অনেক দেরি আছে দেখিয়া সে ভাবিল, না হয় এককাজ করি, আইনদ্দি চাচার বাড়ি ঘুরে যাই। অত বড় গুণী লোকটা, বলাইয়ের অসুখ সম্বন্ধে একটা পরামর্শ করে দেখি, যদি কিছু করতে পারি। অনেক মন্তরতন্তর জানে কিনা।

আইনদ্দি বাড়ির সামনে বাঁশতলায় বসিয়া মাছ-ধরা-ঘূর্ণির বাখারি চাঁচিতেছিল। চোখে সে ভাল দেখে না, বিপিনের গলার স্বর শুনিয়া চিনিতে পারিয়া বলিল, আসুন, বাবাঠাকুর, আসুন। কবে আলেন বাড়ি? এইখানা নিয়ে বসুন।—বলিয়া একখানা খেজুরপাতার চেটাই আগাইয়া দিল।

বিপিন বলিল, চাচা, তোমাকে তো কক্ষনো বিনি কাজে থাকতে দেখি না, চোখে ঠাওর হয়?

—না বাবাঠাকুর, ভাল আর কনে! হ্যাদে, একখানা চশমা এনে দিতি পারো? চশমা নলিআর চকি ভাল ঠাওর পাইনে ঝে!

—বয়েস তোমার তো কম হল না চাচা, চোখের আর দোষ কি বলো?

—তা একশো হয়েছে। যেবার মাৎলার রেলের পুল হয়, তখন আমি গরু চরাতি পারি। আপনি এখন হিসেব করে দেখ।

এ দেশে সবাই বলে আইনদ্দির বয়স একশো। আইনদ্দি নিজেও তাই বলে। আবার কেহকেহ অবিশ্বাস করে। বলে, মেরে-কেটে নব্বই বিরেনব্বই। একশো ! বললেই হল বুঝি ?

মাৎলার পুল কত সালে হয় বিপিন তাহা জানে না, সুতরাং আইনদ্দির বয়সের হিসাব তাহার দ্বারা হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া সে অন্য কথা পাড়িল। বলিল, চাচা, তুমিঅনেক রকম মন্তরতন্তর জানো, এ কথাটা তো শুনে আসছি বহুদিন!

বিপিন এই একই কথা অন্তত বিশ বার আইনদ্দিকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছে গত দশবৎসরের মধ্যে। আইনদ্দিও প্রত্যেক বারেই একই উত্তর দেয়, একই ভাবে হাত পা নাড়িয়া।আজও সে সেই ভাবেই বেশ একটু গর্বের সহিত বলিল, মন্তর! তা বেশি কথা কি বলব, আপনাদের বাপ-মার আশীর্বাদে মন্তর সব রকম জানা ছেল। সেসব কথা বলে কি হবে, এ দিগরের কোন লোকটা জানে না আমার নাম? তবে এই শোনো, শন্যভরে যাব, আগুন খাব, কাটামুণ্ডু জোড়া দেব—

বিপিন এ কথা আইনদ্দির মুখে অনেকবার শুনিয়াছে, তবুও বৃদ্ধকে ঘাঁটাইয়া এ সব কথাশুনিতে তাহার ভাল লাগে। বিপিনের হাসি পায় এ কথা শুনিলে, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, আইনদ্দির উপর শ্রদ্ধা তাহাতে কিন্তু কমে না। বিপিন যুবক, এই শতবর্ষজীবী বৃদ্ধের প্রত্যেককথা হাবভাব তাহার কাছে এত অদ্ভুত রহস্যময় ঠেকে! এইজন্যই সে বাড়ি থাকিলে মাঝে মাঝে ইহার নিকট আসিয়া খানিকক্ষণ কাটাইয়া যায়। এ যে জগতের কথা বলে, বিপিনের পক্ষেতাহা অতীতকালের জগৎ। বিপিনের সঙ্গে সে জগতের পরিচয় নাই, নাই বলিয়াই তাহারহস্যময়।

আইনদ্দি তামাক সাজিয়া হাতখানেক লম্বা এক খণ্ড সোলার নীচের দিকে বাঁশের সরু শলার সাহায্যে একটা ফুটা করিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, তামাক সেবা করো বাবাঠাকুর।

বিপিন বলিল, চাচা, তুমি কানসোনার কুঠী দেখেছ?

—খুব। তখন তো আমার অনুরাগ বয়েস। কুঠীর মাঠে নীলের চাষ দেখিছি। এইশোনবা? আমার সম্বন্ধির ছেলে জহিরদ্দি তখন জন্মায়, তিনি বড় চাকরি করত, এখন কুড়ি টাকাকরে পেন্সিল খাচ্ছে। তা ভাব তবে সে কত দিনির কথা!

বিপিন বলিল, কি চাকরি করত?

—কি চাকরি আমি জানি বাবাঠাকুর? পেন্সিল খাচ্ছে যখন, তখন বড় চাকরিই হবে।

—চাচা, একটা কবিতা বলো তো শুনি? মনে আছে?

আইনদ্দি একগাল হাসিয়া বলিল, আ আমার কপাল! কবিতা শোনবা? রামায়ণমহাভারত মুখস্থ ছেল, এখন আর কি মনে থাকে সব কথা বাবাঠাকুর? এই শোনো—

সূর্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী।।

হেনকালে তথা এক আইল মালিনী।।

কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।।

দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম ।।

গালভরা গুয়াপান পাকি মালা গলে।

কানে কড়ে কড়ে রাঁড়ি কথা কত ছলে।।

চূড়াবান্ধা চুল পরিধান সাদা শাড়ি

ফুলের চুপড়ি কাঁধে ফিরে বাড়ি বাড়ি।

বিপিন বাংলা সাহিত্যের তেমন খবর না রাখিলেও এটুকুবুঝিল যে, ইহা বিদ্যাসুন্দরেরকবিতা। বলিল, এ কবিতা তোমার মুখে কখনও শুনিনি তো চাচা? রামায়ণ মহাভারতেরকবিতাই তো বলো, এ কোথায় শিখলে?

—আমার যখন অনুরাগ বয়েস, তখন বিদ্যেসুন্দরের ভারী দিন ছেল ঝে! বিদ্যেসুন্দরেরযাত্রা হত, গোপাল উড়ের নাম শুনিছিলে? সেই গাইত বিদ্যেসুন্দর। আমরা সমবয়সী কজনপরামর্শ করে বিদ্যেসুন্দরের বই আনালাম। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর কবিওয়ালার বই। বড় ভাল লেগে গেল। তারপর আনালাম অন্নদামঙ্গল। বিদ্যেসুন্দর বই ভাল, তবে বড্ড হে-পানা—

—কি পানা চাচা?

—বড্ড হে-পানা। আপনাদের কাছে আর কি বলব, ছেলেছোকরা মানুষ তোমরা, আপনাদের কাল হতি দেখলাম, সে আর আপনি শুনে কি করবা? ওই বিদ্যে বলে একরাজকন্যে, তার সঙ্গে সুন্দর বলে এক রাজপুত্তুরের আসনাই হয়—এই সব কথা। পড়ে দেখো।বিদ্যের রূপ শোনবা কেমন ছেল?

বিনানিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।

সাপিণী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।

কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা।

পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা ।।

কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।

ভুরুর সমান কোথা ভুরুভঙ্গে ভুলে।।

কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নহিল্লোলে।।

কাঁদেরে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ করি কোলে।

কবিবর ভারতচন্দ্র স্বর্গ হইতে যদি দেখিতে পাইতেন, তবে এই বিংশ শতাব্দীতে কত নবীন প্রতিভার প্রভাবের মধ্যেও তাহার এইরূপ একজন মুগ্ধ ভক্তের মুখে তাঁহার নিজেরকবিতার উৎসাহপূর্ণ আবৃত্তি শুনিয়া নিশ্চয়ই খুব খুশি হইতেন।

বিপিনের এ কথা অবশ্য মনে হইল না, কারণ সে সাহিত্যরসিক নয়, বা কি প্রাচীন, কি আধুনিক কোনো বাংলা কবির সহিতই তাহার পরিচয় নাই। কিন্তু বিদ্যার রূপের বর্ণনা শুনিয়াতাহার কেন যে মানীর কথা মনে হইল হঠাৎ, তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। বিদ্যা তোনয়—মানী। কবি যেন তাহাকে চক্ষের সামনে রাখিয়াই এ বর্ণনা লিখিয়াছেন। মানী কাছেআসিলে তাহাকে খুব সুন্দরী বলিয়া বিপিনের মনে হয় নাই, কিন্তু দূরে গেলেই মানীকেসর্বসৌন্দর্যের আকর বলিয়া মনে হয়। তাহার চোখ যতটা ডাগর, তাহার চেয়েও ডাগর বলিয়া মনে হয়, রঙ যতটা ফর্সা তাহার চেয়েও ফর্সা বলিয়া মনে হয়, মুখশ্রী যতটা সুন্দর, তাহারচেয়েও অনেক বেশি সুন্দর বলিয়া মনে হয়।

আইনদ্দির বাড়ির পশ্চিমে বেলতার মাঠ, অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা, মাঠের ওপারেহরিদাসপুর গ্রামের বাঁশবন। সূর্য পশ্চিমে হেলিয়া পড়িলেও এখনও বেলা আছে, মাঠের মধ্যেফুলে ভরা বাবলা গাছের ডালে ডালে শালিক ও চাতারে পাখির দল কলরব করিতেছে। নিকটেচাঁদমারির বিল থাকাতে বৈকালের হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা।

বিপিনের মন কেমন উদাস হইয়া গেল।

জীবনের তাহার সুখ নাই, একমাত্র সুখের মুখ সে সম্প্রতি দেখিতে পাইয়াছে। অকস্মাৎএক ঝলক স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার মতো মানীর গত কয় দিনের কার্যকলাপ তাহার অন্ধকার জীবনেআলো আনিয়া দিয়াছে।

কিন্তু মানী তাহার কে?

কেহই নয়, অথচ সে-ই যেন সব বলিয়া আজ মনে হইতেছে।

অথচ মানী অপরের স্ত্রী—বিপিনের কি অধিকার আছে সেখানে? ইচ্ছা করিলেই কিতাহার সঙ্গে যখন-তখন দেখা করিবার উপায় আছে?

মানী কেন দুই দিনের যত্ন দেখাইয়া তাহাকে এমন ভাবে বাঁধিল।

আইনদ্দি বলিল, একখানা কুমড়ো খাবে তো চলো আমার সঙ্গে। বিলির ধারে জলি ধানেরক্ষ্যাতে আমার নাতি বসে পাখি তাড়াচ্চে, সেখানথে দেব এখন। ডাঙার ওপারেই কুমড়োরভুঁই।

চাঁদমারির বিলের ধারে ধারে দীর্ঘ জলজ পাতিঘাসের মধ্য দিয়া সুঁড়িপথ। পড়ন্ত বেলারআধশুকনো ঘাসের রোদপোড়া গন্ধের সঙ্গে বিলের জলের পদ্মফুলের গন্ধ মিশিয়াছে। বিলের এপারে সবটাই জলি ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাঁশের মাচায় বসিয়া লোকে টিনেরকানেস্তারা বাজাইয়া বাবুই পাখি তাড়াইতেছে।

আইনদ্দির নাতির নাম মাখন। এ দেশের মুসলমানদের এ রকম নাম অনেক আছে—এমন কি ভুবন, নিবারণ, যজ্ঞেশ্বর পর্যন্ত আছে।

মাখনের বয়স চল্লিশের কম নয়, চুলে পাক ধরিয়াছে। তাহার বাবার বয়স প্রায়বাহাত্তর-তিয়াত্তর। মাখন বেশ জোয়ান লোক, শুধু জোয়ান নয়, এ অঞ্চলের মধ্যে একজন ভালগায়ক বলিয়া তাহার খ্যাতি আছে।

ঠাকুরদাদাকে আসিতে দেখিয়া মাখন বলিল, মোর জলপান কনে, হ্যাঁ দাদা?

পিছনে বিপিনকে আসিতে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি মাচা হইতে নামিয়া আসিয়া বলিল, দাদাবাবু যে! কখন আলেন? আপনি সেই কোথায় নায়েবী করচ শুনেলাম, তাই ইদিকি বড়একটা যাওয়া আসা করো না বুঝি?

আইনদ্দি বলিল, বাবাঠাকুরকে একটা বড় দেখে কুমড়ো এনে দে দিকি। ওই পুবির বেড়ারগায়ে যে ক'টা বড় কুমড়ো আছে, তা থেকে একটা আন।

—হ্যাঁদে, দূর দূর, ওই দেখ বাবাঠাকুর, এক ঝাঁক বাবুই এসে জুটল আবার! সুমুন্দিরপাখিগুনো তো বড় জ্বালালে দেখচি!—বলিয়া আইনদ্দি নিজেই টিনের কানেস্তারা বাজাইতেলাগিল।

বেলা পড়িয়া রাঙা রোদ কতক জলি ধানের বিস্তীর্ণ ক্ষেতে, কতক বিলের বাবলা-বনেপড়িয়াছে, আইনদ্দির নাতি বিলের উপরের ডাঙায় কুমড়ো-ক্ষেত হইতে সুকণ্ঠে গাহিতেছে—

যখন ক্ষ্যাতে ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি

ও মোরমনে জাগে তার লয়ান দুটি—

বাবুইপাখির ঝাঁক বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছে বৃদ্ধ আইনদ্দি তাহাদের কিছুই করিতেপারিবে না, সুতরাং তাহারা নির্বিবাদে আবার আসিয়া জুটিতে লাগিল।

আইনদ্দির নাতির গানের কয়টি চরণ শুনিয়াই বিপিন আবার অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সেই দিগন্তবিস্তীর্ণ মাঠ, বিল ও বিলের ধারে ধারে সবুজ জলি ধানের ক্ষেত, উপরে এবং নীচেনাচের ধরনে উড্ডীয়মান বাবুইপাখির ঝাঁক, বিলের ধারের জলে সোলাগাছের হলদে ফুলেররাশি, হরিদাসপুরের বাঁশবনের মাথায় হেলিয়া-পড়া অস্তমান সূর্য, সব মিলিয়া তাহার মনে একঅপূর্ব ব্যথাভরা অনুভূতির সৃষ্টি করিল।

যেন মনে হইল, মানীকে এ জগতে বুঝিবার ভালবাসিবার লোক নাই। মানী যাহারহাতে পড়িয়াছে সে মানীর মূল্য বোঝে নাই। মানীর জীবনকে ব্যর্থতার পথ হইতে যদি কেহ রক্ষা করিতে পারে, তাহার মুখে সত্যকার আনন্দের হাসি ফুটাইতে পারে, তবে সে বিপিননিজেই। বিস্তীর্ণ সংসারে মানী হয়তো বড় একা, যেমন সে নিজেও আজ একা।

বিপিন কখনও প্রেমে পড়ে নাই জীবনে। প্রেমে পড়িবার অভিজ্ঞতা তাহার কখনও হয়নাই, মানীর সঙ্গে এই কয়দিনের ঘটনাবলীর পূর্বে। এখন সে বুঝিয়াছে, আজ মানী তাহারযতটা কাছে অতটা কাছে কেহ কখনও আসে নাই। বিপিন লেখাপড়া মোটামুটি জানলেও এমন কিছু বেশি নভেল নাটক বা কবিতা পড়ে নাই, প্রেমের কি লক্ষণ কবি-ঔপন্যাসিকেরা লিখিয়াগিয়াছেন, তাহা সে জানে না; কিন্তু সে মাত্র এইটুকু অনুভব করিল, মানী ছাড়া জগতে আরকেহ আজ যদি তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, তাহার মনের এ শূন্যতা পূর্ণ হইবার নয়।

ইহাকেই কি বলে ভালবাসা? হয়তো হইবে।

যে কোনো কথাই সেই একটি মাত্র মানুষের কথা মনে আনিয়া দেয়—বিপিনের জীবনেইহা একেবারে নূতন।

সে যে ভাইয়ের অসুখের সম্বন্ধে আইনদ্দির সঙ্গে পরামর্শ করিতে গিয়াছিল, এ কথাবেমালুম ভুলিয়া গিয়া কুমড়াটি হাতে লইয়া বিপিন সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

বিপিনের একজন বন্ধু আছে এখান হইতে দুই ক্রোশ দূরে ভাসানপোতা গ্রামে। বন্ধুটির নাম জয়কৃষ্ণ মুখুজ্জে। বয়সে জয়কৃষ্ণ বিপিনের চেয়ে বছর ছয়-সাতের বড়। কিন্তু ভাসানপোতারমাইনর স্কুলে উহারা দুইজনে এক ক্লাসে পড়িয়াছিল। জয়কৃষ্ণ বর্তমানে উক্ত গ্রামের সেই স্কুলেইহেড-মাস্টারের কাজ করে। বি.এ পর্যন্ত পড়াশোনা করিয়াছিল।

এমন একজন লোক এখন বিপিনের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে, যাহার কাছে সব কথা খুলিয়া বলা যায়। না বলিলে আর চলে না। —বিপিন মনের মধ্যে এসব আর চাপিয়া রাখিতে পারে না।

তাই পরদিন সে ভাসানপোতায় বন্ধুর বাড়ি গিয়া হাজির হইল। জয়কৃষ্ণ এ গ্রামের বাসিন্দা নয়, তবে বর্তমানে কর্ম উপলক্ষে এই গ্রামের সতীশ কর্মকারের পোড়ো বাড়িতে বাহিরের দুইটি ঘর লইয়া বাস করিতেছে।

স্কুলের ছুটির পর জয়কৃষ্ণ নিজের ঘরে ফিরিয়া উনুন জ্বালাইয়া চা তৈয়ারির যোগাড়করিতেছে, বিপিনকে হঠাৎ এ সময়ে দেখিয়া বলিল, আরে বিপ্‌নে যে! আয় আয়, বস! কবে এলি রে বাড়িতে?

বিপিন দেখিল, জয়কৃষ্ণ একা নাই—ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে মাইনর স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর বয়স প্রায় সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ, এ গ্রামের স্কুলে আজ প্রায় আট দশ বছর মাস্টারি করিতেছে, থাকে জয়কৃষ্ণের বাসায় অন্য ঘরটিতে, কারণজয়কৃষ্ণ স্ত্রী-পুত্র লইয়া এখানে বাস করে না; বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীই উপরওয়ালা হেডমাস্টারেরএক রকম পাচক ও ভৃত্য উভয়ের কাজই করে। বিনিময়ে জয়কৃষ্ণ তাহাকে খাইতে দেয়।

এসব কথা বিপিন জানিত, কারণ সে আরও বহুবার ভাসানপোতায় আসিয়াছেজয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করিতে। বলা বাহুল্য, বিপিন ও জয়কৃষ্ণ যখন এই স্কুলের ছাত্র, বিশ্বেশ্বরচক্রবর্তী তখন স্কুলের মাস্টার ছিল না, উহারা পাস করিয়া বাহির হইয়া যাইবার অনেক পরেসে আসিয়া চাকুরিতে ঢোকে।

চা পান শেষ করিয়া বিপিন জয়কৃষ্ণকে ডাকিয়া ঘরের বাহিরে লইয়া গিয়া মানীর কথা তাহাকে বলিতে লাগিল। বেশ সবিস্তারেই বলিতে লাগিল।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী একটু দূরে বসিয়া উৎকর্ণ হইয়া ইহাদের কথা শুনিবার চেষ্টাকরিতেছে দেখিয়া বিপিন গলার সুর আরও একটু নীচু করিল।

বিশ্বেশ্বর দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, আমরা কি শুনতে পাব না কথাটা, ওবিপিনবাবু?

—এ আমাদের একটা প্রাইভেট কথা হচ্ছে।

—প্রাইভেট আর কি! কোনো মেয়েমানুষের কথা তো? বলুন না, একটু শুনি।

বিশ্বেশ্বর অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কথাগুলি বলিল দেখিয়া বিপিন একটু মজা করিবার জন্য কহিল, আসুন না এদিকে, বলছি!

তারপর সে এক কাল্পনিক মেয়ের সঙ্গে তাহার কাল্পনিক প্রেম-কাহিনী সবিস্তারে শুরুকরিল। একবার ট্রেনে একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাহার আলাপ হয়। মেয়েটির নাম বিজলী। তাহার বাবা ও মায়ের সঙ্গে সে কলিকাতায় মামার বাসায় যাইতেছিল। বিজলী কলিকাতায়মামার বাসার ঠিকানা দিয়া তাহাকে যাইতে বলে। বিপিন অনেকবার সেখানে গিয়াছিল, বিজলী কি আদরযত্ন করিত! বার বার আসিতে বলিত! একদিন বিপিন তাহার বাপ-মাকে বলিয়া বিজলীকে আলিপুর চিড়িয়াখানা দেখাইতে লইয়া যায়। সেখানে বিজলী মুখ ফুটিয়া বলে, বিপিনকে সে ভালবাসে।

বিশ্বেশ্বর সাগ্রহে বলিল, এ কতদিনের কথা ?

—তা ধরুন না কেন, বছর ছ-সাত আগের ব্যাপার হবে।

—এখন সে মেয়েটি কোথায় ?

—এখন তার বিয়ে হয়ে গেছে। শ্বশুরবাড়ি থাকে।

—আপনার সঙ্গে আলাপ আছে?

—আলাপ আবার নেই! দেখা হয় মাঝে মাঝে তার সেই মামার বাসায়, তখন ভারী যত্নকরে।

—কি রকম যত্ন করে ?

—এই গল্পগুজব করে, উঠতে দেয় না, বলে, বসুন বসুন। খুব খাওয়ায়। এর নাম যত্নআর কি। আমায় কত চিঠি লিখেছে লুকিয়ে।

—বলেন কি! চিঠিপত্র লিখেছে!

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে না।মেয়েমানুষ লুকাইয়া যে চিঠি লেখে—সে চিঠি যে পায়, তাহার কি সৌভাগ্য না জানি! বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর অত্যন্ত ইচ্ছা হইল, সেসব চিঠিতে কি লেখা আছে জিজ্ঞাসা করে; কিন্তু নিতান্ত ভদ্রতাবিরুদ্ধ হয় বলিয়া, বিশেষত যখন বিপিনের সঙ্গে তাহার খুব বেশি ঘনিষ্ঠতা নাই, সেকথা বলিতে পারিল না। শুধু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জয়কৃষ্ণ বলিল, বিশ্বেশ্বরবাবু, আপনার জীবনে এ রকম কখনও কিছু নিশ্চয় হয়েছে, বলুন না শুনি।

বিশ্বেশ্বর নিতান্ত হতাশ ও দুঃখিত ভাবে খানিকটা আপনমনেই বলিল, আমাদের এ রকমকখনও কেউ চিঠি লেখেনি, চিঠি লেখা তো দূরের কথা, কখনও কোনো মেয়ে কিছু বলেওনি, সাহস করে কাউকে কখনও কিছু বলতেও পারিনি মাস্টারবাবু, সত্যি বলছি, এই এত বয়স হল।

—বিয়েও তো করলেন না।

—বিয়ে কি করে করব মাস্টারবাবু, দেখতেই পাচ্ছেন সব। পঁচিশ টাকা মাইনে লিখি স্কুলের খাতায়, পাই পনেরো টাকা। ন মাতা ন পিতা, মামার বাড়ি মানুষ হয়েছি দুঃখে-কষ্টে। তেমন লেখাপড়াও শিখিনি। মামাদের দোরে তাদের চাকরগিরি করে, হাটবাজার করে অতিকষ্টেছাত্রবৃত্তি পাস করি।

জয়কৃষ্ণ বলিল, বিয়ে করলে আপনার লোক পেতেন বিশ্বেশ্বরবাবু। এর পরে দেখবেন, একজন মানুষ অভাবে কি কষ্ট হয়!

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী বলিল, এর পর কেন, এখনই হয়। সত্যি বলছি মাস্টারবাবু, একটাভাল কথা কখনও কেউ বলেনি, বড় দুঃখে এ কথা বলছি, কিছু মনে করবেন না, কারও মুখে একটা ভালবাসার কথা, এই উনি যেমন বলছেন, এ তো কখনও শুনিইনি, কাকে বলে জানিও না। তাই এক এক সময় ভাবি, জীবনটা বৃথায় গেল মাস্টারবাবু, কিছুই পেলাম না।

বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী এমন হতাশ সুরে এ কথা বলিল যে, সে যে অকপটে সত্য কথা বলিতেছে, এ বিষয়ে বিপিনের কিছুমাত্র সন্দেহ হইল না। সে যে কিছুদিন আগেও ভাবিত, তাহার তুল্য অসুখী মানুষ দুনিয়ায় কেহ নাই, ইহার বৃত্তান্ত শুনিয়া বিপিনের সে ধারণা দূরহইল।

এই ভাগ্যহত দরিদ্র স্কুল-মাস্টারের উপর তাহার যেন এটা অহেতুক ভালবাসা জন্মিল।

হঠাৎ মনে হইল, জয়কৃষ্ণ তাহার এতদিনের বন্ধু বটে, কিন্তু জয়কৃষ্ণের চেয়েও এই অর্ধপরিচিত বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী যেন তাহার অনেক আপন। ইহা দরিদ্রের প্রতি দরিদ্রেরসমবেদনা নয়, দরিদ্রের প্রতি ধনীর করুণা।

কারণ বিপিন এখন ধনী। আজই এইমাত্র বিপিন ভাল করিয়া বুঝিয়াছে যে, সে কত বড়ধনী।

২

বাড়িতে আসিয়া প্রথম দিন পাঁচ-ছয় বলাই বেশ ভাল ছিল। বিপিন চাকুরিস্থলে চলিয়া গেলে সে একদিন গ্রামের নবীন রায় মহাশয়ের বাড়িতে বসিয়া আছে—নবীন রায়ের ছেলে বিষ্ণু বলিল, বলাইদা, মাংসের ভাগ নেবে? আমরা উত্তরপাড়া থেকে ভাল খাসি আনিয়েছি, এবেলা কাটাহবে। সাত আনা করে সের পড়তা হচ্ছে।

বলাই অতিরিক্ত মাংস খাওয়ার ফলেই অসুখ বাধাইয়াছিল। মাংস খাওয়া তাহার বারণ আছে, এবং দাদা বাড়ি থাকার জন্যই সে বিশেষ কিছু বলিতেও সাহস করে নাই। কিন্তু এখনআর সে ভয় নাই।

মনোরমা বারণ করিয়াছিল। বলাই বউদিদিকে তত আমল দেয় না, ফলে তাহার মাংসখাওয়া কেহ বন্ধ করিতে পারিল না।

দুই তিন দিনের মধ্যে বলাই আবার অসুস্থ হইয়া পড়িল। বিপিন অসুখের খবর পাইয়াওবাড়ি আসিতে পারিল না, জমিদার অনাদিবাবু কিস্তির সময় ছুটি দিতে চাহিলেন না।

দিন কুড়ি পরে বিপিন বাড়ি আসিয়া দেখিল, বলাই একটু সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। বলাই বাড়ির সকলের হাতে পায়ে ধরিয়া দাদাকে মাংস খাওয়ার কথা বলিতে বারণ করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং বিপিনেরকানে সে কথা কেহ তুলিল না।

বিপিন একদিন থাকিয়াই চলিয়া গেল। বলাই আবার কুপথ্য শুরু করিয়া দিল। কখনওলুকাইয়া, কখনও বা বাড়ির লোকের কাছে কান্নাকাটি করিয়া, আবদার ধরিয়া।

মাস দুই এইভাবে কাটিবার পরে বিপিন পাঁচ ছয় দিনের ছুটি লইয়া বাড়ি আসিল। তাহারবাড়ি আসিবার প্রধান কারণ, পৈতৃক আমলের ভাঙা চণ্ডীমণ্ডপটি এবার খড় তুলিয়া ভাল করিয়াছাইয়া লইবে। এ সময় ভিন্ন খড় কিনিতে পাওয়া যাইবে না পাড়াগাঁয়ে।বাড়ি আসিয়া প্রথমেই বলাইকে দেখিয়া বিপিনের বাড়ি আসিবার আনন্দ-উৎসাহ এক মুহূর্তে নিবিয়া গেল। একি চেহারা হইয়াছে বলাইয়ের! চোখ মুখ ফুলিয়াছে, রঙ হলদে, পায়েরপাতাও যেন ফুলিয়াছে মনে হইল; অথচ নেফ্রাইটিসের রোগী দিব্যি মনের আনন্দে নির্বিচারেপথ্য-অপথ্য খাইয়া চলিয়াছে।

বিপিন কাহাকেও কিছু বলিল না, তাহার মন ভয়ানক খারাপ হইয়া গেল ভাইটার অবস্থাদেখিয়া। সেবার কিছু সুস্থ দেখিয়া গিয়াছিল, কোথায় সে ভাবিতেছে, এবার গিয়া দেখিবে, ভাইটি বেশ সারিয়া সামলাইয়া উঠিয়াছে—সারিয়া ওঠা তো দূরের কথা, রাণাঘাট হাসপাতালেসেবার লইয়া যাওয়ার পূর্বে যা চেহারা ছিল তাহার চেয়েও খারাপ হইয়া গিয়াছে।

দুই দিন পরে বিপিন নদীর ধারে মাছ ধরিতে যাইবে, বলাই বলিল, দাদা, আমিও যাব তোমার সঙ্গে? বল তো যুগীপাড়া থেকে আর দু'খানা ছিপ নিয়ে আসি?

বলাই উঠিয়া হাঁটিয়া খাইয়া-দাইয়া বেড়াইত বলিয়া বাড়ির লোকে হয়তো ভাবে, তবেঅসুখ এমন কঠিন আর কি! কারণ পাড়াগাঁয়ের ব্যাপার এই যে, শয্যাশায়ী এবংউত্থানশক্তিরহিত না হওয়া পর্যন্ত কাহাকেও অসুস্থ বলিয়া ধারণা করিবার মতো বুদ্ধি সেখানে খুব কম লোকেরই আছে।

মাছ ধরিতে গিয়া দুইজনে নদীর ওপারে গিয়া বসিল, কারণ এপারে জলে শেওলার দামবড় বেশি।

চার করিয়া ছিপ ফেলিয়া বিপিন বলিল, বলাই, একটু তামাক সাজ তো কল্কেটায়। আরমাঠ থেকে একটু গোবর কুড়িয়ে নিয়ে আয়, বড্ড চিংড়িমাছ জ্বালাচ্ছে, একটু ছড়িয়ে দিই।

বলাই বলিল, দাদা, গোবর দিলে চিংড়ি মাছ বেশি করে আসবে।

—তুই তো সব জানিস, দে আগে তামাকটা সেজে!

বেলা পড়িতে বেশি দেরি নাই। অনেকক্ষণ বিপিন ছিপ ফেলিয়া একমনে বসিয়া আছে, বলাইও তাহার পাশেই কিছু দূরে ছিপ ফেলিয়াছে। উভয়ের ছিপের ফাতনা নিবাতনিষ্কম্পপ্রদীপের মতো স্তব্ধ। হঠাৎ বিপিন মুখ তুলিয়া ভাইয়ের দিকে চাহিতেই দেখিল, বলাইয়ের চোখ ছিপের ফাতনার দিকে নাই। সে গভীর মনোযোগের সঙ্গে একদৃষ্টে ওপারের দিকে চাহিয়াআছে। চাহিয়া চাহিয়া কি যেন দেখিতেছে।

কি দেখিতেছে বলাই?

বিপিন কৌতূহলী হইয়া ভাইয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া ওপারের দিকে চাহিল। সঙ্গে সঙ্গেতাহার বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল।

সে এতক্ষণ লক্ষ্য করে নাই, ওপারেই চটকাতলার শ্মশান। ওপারের জঙ্গলের বহু গাছপালার মধ্যে বিপিন লক্ষ্যই করে নাই যে, তাহারা শ্মশানতলীর বুড়ো চটকাগাছটার ঠিকএপারে আসিয়া বসিয়াছে, সেদিকে মন দিবার কোনো কারণও ছিল না এতক্ষণ।

কিন্তু বলাই ওদিকে অমনভাবে চাহিয়া আছে কেন?

বলাই যেন উদাস, অন্যমনস্ক। দাদা যে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে, এ খেয়ালও তাহার নাই।

বিপিন বলিল, ওদিকে অমন করে কি দেখছিস রে?

বলাই চকিতে ওপারের দিক হইতে চোখ ফিরাইয়া লইয়া বলিল, না, কিছু না, এমনই।

বিপিন যেন খানিকটা আশ্বস্ত হইল, অথচ কেন যে আশ্বস্ত হইল, কি ভয়ই বাকরিতেছিল, তাহা তাহার নিজের নিকট খুব যে স্পষ্ট হইয়া উঠিল, তাহা নহে। তবুও মনে মনেভাবিল, কিছু না, এমনই চেয়েছিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ ছিপের ফাতনার দিকে লক্ষ্য রাখিবার পরে ভাইয়ের দিকে আর একবারচোখ ফেলিতেই সে দেখিল, বলাই আবার পূর্ববৎ অন্যমনস্কভাবে ওপারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে।

বিপিন উদ্বিগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি রে? কি দেখছিস বলো তো?

বলাই বলিল, না, কিছু দেখছি না।—বলিয়াই সে যেন দাদার কাছে ধরা পড়িয়া যাওয়াটাঢাকিয়া লইবার আগ্রহে অত্যন্ত উৎসাহের সহিত ছিপ তুলিয়া বঁড়শিতে নূতন কেঁচোর টোপগাঁথিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

আবার খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। বেলা একদম পড়িয়া গিয়াছে। ওপারের বড় বড় শিমুল, শিরীষ বা তেঁতুল গাছের মগডালে পর্যন্ত একটুও রাঙা রোদের আভা নাই। মাঠের যেখানেতাহারা বসিয়াছে, তাহার আশেপাশে চিচ্চিড়ে ফলের বন সারাদিনের রোদ পাইয়া রোদপোড়াফলের শুঁটিগুলি পিড়িক পিড়িক শব্দ করিয়া ফাটিতেছে। এই সময়টা মাছ খায়, সুতরাং বিপিনভাবিল, অন্তত আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া যাইবে।

হঠাৎ তাহাদের সামনে জলের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড কচ্ছপ নিঃশব্দে ভাসিয়া উঠিয়া চার পা নাড়িয়া সাঁতার দিতে দিতে বলাইয়ের ছিপের দিকে লক্ষ্য করিয়াই যেন আসিতে লাগিল।

বিপিন বলাইকে কথাটা বলিতে গিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল কচ্ছপটা যে ভাসিয়া উঠিয়াছে বা তাহারই ছিপের দিকে সাঁতরাইয়া আসিতেছে, বলাইয়ের সেদিকে দৃষ্টিই নাই, সে আবার সেই ভাবে ওপারের দিকে চাহিয়া আছে।

বিপিন ধমক দিয়া বলিল, এই! কি দেখছিস ওদিকে অমন করে? ওদিকে তাকাসনে।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই বিপিনের মনে হইল, এ কথা বলাইকে এ ভাবে বলা ভাল হয়নাই। সঙ্গে সঙ্গে যে সন্দেহটা অমূলক বা অস্পষ্ট ছিল, সেটা যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

বিপিনের হাতে পায়ে যেন বল কমিয়া গেল, মন বেজায় দমিয়া গেল। প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় ওপারের চটকাতলার শ্মশানের মড়ার বাঁশ ওফুটা কলসীগুলা যেন কি ভয়ানক অমঙ্গলের বার্তা প্রচার করিতেছে! ভাসমান কচ্ছপটাও ! সে তাড়াতাড়ি ছিপ গুটাইয়া ভাইকে বলিল, নে, চলবাড়ি চল্। সন্ধে হল। আমি ছিপগুলো বেঁধে নিই। তুই ততক্ষণ বাঁশতলার ঘাটে গিয়ে পারের নৌকো ডাক দে।

অসুস্থ ভাইটাকে শ্মশানের সান্নিধ্য হইতে যত তাড়াতাড়ি হয় সরাইতে পারিলে সে যেনবাঁচে।

বিপিনের মন কয়দিন যেমন হালকা ছিল, সর্বদা যেমন কি এক ধরনের আনন্দে ভরপুরছিল, আজ আর তেমন অনুভব করিল না। কাহারও সহিত কথাবার্তা কহিতে ভাল লাগিল না, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে নিজের ঘরে ঢুকিল।

পৈতৃক আমলের কুঠরির মেঝেতে সিমেন্ট চটিয়া উঠিয়া গিয়াছে বহুকাল, জানালার কবাট আলগা, ছেঁড়া নেকড়া ও কাঁঠাল কাঠের সিঁড়ি দিয়া উত্তরের জানালাটা আটকানো। জানালায় ঠেসানো আছে একগাদা শাবল, কুড়ুল, গোটা দুই পুরানো হুঁকো, একটা পুরানো টিনের তোরঙ্গ, সেজন্য ওদিকের জানালা খোলাই যায় না।

ঘরে খাট নাই, যে কয়খানা খাট ছিল, পূর্ববৎসর দারিদ্রের দায়ে বিপিন সস্তাদরে বিক্রয়করিয়া ফেলিয়াছিল। মায়ের ঘরে একখানা মাত্র জাম কাঠের সেকেলে তক্তপোশ ছিল, সম্প্রতি বলাইয়ের অসুখ বাড়িবার পর হইতে সেখানা বলাইয়ের জন্য দালানে পাতিয়া দেওয়াহইয়াছে। সুতরাং বিপিন নিজের ঘরে মেঝের উপর বিছানা পাতিয়াই শোয় আজ তিন বৎসর।

এক দিকে মাদুরের উপর কাঁথা পাতিয়া বিছানা করা, মনোরমা সেখানে খোকাখুকিকে লইয়া শোয়। ঘরের অন্য দিকে একখানা পুরানো তুলো-বার-হওয়া তোশক পাতিয়া বিপিনেরজন্য বিছানা করা হইয়াছে; মশারি নাই, এতদিন অর্থাভাবে কেনা যায় নাই, চাকুরি হওয়ার পর হইতেও এমন কিছু বিপিন থোক টাকা কোনোদিন হাতে করিয়া বাড়ি আসে নাই, যাহা হইতেসংসার-খরচ চালাইয়া আবার মশারি কেনা যাইতে পারে।

সমস্ত রাত্রি মশায় ছিঁড়িয়া খায় বলিয়া মনোরমা সন্ধ্যাবেলা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধকরিয়া ঘুঁটের ও তুষের ধোঁয়ার সাঁজাল দেয়, যেমন গোহালে দেওয়া হয় তেমনই। আজও দিয়াছিল, এখনও ঘুঁটের মালসা ঘরের মেঝেতে বসানো, অল্প অল্প ধোঁয়া বাহির হইতেছে।

বিপিন শৌখিন মেজাজের লোক, ঘরে ঢুকিয়া ঘুঁটের মালসা দেখিয়াই চটিয়া গেল। অপরবিছানায় ভানু শুইয়া ছিল, তাহাকে ডাকিয়া বলিল, তোর মাকে ডেকে নিয়ে আয়।

মনোরমা ঘরে ঢুকিতেই বিরক্তির সুরে বলিল, এতরাত পর্যন্ত ঘুঁটের মালসা ঘরে? বলিএখানে মানুষ শোবে না এটা গোয়াল? নিয়ে যাও সরিয়ে!

মনোরমা বলিল, তা কি করব বল! ও দিলে তবুও মশা একটু কমে, নইলে শোয়া যায়! একদিন ধোঁয়া না দিলে মশায় টেনে নিয়ে যায় যে! অন্য কি উপায় আছে দেখিয়ে দাও না।

স্ত্রীর এই কথার মধ্যে তাহার মশারি কিনিবার অক্ষমতার প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতের অস্তিত্বঅনুমান করিয়া বিপিন জ্বলিয়া উঠিল। বলিল, উপায় কি আছে না আছে এখন দেখবার সময় নয়। তুমি দয়া করে মালসাটা সরিয়ে নিয়ে যাবে?

মনোরমা আর বাক্যব্যয় না করিয়া হেতুভূত দ্রব্যটিকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেল। সে একটাব্যাপার আজ কয়েকদিন ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। পলাশপুরে চাকরি হইবার পর হইতেইস্বামীর কেমন যেন রুক্ষ মেজাজ, আগে তাহার নানারকম বদখেয়াল ছিল, নেশাভাঙ করিত; বিষয়-আশয় উড়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু

মনোরমা যখন তিরস্কার করিত, তখন সে শুনিয়া যাইত, মৃদু প্রতিবাদ করিত, দোষক্ষালনের চেষ্টা করিত, কিন্তু রাগিত না, বরং ভয়ে ভয়ে থাকিত।

আজকাল হইয়াছে উল্টা। মনোরমা কিছু করিলেও দোষ, না করিলেও দোষ। বিপিন যেনতাহার সব কিছুতেই দোষ দেখে। সামান্য ছুতা ধরিয়া যা-তা বলে। কেন যে এমন হইল, তাহামনোরমা ভাবিয়া পায় না।

৩

মনোরমা আর এক বিপদে পড়িয়াছে।

বীণা-ঠাকুরঝি বয়সে তাহার অপেক্ষা দুই বছরের ছোট। বিধবা হওয়ার পরে এইসংসারেই আছে, শ্বশুরবাড়ি যায় না, কারণ শ্বশুরবাড়িতে এমন কেহ আপনারজন নাই যেতাহাকে লইয়া যায়। উনিশ বছর বয়সে বিধবা হয়, এখন বছর একুশ-বাইশ বয়স। মনোরমারনিজের বয়স চব্বিশ।

সে কথা যাক।

এখন বিপদ হইয়াছে এই, আজ প্রায় ছয়-সাত মাস ধরিয়া মনোরমা লক্ষ্য করিতেছে, গ্রামের তারক চাটুজ্জের ছেলে পটল যখন-তখন ছুতা নাতায় এ বাড়িতে যাতায়াত করে এবংবীণার সঙ্গে মেলামেশা করে।

ইহাতে মনোরমা প্রথমে কিছু মনে করে নাই, সে শহর-বাজারের মেয়ে, তাহার বাপেরবাড়িতেও বিশেষ গোঁড়ামি নাই ও-বিষয়ে। ছেলে আর মেয়ে একসঙ্গে মিশিলেই যে খারাপহইয়া যাইবে, সে বিশ্বাস তাহার জ্যাঠামশায়ের নাই সে জানে। মনোরমা বাবাকে দেখে নাই, জ্যাঠামশায়ই তাহাকে মানুষ করিয়াছেন।

কিন্তু এ ঠিক সে রকমের নয়।

সন্দেহ একদিনে হয় নাই। একটু একটু করিয়া বহুদিনে হইয়াছে।

বিবাহ হইবার পরে এ বাড়িতে আসিয়া মনোরমা পটলকে এ বাড়িতে তত আসিতেদেখিত না, যত সে দেখিতেছে আজ প্রায় বছরখানেক। তাহার মধ্যে ছয়-সাত মাস বাড়াবাড়ি।বীণা-ঠাকুরঝিও আজকাল যেন পটল আসিলে কি রকম চঞ্চল হইয়া উঠে। রাঁধিতে বসিয়াছে, হয়তো পটলের গলার স্বর শোনা গেল দালানে, শাশুড়ির সঙ্গে কথা কহিতেছে। এদিকে বীণা হয়তো এক ঘণ্টার মধ্যে রান্নাঘর হইতে বাহির হয় নাই, কোনো না কোনো ছুতা খুঁজিয়া সে রান্নাঘর হইতে বাহির হইবেই। দালানে যাইয়া পটলের সঙ্গে খানিকটা কথা কহিয়া আসিবেই।এ মাত্র একটা উদাহরণ, এ রকম অনেক আছে।

ইহাও না হয় মনোরমা না ধরিল।

একদিন সিঁড়ির পাশে অন্ধকারে সন্ধ্যাবেলায় দাঁড়াইয়া সে দুইজনকে চুপি চুপি কি কথাবার্তা বলিতে দেখিয়াছে। শাশুড়ি সন্ধ্যার পর চোখে ভাল দেখেন না, নিজের ঘরে খিল দিয়া জপ-আহ্নিক করেন ঘণ্টাখানেক কি তাহারও বেশি, সে নিজেও এই সময়টা ছেলেমেয়ের তদারক করিতে, রাত্রের রান্নার যোগাড় করিতে ব্যস্ত থাকে, আর ঠিক কিনা সেই সময়েই ওইপোড়ারমুখো পটল চাটুজ্জে!বীণা-ঠাকুরঝিও যেন লুকাইয়া দেখা করিতে আগ্রহ দেখায়, ইহার প্রমাণ সে পাইয়াছে। অথচ পটলের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ কি তারও বেশি; পটল বিবাহিত, তার ছেলেমেয়ে চার-পাঁচটি। তাহার কেন এত ঘন ঘন যাওয়া-আসা এখানে, একজন অল্পবয়সী বিধবার সঙ্গে এত কথাবার্তাই বা তাহার কিসের? বিশেষ যখন বাড়িতে কোনো পুরুষমানুষ আজকাল থাকে না। বলাই তোএতদিন হাসপাতালেই ছিল, শাশুড়ি চোখে দেখেন না, তাহার থাকা না-থাকা দুই সমান।

বীণা-ঠাকুরঝির সঙ্গে এ কথা কহিয়া কোনো লাভ নাই, মেয়েমানুষের মন দিয়া মনোরমা তাহা বুঝিয়াছে। বীণা কথাটা উড়াইয়া দিবে, অস্বীকার করিবে, পরে রাগ করিবে, ঝগড়া করিবে।

শাশুড়িকে বলিয়াও কোনো লাভ নাই। তিনি অত্যন্ত সরল, বিশ্বাস করিবেন না, বিশেষ করিয়া তিনি নিরেট ভালমানুষ, তাহার কথা ঠাকুরঝি শুনিবেও না। বরং বউদিদির কথা শুনিলেও শুনিতে পারে, কিন্তু মার কথা সে গায়ে মাখিবে না।

অতিরিক্ত আদর দিয়া শাশুড়ি বীণা-ঠাকুরঝির মাথাটি খাইয়াছেন।

মনোরমার ইচ্ছা ছিল বিপিনকে কথাটা বলিবার। কিন্তু স্বামীর মেজাজ আজকাল যেনসর্বদাই চটা, একথা বলিলে যদি আরও চটিয়া যায়, মনোরমাকেই গালাগালি করে, এজন্য তাহার ভয় করে কথাটা পাড়িতে।

মনোরমা সংসারী ধরনের মেয়ে। তাহার সমস্ত মনপ্রাণ সংসারে পড়িয়া থাকে।জ্যাঠামশায় যখন তাহার বিবাহ দেন এ বাড়িতে তখন ইহাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল। শ্বশুর চোখ বুজিতেই সব গেল। স্বামীকে বুঝাইয়া বলিবার বয়স তখন হয় নাই মনোরমার। স্বামীবিষয়-আশয় উড়াইয়া দিয়া এমন অবস্থা করিল সংসারের যে, অমন দুর্দশার অভিজ্ঞতা কখনওছিল না অবস্থাপন্ন গৃহস্থের মেয়ে মনোরমার। তাহার জ্যাঠামশায় একজন অবসরপ্রাপ্ত সাবজজ, জাঠতুতো ভাইয়েরা কেহ উকিল, কেহ ডাক্তার। জ্যাঠামশায় যখন বারাসতের মুন্সেফ তখনএখানে তাহার বিবাহ দেন। সে শুধু বিনোদ চাটুজ্জের নামডাকের জোরে। তখন ভাবিয়াছিলেন, পাড়াগাঁয়ের সচ্ছল গৃহস্থের ঘর, ভাইঝি সুখেই থাকিবে। মনোরমার গায়ে গহনা কম দেন নাইজ্যাঠামশায় বিবাহের সময়, তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই, দুইগাছা রুলি ছাড়া। পাছে কেহ কিছুমনে করে বলিয়া মনোরমা বাপের বাড়ি যাওয়াই ছাড়িয়া দিয়াছে। এত করিয়াও স্বামীর মন পাইবার জো নাই। সবই তাহার অদৃষ্ট।

শাশুড়ির বাতের বেদনা আছে। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া সে শাশুড়ির ঘরে তাপ-সেঁককরিতে লাগিল। বিপিনের মা পুত্রবধূকে অত্যন্ত ভালবাসেন। মনোরমা যে ভাবে শাশুড়ির সেবা করে, বীণার নিকট হইতেও তিনি তাহা পান না; যদিও এ কথা বলা চলে না যে, বীণা মায়ের সম্বন্ধে উদাসীন। বীণা নিজের ধরনে মায়ের যত্ন করে। সে সংসার তেমন করিয়াকখনও করে নাই, অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে, ছেলেপুলে নাই; মনেপ্রাণে সে যেন এখনওঅবিবাহিতা বালিকা। তাহার ধরনধারণ বালিকার মতোই, গোছালো-গাছালো সংসারী ধরনেরমেয়ে সে কোনো কালেই নয়, হইবেও না। মেয়ের উপর বিপিনের মায়ের অত্যন্ত দরদ—ছোট মেয়ের উপর মায়ের যেমন স্নেহ থাকে তেমনই। বিপিনের মা বোঝেন, বীণার জীবনেরশূন্যস্থান তিনি কোনো কিছু দিয়াই পুরাইতে পারিবেন না; এখনও সে ছেলেমানুষ, ঠিকমতো হয়তো বোঝে না তাহার কি হইয়াছে, কিন্তু যত বয়স বাড়িবে, মা চলিয়া যাইবে, মুখের দিকেচাহিবার কেহ থাকিবে না, তখন সে নিজের স্বামী-পুত্রহীন জীবনের শূন্যতা উপলব্ধি করিবে। তারপর যতদিন বাঁচিবে, সম্মুখে আশাহীন, আনন্দহীন, ধূ-ধূ মরুভূমি। তাহার মধ্যবয়সের সে শূন্যতা পুরিবে কিসে? তবুও যে দুইদিন হতভাগী নিজের অবস্থা বুঝিতে না পারে, সে দুইদিনইভাল। তা ছাড়া কি সুখের মধ্যেই বা সে এখন আছে?

মা মধ্যে মধ্যে তাহাও ভাবেন।

বীণা শ্বশুরবাড়ি হইতে আনিয়াছিল খানকতক সোনার গহনা ও নগদ দেড়শো টাকা।বিপিন ব্যবসা করিবে বলিয়া বোনের টাকাগুলি চাহিয়া লইল, অবশ্য তাহার উদ্দেশ্য ভালই ছিল, কিন্তু টাকা বাকি পড়িয়া ক্ষুদ্র মুদিখানার দোকান ডুবিয়া গেল। বীণার টাকাগুলিও ডুবিল সেইসঙ্গে।

ইহার পরও বীণার দুইখানা গহনা বিপিন চাহিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়া বলাইকে লাঙল গরু কিনিয়া দিয়াছিল চাষবাসের জন্য। তখন সংসারের ভয়ানক দুরবস্থা যাইতেছিল, সকলেপরামর্শ দিল, জমি এখনও যাহা আছে, নিজেরা লাঙল রাখিয়া চাষ করিলে ভাতের ভাবনাহইবে না। বলাইও ধরিল, দাদা আমাকে লাঙল গরু করে দাও, সংসারের ভার আমি নিচ্ছি।বিপিন স্ত্রীকে বলিল, ওগো, শোনো একটা কথা। বীণাকে বল না ওর হারগাছটা দিতে।আমি এখন বেচে বলাইকে গরু কিনে দিই, তারপর বীণাকে আবার গড়িয়ে দোব।

মনোরমা বলিল, তুমি বেশ মজার মানুষ তো! একবার ওর দেড়শো টাকা নিলে, আরউপুড়-হাত করল না—আবার চাইছ গলার হার! ওর ওই সামান্য ব্যাঙের আধুলি পুঁজি, শেষেওকে কি পথে দাঁড় করাবে? আমি ও কথা বলতে পারব না।

অগত্যা বিপিনই গিয়া বীণাকে কথাটা বলিল।

—তোর কোনো ভাবনা নেই আমি যতদিন আছি। বলাইকে লাঙল গরু কিনে দিই ওইহারগাছটা বেচে, তারপর তোকে গড়িয়ে দোব এর পরে। তোর আগের টাকাও আস্তে আস্তে শোধ দোব। কিছু ভাবিসনি তুই।

বীণা বলিল, আমার আবার ভাবাভাবি কি, হার দরকার হয় নাও না, তবে বলে দিচ্ছি, বাবার আমলে যেমন গোলা ছিল অমনই গোলা তুলতে হবে কিন্তু বাইরের উঠোনে। গোলা চলে গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের সামনের উঠোনটা ফাঁকা ফাঁকা দেখাচ্ছে। আর আমি, বউদি, মা, তুমি, বলাই—সবাই মিলে নৌকো করে একদিন কালীতলায় বেড়াতে যাব, কেমন তো?

দিনকতক চাষবাস চলিয়াছিল ভাল। বলাই নিজে দেখিত শুনিত, গরুরগাড়ি নিজেহাঁকাইত। হঠাৎ বলাইয়ের অসুখ হইয়া সে সব গেল। চিকিৎসার জন্য গরু-জোড়া বিক্রয় করিতে হইল। সুতরাং বীণার হারছড়াটাও গেল।

তারপর এই দুর্দশার সংসারে বীণা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ছেঁড়া কাপড় সেলাইকরিয়া পরে, রাত্রে একমুঠা চাল চিবাইয়া জল খাইয়া সারারাত কাটায়। ছেলেমানুষ—একটা সাধ নাই, আহ্লাদ নাই, মা হইয়া তিনি সবই তো দেখিতেছেন।

বীণা টাকা বা গহনার জন্য কখনও দাদাকে কিছু বলে নাই, তেমন মেয়ে সে নয়। এখনও গাছকতক চুড়ি অবশিষ্ট আছে, দাদা চাহিলে সে দিতে আপত্তি করিত না, কিন্তু বিপিন লজ্জায়পড়িয়াই বোধ হয় চাহিতে পারে নাই।

বীণার কি হইবে ভাবিয়া তাঁহার রাত্রে ঘুম হয় না। তিনি নিজের ঘরে নিজের বিছানায়বীণাকে বুকে করিয়া শুইয়া থাকেন। বীণা যে এখনও কত ছেলেমানুষ আছে, ইহা তিনি ভিন্নআর কে বোঝে? স্বামীর ঘর কয়দিন করিয়াছিল সে? তখন তাহার বয়সই বা কত?

এক এক দিন তিনি একটু আধটু রামায়ণ মহাভারত শুনিতে চান। নিজে চোখে আজকাল তেমন দেখিতে পান না রাত্রে, মনোরমা যদি অবসর পায়, সে-ই আসিয়া পড়িয়া শোনায়, নয়তো বীণাকে বলেন, বউমা আজ ব্যস্ত আছে, একটুখানি বই পড় তো বীণা!

বীণা একটু অনিচ্ছার সহিত বই লইয়া বসে। সে পড়িতে পারে ভালই, কিন্তু পড়িয়াশুনাইতে তাহার ভাল লাগে না। মনে মনে নিজে পড়িতে ভালবাসে। আধঘণ্টাটাক পড়িয়াশুনাইবার পরে হঠাৎ সশব্দে বন্ধ করিয়া বলে, আজ থাক মা, আমার ঘুম পাচ্ছে।

আজকাল বিপিনের চাকুরি হওয়া পর্যন্ত রাত্রে এক পোয়া আটার রুটি হয় বীণার জন্য।আগে এমন একদিনও গিয়াছে বীণা কিছু না খাইয়া রাত কাটাইয়াছে, আটা ময়দা কিনিবার পয়সাতো দূরের কথা, বাড়িতে এক মুঠো চাল থাকিত না যে ভাজিয়া খায়। আজকাল মনোরমাই এবন্দোবস্ত করিয়াছে, একসঙ্গে আটা আনিয়া রাখে, বীণার যাহাতে এক সপ্তাহ চলে। শাশুড়িরাত্রে একটু দুধ ছাড়া কিছু খান না, সহ্য হয় না। বীণা রাত্রে না খাইয়া কষ্ট পাইত, মনোরমাতাহা সহ্য করিতে পারিত না। সে অত্যন্ত গোছালো সংসারী মানুষ, তাহার সংসারে কেহ কষ্টপায়, ইহা সে দেখিতে পারে না। তবে আজকাল আবার বলাইয়ের অসুখ হইয়া মুশকিলবাধিয়াছে, বীণার জন্য তোলা আটায় তাহাকেও রুটি করিয়া দিতে হয় রাত্রে। অথচ বেশি করিয়া আনিবার পয়সা নাই। বিপিন যে টাকা পাঠায় তাহাতে সবদিকে সঙ্কুলান হওয়া দুষ্কর।বেশি পয়সা চাহিলেও বিপিন দিতে পারে না।

মনোরমা যে ভাবে সংসার গুছাইয়া রাখিতে চায়, নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে না। সবাই সুখে থাকুক, মনোরমার সেদিকে অত্যন্ত নজর। পটলের সহিত বীণার মেলামেশা ঠিক এই কারণেই তাহার মনে উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছে। কি হইতে কি হইবে, সংসারটি ওলট-পালটহইয়া যাইবে মাঝে পড়িয়া, এসব পাড়াগাঁয়ে একটুখানি কোনো কথা লোকের কানে গেলে ঢি ঢি পড়িয়া যাইবে, সে তাহা খুব ভালই বোঝে। এখন কি করা যায়, তাহাই হইয়া উঠিয়াছে মনোরমার মস্ত সমস্যা। আজ সাহস করিয়া মনোরমা কথাটা বিপিনের কাছে পাড়িবে ভাবিয়াবলিল, শোনো, একটা কথা বলি!

বিপিনের মেজাজ ভাল ছিল না। বিরক্তির সুরে বলিল, কি কথা?

মনোরমা ভয় পাইল। বিপিনের মেজাজ সে খুব ভালই বোঝে। আজ এইমাত্র সন্ধ্যাবেলাতো আগুনের মালসা লইয়া একপালা হইয়া গিয়াছে, থাক গে, কাল কি পরশু কি আরএকদিন—এত তাড়াতাড়ি কথাটা স্বামীকে শুনাইবার কোনো কারণ উপস্থিত হয় নাই। আজঅন্তত দরকার নাই।

৪

কিন্তু পরদিনই একটা ঘটনায় মনোরমার সন্দেহ বাড়িয়া গেল। সন্ধ্যার কিছু পরে তাহার হঠাৎমনে পড়িল, ছাদে একখানা কাঁথা রোদে দিয়াছিল, তুলিতে ভুলিয়াছে। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিবারসময়ে সিঁড়ির পাশের ঘুলঘুলি দিয়া দেখিল, বাড়ির পাশে কাঁঠালতলায় কে যেন দাঁড়াইয়া আছে।চোখের ভুল ভাবিয়া সে সরাসরি উপরে উঠিয়া গেল এবং ছাদের আলিসা হইতে কাঁথাখানালইয়া যখন নীচে নামিতেছে, তখন মনে হইল, চিলেকোঠার আড়ালে যেন কিসের শব্দ হইল।মনোরমা ঘুরিয়া গিয়া দেখিল, চিলেকোঠার আড়ালে তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে বীণা, এবং যেন নীচে বাগানের দিকে চাহিয়া আছে। বউদিদির পায়ের শব্দে বীণাচমকিয়া পিছন দিকে চাহিল। মনোরমা বলিল, বীণা-ঠাকুরঝি এখানে দাঁড়িয়ে একলাটি?

বীণা নীরস সুরে বলিল, হ্যাঁ, এমনিই দাঁড়িয়ে আছি।

—এসো নীচে নেমে। অন্ধকার সিঁড়ি, এর পর নামতে পারবে না।

—খুব পারব। তুমি যাও, বড্ড অন্ধকার এখনও হয়নি। যাচ্ছি আমি।

মনোরমা সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে ঘুলঘুলি দিয়া কি জানি কেন একবার চাহিয়া দেখিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখে পড়িল, বাড়ির বাহিরের দিকের দেওয়াল ঘেঁষিয়া কেএকজন আসশেওড়ার ঝোপের মধ্যে গুঁড়ি মারিয়া বসিয়া আছে।

মনোরমার ভয় হইল। চোর বা কোনো বদমাইশ লোক নিশ্চয়ই। সে কাঠের মতোআড়ষ্ট হইয়া লোকটার দিকে চাহিয়া আছে, এমন সময় লোকটা উঠিয়া দাঁড়াইল। মনোরমাদেখল, সে পটল চাটুজ্জে। পটল টের পায় নাই যে মনোরমা ঘুলঘুলি দিয়া চাহিয়া আছে, সে, ছাদের দিকে চোখ তুলিয়া একবার হাসিয়া নিম্নসুরে বলিল, চললাম আজ, সন্ধে হয়ে গেল। কাল যেন দেখা পাই, কথা আছে।

মনোরমার মাথা ঘুরিয়া গেল। এসব কি কাণ্ড ! পটল চাটুজ্জের এরকম লুকাইয়া দেখাকরিবার হেতু কি? সন্ধ্যার অন্ধকারে মশার কামড়ের মধ্যে শেওড়াবনে গুঁড়ি মারিয়া লুকাইয়া বীণা-ঠাকুরঝির সঙ্গে কথা বলিবার কোনো কারণ নাই, যখন সে সোজা বাড়ির মধ্যে আসিয়াপ্রকাশ্যভাবেই বীণার সঙ্গে আলাপ করিতে পারে! তাহাকে তো কেউ বাড়ি ঢুকিতে নিষেধ করেনাই!

সেই রাত্রেই মনোরমা বিপিনকে কথাটা বলিবে ঠিক করিল। কিন্তু হঠাৎ রাত দশটারসময় বলাইয়ের অসুখ বড় বাড়িল। ঠিক যখন সকলে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইতে যাইবে, সেই সময়। বলাই রোগের যন্ত্রণায় চিৎকার করিতে লাগিল আর কেবলই বলিতে লাগিল, সর্বশরীর জ্বলে গেল, ও মা!..পাড়ার প্রবীণ লোক

গোবর্ধন চাটুজ্জে আসিলেন। পাশেরবিপিনদের জ্ঞাতি ও শরিক ধনপতি চাটুজ্জে আসিলেন। পাড়ার ছেলেছোকরা এবং মেয়েরা কেহ কেহ আসিল। প্রকৃত সাহায্য পাওয়া গেল গোবর্ধন চাটুজ্জের কাছে। তিনি পুরানোতেঁতুলের সঙ্গে কি একটা মিশাইয়া বলাইয়ের সারা গায়ে লেপিয়া দিতে বলিলেন। তাহাতেই দেখা গেল, যন্ত্রণার কিছু উপশম ঘটিল। সারারাত বিপিনের মা রোগীর বিছানায় বসিয়া তাহাকে পাখার বাতাস দিতে লাগিলেন। বীণা রাত একটা পর্যন্ত জাগিয়া রোগীর কাছে বসিয়া ছিল, তাহার মায়ের বারবার অনুরোধে অবশেষে সে শুইতে গেল।

মনোরমা প্রথমটা এ ঘরে বসিয়া ছিল, কিন্তু তাহার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে মায়েরকাছছাড়া হইলেই রাত্রে কাঁদে, বিশেষ করিয়া ভানুটা। বিপিনের মা বলিলেন, বউমা, তুমি ছেলেদের নিয়ে শোও গে, তবুও ওরা একটু চুপ করে থাকবে। সবাই মিলে চেঁচালে বাড়িতেতিষ্ঠুনো যাবে না। তুমি উঠে যাও।

বিপিন একবার করিয়া একটু শোয়, আবার একটু রোগীর কাছে বসে; এই ভাবে রাতকাটিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

দিন দুই পরে বলাই একটু সুস্থ হইলে বিপিন বাড়ি হইতে রওনা হইয়া পলাশপুরে আসিল। জমিদার অনাদিবাবু বেশ বিরক্ত হইয়াছেন মনে হইল; কারণ প্রায় পনেরো দিন কামাই হইয়াগিয়াছে বিপিনের। বাহিরের ঘরে বসিয়া তিনি বিপিনকে জমিদারি সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। প্রজাদের নিকট হইতে কিস্তিখেলাপী সুদ আদায় কিভাবে করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে আলোচনা করিলেন। বলিলেন, নালিশ মামলা করতে পিছুলে চলবে না। এবার গিয়ে কয়েক নম্বর মামলা রুজু করে দাও, দেখি টাকা আদায় হয় কিনা!

বিপিন বলিল, নালিশ করতে গেলেই তো টাকার দরকার। এখন মহালের যেমন অবস্থা, তাতে আপনাদের খরচের টাকাই দিয়ে উঠতে পারি না, তার ওপর মামলার টাকা—

অনাদিবাবু কাহারও প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারেন না। বলিলেন, তা বললে জমিদারির কাজ চলে না। টাকা যেখান থেকে পাবে যোগাড় করবে।তোমাকে তবে গোমস্তা রেখেছি কিমুখ দেখতে! সে সব আমি জানি না, টাকা চাই।

বিপিনও বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে। সে কাহারও কথা শুনিবার পাত্র নয়; বলিল, আজ্ঞে, আপনাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ওভাবে টাকা আদায় আমায় দিয়ে হবে না। এতেযদি আপনার অসুবিধে হয়, তা হলে আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই ভাবিল, এই সংসারের দুরবস্থায়, বলাইয়ের অসুখের সময়, এ কি কাজ করিল সে? ইহার ফলে এখনই চাকুরি যাইবে!

অনাদিবাবু কিন্তু তখনই তেমন কোনো কথা বলিলেন না। নিঃশব্দে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেন। বিপিন সেখানে বসিয়াই রহিল।

কিছুক্ষণ পরে রাগটা কাটিয়া গিয়া তাহার মাথা একটু ঠাণ্ডা হইল। অনাদিবাবুর মুখে মুখে অমনতর জবাব দেওয়া তাহার উচিত হয় নাই। চাকুরি গেলে বাড়ি গিয়া খাইবে কি? তবে ইহাওঠিক, সে সুর নরম করিয়া ছোট হইতে পারিবে না, ইহাতে চাকুরি যায় আর থাকে! এদিকে আরএক মুশকিল। বেলা এগারোটা বাজে। স্নান-আহারের সময় উপস্থিত। যাহাদের চাকুরি একরূপ ছাড়িয়াই দিল এখনই, তাহাদের বাড়ি আহারাদি করিবেই বা কি করিয়া? না, তাহা আর চলে না।খাওয়ার দরকার নাই। এখনই সে রাণাঘাট হইয়া বাড়ি চলিয়া যাইবে। বাহিরে বসিয়া থাকিলে অনাদিবাবু ভাবিতে পারেন যে, সে ক্ষমাপ্রার্থনা করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে।

নিজের ছোট ক্যাম্বিসের ব্যাগটা হাতে ঝুলাইয়া বিপিন বৈঠকখানা-ঘরের বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িল। অল্পদূর গিয়া পথের মোড় ঘুরিতেই হঠাৎ অনাদিবাবুদের খিড়কি-দোর হইতে যে ছোট পথটা আসিয়া এই পথের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই পথের মাথায় গাব গাছটার তলায় মানীকে তাহারই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে অবাক হইয়া গেল। মানী এখানেআছে তাহা সে ভাবে নাই।

মানীদের খিড়কি-দোর খোলা। এইমাত্র সে যেন দোর খুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। বিপিন কিছু বলিবার আগেই মানী বলিল, কোথায় যাচ্ছ বিপিনদা ?

তারপর আগাইয়া আসিয়া বিপিনের সামনে দাঁড়াইয়া আদেশের সুরে বলিল, যাও গিয়েবৈঠকখানায় বোসো। আমি তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি, বেলা হয়েছে বারোটা। নাওয়া-খাওয়া করতেহবে না, কতক্ষণ হাঁড়ি নিয়ে বসে থাকবে লোকে?

প্রায় কুড়ি-বাইশ দিন পরে মানীর সঙ্গে এই প্রথম দেখা। মানীর কথার প্রতিবাদ করিবার শক্তি যোগাইল না তাহার। সে কোনো কথাই বলিতে পারিল না, শুধু চুপ করিয়া মানীর দিকে চাহিয়া রহিল।

মানী বলিল, আবার দাঁড়িয়ে কেন, বেলা হয়নি?

এতক্ষণে বিপিন বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পাইল। অপ্রতিভের সুরে আমতা আমতা করিয়াবলিল, কিন্তু আমি গিয়ে—বাড়ি যাচ্ছি যে!

মানী পূর্ববৎ সুরেই বলিল, তোমার পায়ে আমি মাথা খুঁড়ে খুনোখুনি হব এই দুপুরবেলাবিপিনদা ? জ্ঞানবুদ্ধি আর কবে হবে তোমার? যাও ফিরে বৈঠকখানায়!

বিপিন অবাক হইল মানীর চোখমুখের ভাব দেখিয়া। কতটা টান থাকিলে মেয়েরা এমনজোরের সঙ্গে কথা বলিতে পারে, বিপিনের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না; কিন্তু অনেক কথাবলিবার থাকিলেও সে দেখিল, খিড়কি-দোরের দিকের প্রকাশ্য পথের উপর দাঁড়াইয়া মানীর সঙ্গে বেশি কিছু কথাবার্তা বলা উচিত হইবে না এই সব পল্লীগ্রাম জায়গায়। দ্বিরুক্তি না করিয়াসে ব্যাগ হাতে আবার আসিয়া অনাদিবাবুদের বৈঠকখানায় উঠিল।

বৈঠকখানায় কেহই নাই। অনাদিবাবু সম্ভবত বাড়ির মধ্যে স্নান করিতেছেন, সে যেবৈঠকখানা হইতে ব্যাগ হাতে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতেছিল, ইহা মানী কি করিয়া জানিলবিপিন ভাবিয়া পাইল না।

একটু পরে চাকর এক বাটি তেল ও একখানা গামছা আনিয়া বলিল, নায়েববাবু, নেয়েনিন মা বলে দিলেন।

বিপিন বলিল, কে তোকে তেল আনতে বললে ?

—মা বললেন, নায়েববাবুর জন্যে তেল দিয়ে আয় বাইরে। দিদিমণি গিয়ে রান্নাঘরেমাকে বললেন, আপনি বাইরে বসে আছেন, তেল পাঠিয়ে দিতে। আমি মাছ কুটছেলাম, আমায় বললেন, দিয়ে আয়। আপনি যে কখন এয়েলেন, তা দেখিনি কিনা তাই জানিনে, নইলে আমিনিজেই তেল দিয়ে যাতাম। নায়েববাবু কি আজ আলেন? ভাল তো সব বাড়ির?

এই একমাত্র চাকর জমিদারবাড়ির, সে তো তাহার যাতায়াতের কোনো খবরই রাখেনা, তবে মানী কি করিয়া জানিল, সে ব্যাগ হাতে চলিয়া যাইতেছে এবং রাগ করিয়াইযাইতেছে ?

খাইবার সময় মানীর আঁচলের ডগাও দেখা গেল না কোনো দিকে, কারণ রান্নাঘরের বারান্দায় অনাদিবাবুর সঙ্গেই তাহার খাবার জায়গা হইয়াছে। অনাদিবাবু উপস্থিত থাকিলে মানীবিপিনের সামনে বড় একটা বাহির হয় না।

অনাদিবাবু খাইতে বসিয়া এমন ভাব দেখাইলেন যে, বিপিনের সঙ্গে তাঁহার যেন কোনোঅপ্রীতিকর কথাবার্তা হয় নাই। জমিদারিসংক্রান্ত কোনো কথাই উঠালেন না— বিপিনের দেশে মাছের দর আজকাল কি, ম্যালেরিয়া কমিয়াছে না বাড়িয়াছে, রাণাঘাটের বাজারে কাহার একখানা দোকান আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে ইত্যাদি প্রসঙ্গ উঠাইয়া তাহাদের আলোচনারমধ্যেই আহার শেষ করিলেন।

রাণাঘাট হইতে হাঁটিয়া আসিয়া বিপিনের শরীর ক্লান্ত ছিল। অনাদিবাবু বেলা তিনটারআগে বৈঠকখানায় আসিবেন না, মধ্যাহ্নে উপরের ঘরে খানিকক্ষণ নিদ্রা যাওয়া তার অভ্যাস, বিপিন জানে; সুতরাং সে নিজেও এই অবসরে একটু বিশ্রাম করিয়া লইবে। চাকরকে ডাকিয়া বলিল, শ্যামহরি, ও শ্যামহরি, বাবু নামবার আগে আমায় ডেকে দিস যদি ঘুমিয়ে পড়ি, বুঝলি? আর একটু তামাক সেজে নিয়ে আয়।

২

একটু পরে মানীকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া বিপিন আশ্চর্য হইয়া গেল। বাহিরের ঘরে মানীকে সেআসিতে দেখে নাই কখনও।

মানী বলিল, বিপিনদা, রাগ পড়েছে?

বিপিন মানীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, আচ্ছা তুই কি করে জানলি আমি চলে যাচ্ছি! কেউ তো জানে না। শ্যামহরি চাকরকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, আমি কখন এসেছি তা পর্যন্ত সেখবর রাখে না।

মানী হাসিতে হাসিতে বলিল, আমার টনক আছে মাথায় বিপিনদা, আমি জানতে পারি।

—কি করে বলো না মানী! সত্যি, আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তোকে দেখে!

মানী তবুও হাসিতে লাগিল। কৌতুক পাইলে সে সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়, বিপিনতাহা ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছে, এবং ইহাও একটা কারণ যেজন্য মানীকে তাহারবড় ভাল লাগে।

—আচ্ছা, হাসি এখন একটু বন্ধ থাক গে। কথার উত্তর দে।

মানী দোরের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, দরজার শিকলটা দুই হাতে ধরিয়া তাহার হাসিবার ভঙ্গি দেখিয়া বিপিনের মনে হইতেছিল, মানী এখনও যেন তেমনই ছেলেমানুষ আছে, শিকল ছাড়িয়া মানী দরজার পাশে একখানা চেয়ারে বসিল। গম্ভীর মুখে বলিল, আচ্ছা, তুমি কি রকমমানুষ বিপিনদা! এসেছ কখন, তা জানি না। একবার দেখা পর্যন্ত করলে না। তারপর বাবা বুড়োমানুষ কি বলেছেন না বলেছেন, তুমি অমনই চটে গেলে, আর এই ঠিকদুপুরবেলা, খাওয়াদাওয়া না, কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল পুঁটুলি হাতে!

—তুই জানলি কি করে?

—আমি জানব কি করে? বাবা রান্নাঘরে গিয়ে মার কাছে বললেন যে তোমার সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয়েছে কি নিয়ে। মাকে বললেন, শ্যামহরিকে দিয়ে তোমার নাইবার তেল পাঠিয়ে দিতে। বাবার মুখে তাই শুনে আমার ভয় হল, আমি তো তোমায় চিনি। তাড়াতাড়ি বাইরের ঘরের দরজা পর্যন্ত এসে দেখি, তুমি ওই বাতাবি-নেবুতলা পর্যন্ত চলে গিয়েছ। চেঁচিয়ে ডাকতেপারি না তো আর। তখনই ছুটে খিড়কি-দোরে গেলুম, রাস্তার বাঁকে তোমায় আসতেই হবে।বাপ রে, কি রাগ!

—রাগ নয়, মনে দুঃখু তো হতে পারে।

—কি দুঃখু? তুমিই বলেছ বাবাকে যে, না পোষায় আপনি অন্য লোক রাখুন! বাবাতোমাকে তো কিছুই বলেননি!

বিপিন চুপ করিয়া রহিল। এ কথার জবাব দিতে গেলে অনাদিবাবুর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিতে হয়, তাহা সে মানীকে বলিতে চায় না।

মানী বলিল, বিপিনদা, আমার কাছে তুমি কি বলেছিলে, মনে আছে?

—কি কথা?

—এরই মধ্যে ভুলে গেলে ? বলেছিলে না, আমায় না জিজ্ঞেস করে চাকরি ছাড়বে না ? কথা দিয়েছিলে মনে আছে?

—মনে ছিল না, এখন মনে পড়ছে বটে।

—তা নয়, রাগের সময় তোমার জ্ঞান ছিল না, এই হল আসল কথা। উঃ, কি জোরবেরিয়ে যাওয়া হল! দেখতে না দেখতে একেবারে বাতাবিনেবুর গাছের কাছে! ভাগ্যিস আমিছুটে গেলুম খিড়কির দোরে? নইলে এতক্ষণ রাণাঘাটের অর্ধেক রাস্তা—

—কিন্তু এতক্ষণ পরে একটা কথা বলি মানী, তুই যে এসেছিস বা এখানে আছিস এ কথা আমি কিন্তু কিছু জানি না। আমি তোকে খিড়কি-দোরের পথে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

—বাবা কিছু বলেননি ?

—উনি তোর কথা আমার কাছে কি বলবেন? কখনও বলেন, না আমিই জিজ্ঞেস করি?

—তা নয়। আমি থাকলেই তো খরচ বাড়ে, খরচ বাড়লেই জমিদারির তাগাদা জোর করে করবার ভার পড়ে তোমার ওপর। আমি ভেবেছিলুম, বাবা সেকথা তুলেছেন বুঝি; আমি আছিসুতরাং টাকা চাই, এমন কথা যদি বলে থাকেন!

—না, সে কথা ওঠেনি। তুই চলে যাবি শিগ্‌গির এ তো জেনেই গিয়েছিলুম, আবার এর মধ্যে আসবি তা ভাবিনি।

—তা ভাববে কেন? দেখতে পেলে বুঝি গা-জ্বালা করে? দূরে রাখলেই বাঁচো বুঝি?

—বলেছি কোন দিন?

মানী ঘাড় দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, তোমায় রাগাচ্ছি, বিপিনদা, রাগাচ্ছি। সেই সব তোমার ছেলেবেলার মতো এখনও আছে, কিছু বদলায়নি। আচ্ছা, একটা কবিতা বলবশুনবে?

বিপিন হাত নাড়িয়া যেন মশা তাড়াইবার ভঙ্গি করিয়া বলিল, রক্ষে কর। ওসব ভাললাগে না আমার, বুঝি-সুঝি না। বাদ দাও, জানো তো আমার বিদ্যে!

মানী গম্ভীর হইয়া বলিল, বিপিনদা, আমার আর একটা কথা রাখতে হবে। তোমায়পড়াশুনা করতে হবে। তোমায় কতগুলো ভাল বই দোব, সেগুলো কাছারিতে গিয়ে পড়বে, পড়ে ফেরত দেবে, আমি আবার দোব। বইয়ের আমার অভাব নেই, যত চাও দোব।

বিপিন তাচ্ছিল্যের স্বরে বলিল, বই আমি অনেক পড়েছি, তুই যা। বুড়ো বয়েসে আবারবই পড়তে যাই, আর উনি আমার মাস্টারনী হয়ে এসেছেন!

মানী রাগিয়া বলিল, এসেছিই তো মাস্টারনী হয়ে। পড়তে হবে তোমায়। বই দিচ্ছি, নিয়ে যাও যদি ভাল চাও। এঃ, একেবারে ধিঙ্গি হয়ে উঠেছেন আর কি! পড়াশুনো শিকেয়তুলেছেন।

বিপিন হাসিতে লাগিল।

মানী বলিল, সত্যিই বলছি বিপিনদা, নিজের জীবনটা তুমি ইচ্ছে করে গোল্লায় দিলে। নইলে আজ আমার বাবার বাড়ি চাকরি করতে আসবে কেন তুমি? লেখাপড়া শিখলে কাঁকুড়, তোমায় ভাল চাকরি দেবে কে বল তো? আবার তেজ করে চলে যাওয়া হয়। যাও, বই দিচ্ছি, নিয়ে পড় গে, আর একখানা ডাক্তারি বই দিচ্ছি, সেখানা যদি ভাল করে পড়তে পারো, তবে আরচাকরি করতে হবে না।

ডাক্তারি বইয়ের কথায় বিপিন উৎসাহিত হইয়া উঠিল। নতুবা এতক্ষণ মানীরগুরুমহাশয়গিরিতে তাহার হাসি আর থামিতেছিল না। বলিল, বেশ, ভালই তো। কি বই পড়তে হবে এনে দিয়ো, দেখি চেষ্টা করে।

—মানুষ হও বিপিনদা, আমার বড্ড ইচ্ছে। তোমার বুদ্ধি আছে, কিছু কাজে লাগালে না তাকে। ডাক্তারি যদি শিখতে পারো, ভেবে দেখ, কারও চাকরি তোমায় করতে হবে না। আমারএক দেওর ডাক্তারি পাস করেছে, বীজপুরে ডাক্তারখানা খুলে বসেছে, দেড়শো টাকার কমকোনো মাসে পায় না।

—সেসব পাস-করা ডাক্তারের কথা ছেড়ে দে! আচ্ছা, বাংলা বই পড়ে ডাক্তার হওয়াযায় ?

—কেন হওয়া যাবে না। খু-উ-ব যায়। তোমায় বই আমি আরও দোব। তারপর আমারসেই দেওরকে বলে দেব, তার কাছে ছ'মাস থেকে শিখলে তুমি পাকা ডাক্তার হয়ে যাবে। সেকথা পরে হবে, এখন তোমায় বই এনে দিই, সেগুলো নিয়ে কাছারি যেও, আর রোজ পড়ো।কবে যাবে সেখানে?

—কাল সকালেই যেতে হবে, দেরি আর করা চলবে না।

—আচ্ছা বোসো,আমি বই বেছে বেছে নিয়ে আসি।

মানী বিপিনের দিকে চাহিয়া কেমন একপ্রকার হাসিয়া চলিয়া গেল।মানীর এ হাসিবিপিনের পরিচিত। ছেলেবেলা হইতে দেখিয়া আসিতেছে।

মনে মনে ভাবিল, মানীটা বড় ভাল মেয়ে। এতটুকু ঠ্যাকার নেই, বেশ মনটি। তবে মাথায় একটু ছিট আছে, নইলে আমায় এ বয়েসে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করে!

মানী একরাশ বই লইয়া ঘরে ঢুকিয়া বিপিনের সামনে বইয়ের বোঝা নামাইয়া বলিল, দেখে ভয় হচ্ছে নাকি? কিছু ভয় নেই। এর মধ্যে দু'খানা শরৎবাবুর নভেল আছে, 'শ্রীকান্ত' আর 'দত্তা', পড়ে দেখো, কি চমৎকার!

—উঃ, তুই দেখছি আমায় রাতারাতি পণ্ডিত না করে ছাড়বি না মানী!

মানী আর একখানা মোটা বই হাতে লইয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, এইখানা সেই ডাক্তারি বই। এ আমার শ্বশুরবাড়ির জিনিস, তোমায় দিলাম। এ থেকে তুমি করে খেতেপারবে।

বিপিন পড়িয়া দেখিল, বইখানার নাম 'সরল চিকিৎসা-বিজ্ঞান'। গ্রন্থকারের নামব্যোমকেশ চট্টোপাধ্যায় এল, এম. এস.।

মানীর দিকে চাহিয়া বলিল, বেশ ভাল বই?

মানী ঘাড় নাড়িয়া আশ্বাস দেওয়ার সুরে বলিল, খুব ভাল বই।

এতে সব আছে ডাক্তারি ব্যাপারের। বাকিটুকু হয়ে যাবে এখন, আমার সেই দেওরের কাছে থেকে কিছুদিন শিখলে। আমি সব ঠিক করে দেব এখন।

—আর ওগুলো কি বই?

—এখানা শরৎবাবুর 'দত্তা', বললুম যে! চমৎকার বই, পড়ে দেখো—উপন্যাস।উপন্যাস পড়োনি কখনও?

—আমাদের বাড়িতে ছিল বাবার আমলের 'ভুবনমোহিনী' বলে একখানা উপন্যাস।সেখানা পড়েছি।

—ওসব বাজে বই, ভাল বই তুমি কিছুই পড়োনি, খোঁজও রাখো না বিপিনদা। আজকালমেয়েরা যা জানে, তুমি তাও জানো না। দুঃখু হয় তোমার জন্যে।

—শরৎবাবু ভাল লেখক? নাম শুনিনি তো?

—তুমি কার নাম শুনেছ? বঙ্কিমবাবুর নাম জানো? রবি ঠাকুরের নাম জানো?

—নাম শুনেছি ওই পর্যন্ত। পড়িনি কোনো বই। আছে তাদের বই?

—এগুলো আগে পড়ে শেষ করো, পরে দোব। শোনো, আমি শ্যামহরি চাকরকে বলেদিচ্ছি, তোমার পুঁটুলি আর বই দত্তপাড়ায় কাছারিতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। নইলে তুমি নিয়েযাবে কি করে?

—ওতে দরকার নেই মানী, তোমার বাবা কি মনে করবেন! আমার মোট বইবার জন্যেচাকরকে বলবার কি দরকার!

—সে ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। আমি বললে বাবা কিছু বলবেন না। আজইযাবে?

এখুনি বেরুব। অনাদিবাবু ঘুম থেকে উঠলেই তার সঙ্গে দেখা করেই বেরিয়ে পড়ব।

—বাবা ঘুম থেকে উঠলেই আমি চাকরের হাতে চা পাঠিয়ে দোব এখন, চা খেয়ে যেও।

মানী চলিয়া যায় বিপিনের ইচ্ছা নয়। অনাদিবাবু এখনও উঠিবার সময় হয় নাই, মানীআরও কিছুক্ষণ থাকুক না।বিপিন কহিল, তোর সঙ্গে একটা পরামর্শ করি মানী, নইলে আর কার সঙ্গেই বা করব। বলাইকে নিয়ে বড় বিপদে পড়ে গিয়েছি, ওর অসুখ আবার বেড়েছে, এদিকে এই তো অবস্থা, বাড়িতে থাকলে কুপথ্যি করে, কারও কথা শোনে না। কি করি বল তো, এমন দুর্ভাবনা হয়েছে ওর জন্যে! এই যে আসতে দেরি হয়ে গেল বাড়ি থেকে, সে ওরই অসুখ বাড়ল বলে। নইলে তোর কাছে যা কথা দিয়ে গিয়েছিলাম, তার আগেই আসতাম।

বলাইয়ের অসুখের ভাবনা বিপিনের মনে যেন পাথরের বোঝা চাপাইয়া রাখিয়া দিয়াছে সব সময়, মানীর কাছে সে বোঝা কিছুক্ষণের জন্য নামাইয়াও সুখ। মানীকে সে মনে মনে বুদ্ধিমতী শিক্ষিতা মেয়ে বলিয়া শ্রদ্ধা করে, অন্তত সে মানীর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা মেয়ে কখনও দেখে নাই, সেইজন্য মানী কি পরামর্শ দেয় শুনিবার নিমিত্ত বিপিন উৎসুক হইল।

মানী বলিল, ওকে তো সেবার হাসপাতাল থেকে নিয়ে গেলে, হাসপাতালে আবার নিয়ে এসো না!

—হাসপাতালের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছিলুম, তারা ওকে হাসপাতালে রাখতেচায় না। বলে, ও রুগী হাসপাতালে রেখে উপকার হবে না।

মানী একটু ভাবিয়া বলিল, তা হলে কি জানো, আমার দেওরকে না হয় একখানা চিঠিলিখি। বীজপুরে রেলের হাসপাতাল আছে, সেখানে যদি কোনো বন্দোবস্ত করা যায়, দেওরতো ওখানে ডাক্তার! কালই চিঠি লিখব।

এই সময় বাড়ির মধ্যে অনাদিবাবুর গলা শোনা গেল।

তিনি ঘুম হইতে উঠিয়া দোতলার বারান্দায় কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন।

মানী বলিল, ওই বাবা উঠেছেন, আমি আসি, চা এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর বইগুলো পড়তে হবে আর আমাকে বলতে হবে সব কথা, যেন ভুলে যেও না।

বিপিন হাসিয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিল, ওরে আমার মাস্টারনী রে!

—বাজে কথা বোলো না বিপিনদা, বলে দিচ্ছি। আর ডাক্তারি বইখানার কথা যেন খুব করেমনে থাকে। জীবনে উন্নতি করবার চেষ্টা করো বিপিনদা, কেন চিরকাল পরের দাসত্ব করবে?

মানীর কথায় বিপিনের হাসি পাইল। কি মুরুব্বিই হইয়া উঠিয়াছে মানী এই অল্প বয়সে! কথার খই ফুটিতেছে মুখে। বলিল, দাঁড়া মানী, একটা কথা, তুই ব্রেহ্মসমাজের মতো বক্তৃতাদিবি নাকি? কলকাতায় গিয়ে দেখছি মানুষ হয়ে গেলি!

—আবার বাজে কথা ! চুপ! কি কথা বলছিলে বলবে? এই বাজে কথা, না আর কোনোকথা আছে?

—ইয়ে, তুই আর কতদিন আছিস এখানে?

—ঠিক নেই। যতদিন ওরা রাখে—ওদের মজ্জি। কেন?

বিপিন একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, এবার এলে তোর সঙ্গে দেখা হবে কি না তাইবলছিলাম!

—খুব দেখা হবে। কতদিনের মধ্যে আসছ? বেশিদিন দেরি না-ই বা করলে?

—খুব দেরি করা না-করা আমার হাত নয়। যদি আদায় হয় চট করে, এই হপ্তাতেইআসতে পারি, নয়তো পনেরো বিশ দিন দেরিও হতে পারে।

মানী বলিল, আচ্ছা, যাই।মানী চলিয়া যায় বিপিনের ইচ্ছা নয়, কিন্তু অনাদিবাবু উঠিয়া হয়তো ওপরের বারান্দায়পায়চারি করিতেছেন, এ অবস্থায় তাহাকে আর ধরিয়া রাখাও উচিত নয়। সুতরাং সে বলিল, আচ্ছা এসো,তোমার বাবা আসছেন বাইরে।

কিন্তু মানী চলিয়া যাইবামাত্র বিপিনের মনে হইল মানীর শেষ কথাটি—"আচ্ছা, যাই!'

মানী যখন চোখের সামনে থাকে, তখন বিপিন মানীর সব কথা ভাবিয়া দেখিবার, বুঝিবার, উপভোগ করিবার অবকাশ পায় না। এখন বিপিন হঠাৎ দেখিল, মানী এ কথা তাহাকেআর কখনও বলে নাই, অর্থাৎ বলিবার প্রয়োজন হয় নাই। কি জানি কেন, মানীর এ কথাবিপিনের ভারী ভাল লাগিল।

একটু পরে শ্যামহরি চাকর চা আনিয়া দিল, আর আনিল ছোট একটা রেকাবিতেখানকতক পেঁপের টুকরা ও একটা সন্দেশ।

এ মানীর কাজ ছাড়া আর কারও নয়, বিপিন তাহা জানে। এ বাড়িতে মানী যখন ছিল, বাহিরের ঘরে এক আধ পেয়ালা চা যদি বা কালেভদ্রে আসিয়াছে, খাবার কখনও যে আসেনাই, এ কথা সে হলফ করিয়া বলিতে পারে।

৩

কাছারি-ঘরে একা বসিয়া সন্ধ্যার সময় বিপিনের আজকাল বড়ই খারাপ লাগে।

ধোপাখালিতে সে আসিয়াছে আজ প্রায় দেড় মাস পরে। এতদিন দেশে ছিল নিজের পরিবারের মধ্যে, নির্জনে বসিয়া আকাশের তারা গুনিবার বিড়ম্বনা সেখানে ভোগ করিতে হয় নাই।

বিশেষ করিয়া মানীর সঙ্গে দেখা হইবার পরে দিনকতক এই নির্জনতা যেন একেবারে অসহ্য হইয়া পড়ে। আবার কিছুদিন পরে সহিয়া যায়।

কাছারির উঠানের সেই বাদাম গাছটার ডালপালার মধ্যে কেমন একপ্রকার শব্দ হয়, বিপিন দাওয়ায় বসিয়া চুপ করিয়া রাত্রির অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকে।

মানী যে বলিয়াছিল, জীবনে উন্নতি করো বিপিনদা—কথাটা বিপিনের বড় মনেলাগিয়াছে। তখন হাসি পাইলে কি হইবে, এখন সে বুঝিয়াছে, মানীর এই কথাটা তাহার মনে অনেকখানি আনন্দ ও উৎসাহ আনিয়া দিয়াছে।

জীবনে উন্নতি তাহাকে করিতেই হইবে।

সন্ধ্যার পরে কাছারির চাকরটা আলো জ্বালাইয়া রান্নার যোগাড় করিতে রান্নাঘরে ঢোকে।কিন্তু বিপিন এবেলা বড় একটা রান্নাবান্নার হাঙ্গামাতে যায় না। ওবেলার বাসি তরকারি থাকে, চাকরকে দিয়া খানকতক রুটি করাইয়া লয় মাত্র। খাটিয়া আসিয়া মানীর দেওয়া বইগুলি পড়িতে বসে। এ সময়টা একরকম মন্দ কাটে না।

বইগুলি একবার আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না, মানী সত্যই বলিয়াছিল।

ডাক্তারি বইখানা প্রথম প্রথম সে ভাল বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু ক্রমে এই বইখানাই তাহার গাঢ় মনোযোগ আকৃষ্ট করিল। মানুষের শরীরের মধ্যে এত সব ব্যাপার আছে, সে কোনো দিন ভাবে নাই। দেহের নানা রকম

যন্ত্রের ছবি বইয়ের গোড়ার দিকে দেওয়া আছে, বিভিন্ন যন্ত্রের কার্যবর্ণিত হইয়াছে, উপন্যাসের চেয়েও বিপিনের কাছে সে সব বেশি চমকপ্রদ মনে হইল।

তিন চার দিন বইখানা পড়িবার পরেই বিপিন ঠিক করিয়া ফেলিল, ডাক্তারি সেশিখিবেই। এতদিন পরে তাহার জীবনের উদ্দেশ্য সে খুঁজিয়া পাইয়াছে। এতদিন সে লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, মানীর কাছে সে কৃতজ্ঞ থাকিবে পথ দেখাইয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া দিবার জন্য।

দিন পনেরো লাগিল বইখানা শেষ করিতে।

শেষ করিয়া একটা কথা তাহার মনে হইল, কি অন্যায় সে করিয়াছে পৈতৃক অর্থেরঅপব্যয় করিয়া! আজ যদি হাতে টাকা থাকিত, সে চাকুরি ছাড়িয়া কলিকাতায় কোনো ডাক্তারি স্কুলে ভর্তি হইয়া কিছুদিন পড়াশুনা করিত। বাংলা ভাষায় ডাক্তারি ব্যবসায় শেখানো হয়, এমনস্কুল কলিকাতায় আছে—এই বইখানার মধ্যেই সে স্কুলের বিজ্ঞাপন আছে শেষের পাতায়।

তাহার মনে হইল মানী মেয়েমানুষ, কিছু তেমন জানে না, তাই সে বলিয়াছিল বীজপুরেতাহার দেওরের কাছে ছয় মাস থাকিলে বিপিন ডাক্তারি-শাস্ত্রে পটু হইয়া যাইবে। বেচারিমানী!

এ সে জিনিস নয়, বইখানা আগাগোড়া পড়িবার পরে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, ডাক্তারি শেখা ছয় মাস এক বছরের কর্ম নয়। ভাল ডাক্তার হইতে হইলে কোনো ভাল স্কুলেঅভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কাছে না পড়িলে কিছুই হইবে না। বহু ব্যাপার শিখিবার আছে, এ বিষয়েমানীর দেওর কি শিখাইবে?

বিপিনের আরও মনে হইল, ডাক্তারি সে ভাল পারিবে। তাহার মন বলিতেছে, এই কাজে নামিয়া পড়িলে যশ অর্জন করিবে সে। এই একখানা মাত্র বই পড়িয়া সে অনেক কিছুবুঝিয়াছে, বইতে যা বলে নাই, তাহার চেয়ে বেশি বুঝিয়াছে।

মানীর সঙ্গে দেখা করিয়া এসব কথা তাহাকে বলিতে হইবে। মানীর সঙ্গেই পরামর্শকরিতে হইবে, ডাক্তারি শিখিবার আর কি উপায় স্থির করা যাইতে পারে! তাহার ভাল মন্দ মানী যেমন বোঝে, সে নিজেও যেন তেমন বোঝে না।

৪

বিপিন পাঁচ ছয় টাকা খরচ করিয়া রাণাঘাট হইতে কুইনাইন, লাইকার আর্সেনিক, লাইকার অ্যামোনিয়া, অ্যাসিড এন.এম.ডিল.প্রভৃতি কয়েকটি ঔষধ আনাইল, যাহা সাধারণ ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রেসক্রিপশনে লাগে বলিয়া বইতে লিখিয়াছে।অ্যাল্‌ক্যালি-মিক্‌শ্চারেরউপকরণও ওইসঙ্গে কিছু আনাইল।

আনাইবার পরদিনই কামিনীর প্রতিবেশিনী হাবু ঘোষের দিদিমা আসিয়া বলিল, ও নায়েববাবু, কামিনীর বড় অসুখ হয়েছে আজ তিন চার দিন হল, একবার আপনারে যেতেবলেছে।

বিপিন ব্যস্ত হইয়া তাহার প্রথম রোগী দেখিতে ছুটিল। যদিও হাবুর দিদিমা ডাক্তারহিসাবে তাহাকে আহ্বান করে নাই, সে যে ডাক্তারি বই পড়িয়া ভিতরে ভিতরে ডাক্তার হইয়াউঠিয়াছে, এ খবর কেহ রাখে না।

বিপিন এবার যখন কাছারিতে আসে, আজ দিন কুড়ি আগের কথা, কামিনী সেই দিনইগিয়া বিপিনের সঙ্গে দেখা করিয়াছিল। তারপর দুপুরের পরে প্রায়ই বুড়ি কাছারিতে আসিয়াকিছুক্ষণ গল্পগুজব করিয়া চলিয়া যাইত। তাহার অভ্যাসমতো কয়দিন দুধ ও ফলমূলও নিজে লইয়া আসিয়াছে। আজ সাত আট দিন হইল কামিনী কাছারিতে আসে নাই, বিপিনের এখন মনেপড়িল। সে নিজেকে লইয়া এমন মশগুল যে, বুড়ি কেন আজকাল কাছারিতে আসিতেছে না—এ প্রশ্ন তাহার মনে উঠে নাই।

গোয়ালপাড়ার মধ্যেই কামিনীর বাড়ি।

দুইখানা বড় চালাঘর, মাটির দেওয়াল। খুব পরিষ্কার করিয়া লেপা-পোছা। এক দিকেগোহাল, আগে অনেকগুলি গরু ছিল। বিপিন ছেলেবেলায় কামিনীর বাড়িতে আসিয়াছে, কামিনী কাছারি গিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ি আনিত এবং ওই বড় ঘরের দাওয়ায় বসাইয়াকত গল্প করিত, খাবার খাইতে দিত, সে কথা বিপিনের আজও মনে আছে। তবে সে কামিনীরবাড়িতে আসে নাই আর কখনও সেই বাল্যদিনগুলির পরে, আসিবার আবশ্যকও হয় নাই।

কামিনী ঘরের মেঝেতে বিছানার উপর শুইয়া আছে।

বিছানাপত্রের অবস্থা দেখিয়া বিপিন বুঝিল, কামিনীর সচ্ছল দিন আর নাই। এক সময়েএই ঘরের মধ্যে এক হাত পুরু গদির উপরেতোশক ও ধপধপে চাদরপাতা চওড়া বিছানা সে নিজের চোখে দেখিয়াছে। ঘরে নানা রকম ছবি টাঙানো থাকিত, এখনও অতীতের স্মৃতি বহনকরিয়া দুই চারখানা ছবি ঝুলকালি মাখানো অবস্থায় দেওয়ালে ঝুলিতেছে—কালী, দশমহাবিদ্যা, মহারানি ভিক্টোরিয়ার রঙিন ছবি, গোষ্ঠবিহার।

কামিনী ময়লা কাঁথার ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, এসো বাবা এসো,ওই পিঁড়িখানা পেতে দে তো ভাই!

হাবুর দিদিমা পিঁড়ি পাতিয়া দিল। সেই সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে বিপিনকে।

বিপিন বলিল, দেখি হাতখানা, জ্বর হয়েছে, তা আমায় আগে জানাওনি কেন? আজগিয়ে হাবুর দিদিমা বললে, তাই জানতে পারলাম।

তুমি বসো বসো,ভাল হয়ে বসো। আমার কথা বাদ দাও, অসুখ লেগেই আছে। বয়েস হয়েছে, এখন এই রকম করে যে ক'দিন যায়!

বিপিন হাত দেখিয়া বুঝিল, জ্বর খুব বেশি। মনে মনে ভাবিল, কি ভুলই হয়েছে! একটাথার্মোমিটার না পেলে কি জ্বর দেখা যায় ? একদিন রাণাঘাট গিয়ে একটা থার্মোমিটার আনতেইহবে, নইলে রোগী দেখা চলবে না।

বিপিন হাবুর দিদিমাকে বলিল, একটা শিশি নিয়ে চলো, ওষুধ দিচ্ছি।কামিনী আশ্চর্য হইয়া বলিল, তুমি ওষুধ দেবে কোথা থেকে!বিপিন হাসিয়া বলিল, বা রে, তুমি বুঝি জানো না, আমি ডাক্তারি করি যে আজকাল।কামিনী কথাটা বিশ্বাস করিল না। বলিল, আহা কেবল পাগলামি আর খেয়াল!

হাবুর দিদিমা শিশি ধুইতে বাহিরে গিয়াছিল, এই সুযোগে কামিনী বলিল, সরে এসে বসোকাছে।

বিপিন মলিন কাঁথা-পাতা বিছানার একপাশে বসিল।

কামিনী সস্নেহে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিল, চিরকালটা একরকম গেল। কামিনীআড়ালে-আবডালে যে তাহার সহিত মাতৃবৎ ব্যবহার করে, ইহা বিপিনের অনেকদিন হইতেইজানা আছে। সেও হাসিয়া বলিল, না, সত্যি বলছি, আমি ডাক্তারি শিখছি। শুনবে তবে, কেআমায় ডাক্তারি শেখাচ্ছে? আমাদের জমিদারের মেয়ে!

কামিনী অবাক হইয়া বলিল, আমাদের বাবুর মেয়ে! সে আর কতটুকু, আমি তাকে দেখিনি যেন! কর্তা থাকতে একবার দোলের সময় জমিদারবাবুদের বাড়ি গিয়েছিলাম, তখন সে খুকিকে দেখেছি, কর্তামশায় তাকে দেখিয়ে বললেন, এই দেখ, আমাদের বাবুর মেয়ে। ওই এক মেয়েই তো। কর্তা বলতেন—। আচ্ছা, কর্তা ইদানীং একটু চোখে কম দেখতেন, না?

বিপিন দেখিল, বুড়ি তাহার বাবার কথা আনিয়া ফেলিয়াছে, হঠাৎ থামিবে না, এখন বাবার সম্বন্ধে বুড়ির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিবার মতো মনের অবস্থা তাহার নাই। সে হাসিয়া বলিল, তুমি সে কতকাল আগে দেখেছিলে, তোমার খেয়াল আছে? সে মেয়ে কি চিরকাল তেমনই খুকি থাকবে? এখন তার বয়েস কুড়ি-বাইশ। অনাদিবাবুদের বাড়ি দোল হত।আজকের কথা নয়, আমার ছেলেবেলার কথা।

—বাবুর মেয়ের বিয়ে হয়েছে কোথায় ?

—কলকাতার এক উকিলের সঙ্গে।

—তা সে মেয়ে তোমায় ডাক্তারি শেখাচ্ছে কেমন কথা? সে ডাক্তারি জানলে কোথাথেকে?

বিপিনের ইচ্ছা, মানীর সম্বন্ধে কথা বলে। অনেকদিন মানীর বিষয়ে সে কথা বলে নাই, তাহাকে দেখেও নাই, তাহার মনটা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, অন্তত মানীর বিষয় লইয়াকিছু বলিয়াও সুখ। কিন্তু ধোপাখালির প্রজাদের নিকট তো আর জমিদারবাবুর মেয়ের সম্বন্ধেআলোচনা করা চলে না!

কামিনীর কথার উত্তরে বিপিন যাহা বলিয়া গেল, তাহা বৃদ্ধার প্রশ্নের সঠিক উত্তর নয়, মানীর রূপগুণের একটি দীর্ঘ বর্ণনা।

কামিনী চুপ করিয়া শুনিতেছিল, বিপিনের কথা শেষ হইয়া গেলে বলিল, বেশ মেয়ে! তোমার সামনে বেরোয়?

–কেন বেরুবে না? ছেলেবেলায় একসঙ্গে খেলা করেছি, আমার সামনে বেরুবে না ?

—একটা কথা বলি, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, তোমারও ঘরে সোনার পিরতিমের মতোবউ। আমার একটা কথা শোনো বাবা, তুমি তার সঙ্গে আর দেখাশুনো কোরো না। তুমি কালকের ছেলে, কি জানো আর কিই বা বোঝো! তোমার মাথায় এখনও অনেক রকম পাগলামি ঢুকে আছে। তোমায় জানতে আমার বাকি নেই বাবা, কর্তামশায়ের তো ছেলে! তুমি ও-মেয়ের ত্রিসীমানায়ঘেঁষো না, নিজে কষ্ট পাবে, তাকেও কষ্ট দেবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

আরও দুই দিন কাটিয়া গেল।

দুপুরের পরে বিপিন কাছারিতে বসিয়া হিসাবপত্র দেখিতেছে, নিবারণ গোয়ালার ছেলে পাঁচু আসিয়া বলিল, নায়েববাবু, কামিনী পিসি একবার আপনাকে ডেকেছে।

বিপিন গিয়া দেখিল, কামিনীর অসুখ বাড়িয়াছে। গায়ের উত্তাপ খুব বেশি জ্বরের ধমকে বৃদ্ধা যেন হাঁপাইতেছে, বেশি কথা বলিবার শক্তি নাই।

বিপিন বলিল, কি খেয়েছ?

কামিনী ক্ষীণস্বরে বলিল, নিবারণের বউ একটু জলসাবু করে দিয়ে গেল, দুপুরের আগে তাই একচুমুক—মুখে ভাল লাগে না কিছু!

—আচ্ছা আচ্ছা, চুপ করে শুয়ে থাক।

—তুমি আমায় আজ দেখতে আসোনি কেন? কথাটা কেমন যেন গোঙাইয়া গোঙাইয়া বলিল; বেশ একটু অভিমানের সুরও বটে।

বিপিন মনে মনে অনুতপ্ত হইল। দেখিতে আসা খুব উচিত ছিল; সকালে কাছারিতেজনকতক প্রজার সঙ্গে গোলমাল মিটাইতে দেরি হইয়া গেল, নতুবা ঠিক আসিত। কামিনীরকেহ নাই, বৃদ্ধা হয়তো আশা করে, বিপিন তাহার অসময়ে পুত্রবৎ দেখাশোনা করিবে; যদিওবিপিন কামিনীর মনের এত কথা বুঝিতে পারে না, নিজেকে লইয়াই ব্যস্ত, অপরের দিকেচাহিবার অবসর তাহার কোথায়?

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে বিপিন বলিল, এখন যাই, প্রজাপত্তর আসবে, আর আমায় একবার গদাধরপুর যেতে হবে একটা জমির মীমাংসা করতে। সন্ধের পর আবার আসব।

কামিনী উঠতে দেয় না, হাত বাড়াইয়া টানিয়া টানিয়া বলিল, যেও না, যেও না, ও বাবা বিপিন, যেও না, বসো,বসো।

বিপিনের কষ্ট হইল বৃদ্ধাকে এভাবে ফেলিয়া যাইতে। কিন্তু সত্যই তাহার থাকিবারউপায় নাই। গদাধরপুরে কয়েকঘর জেলে প্রজা আছে, তাহারা স্থানীয় বাঁওড়ের দখল লইয়া নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার ফলে কাছারির খাজনা আদায় হইতেছে না। বিপিন নিজে গিয়া এ ব্যাপারের মীমাংসা করিয়া দিলে তাহারা মানিয়া লইবে, এরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছে।সুতরাং যাইতেই হইবে তাহাকে। অনাদিবাবুর কানে যদি কথা যায়, তবে এতদিন সে যায় নাই কেন, এজন্য কৈফিয়ত তলব করিয়া পাঠাইবেন।

আড়ালে পাঁচুকে ডাকিয়া বলিল, পাঁচু, তোমার মাকে বলো এখানে একটু থাকতে। আমিআবার আসব এখন, একবার কাজে যাব গদাধরপুরে। আর একবার একটু সাবু করে খাইয়েদিতে বলো তোমার মাকে। খরচপত্তর যা হবে, সব আমার। আমি সব দোব। আচ্ছা একটা লোক দিতে পারো, রাণাঘাট থেকে কমলালেবু আর বেদানা কিনে আনবে?

বিপিন কাছারির নায়েব বটে, কিন্তু সে ভালমানুষ নায়েব। লোকে সেজন্য তাহাকে তত ভয় করে না। বিপিনের বাবার আমলে প্রশ্নের প্রয়োজন ছিল না, মুখের কথা খসাইয়া হুকুম করিলেই চলিত।

পাঁচু বলিল, আচ্ছা বাবু, আমি দেখছি যদি হাবুল যায়, বলে দেখছি।

—এই আট আনা পয়সা রাখ। হাবুলকে পাও বা যাকে পাও, দিয়ে বল ভাল বেদানা আরকমলালেবু আনতে; আর যে যাবে তার জলখাবার আর মজুরি এই নাও চার আনা।

বিপিন কাছারি আসিয়া গদাধরপুর যাইবার জন্য বাহির হইয়াছে, এমন সময় পাঁচুআসিয়া বলিল, কেউ গেল না নায়েববাবু, আমি নিজেই চললাম রাণাঘাটে। ফিরতে কিন্তুআমার রাত হবে, তা বলে যাচ্ছি।

বিপিন বুঝিল, মজুরি ও জলখাবারের দরুন চারি আনা পয়সার লোভ সম্বরণ করা পাঁচুরপক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, তারপর বাকি আট আনার ভিতর হইতে অন্তত চার ছয় পয়সাউপরিই বা কোন না হইবে!

বেলা প্রায় সাড়ে তিনটা।

গদাধরপুর এখান হইতে তিন চার মাইল পথ। বিপিন জোরে হাঁটিতে লাগিল। বজরাপুরপর্যন্ত সে ও পাঁচু একসঙ্গে গেল। তারপর রাণাঘাটের রাস্তা বাঁকিয়া পশ্চিমদিকে ঘুরিয়া গিয়াছে।পাঁচু সেই রাস্তায় চলিয়া গেল। গদাধরপুর যাইবার কোনো বাঁধা-ধরা পথ নাই। মাঠের উপরদিয়া সরু পায়ে-চলার-পথ, কখনও বা ফুরাইয়া যায়, কিছু দূরে গিয়া অন্য একটা পথ মেলে। মাঠে লোকজনও নাই যে পথ জিজ্ঞাসা করা যায়। নানা সরু সরু পথ নানাদিকে গিয়াছে, কোন্‌পথ যে ধরিতে হইবে জানা নাই। বিপিন একপ্রকার আন্দাজে চলিল।

বেলা পড়িয়া আসিল। রোদের তেজ কমিয়া গেল।

মাঠের মধ্যে ঝাড় ঝাড় আকন্দগাছে ফুল ফুটিয়াছে। সোঁদা, রোদপোড়া মাটি ও শুকনোকাশঝোপের গন্ধ বাহির হইতেছে। ফাঁকা মাঠ, গাছপালাও বেশি নাই, কোথাও হয়তো বাএকটা নিমগাছ, মাঝে মাঝে খেজুরগাছ।

অবশেষে দূর হইতে জলাশয় দেখিয়া বিপিন বুঝিল, এই গদাধরপুরের বাঁওড়, সুতরাংসে ঠিক পথেই আসিয়াছে।

গদাধরপুরের প্রজারা বিপিনকে খাতির করিয়া বসাইল। গ্রামের মধ্যে একটা কলু-বাড়িরবড় দাওয়ায় নূতন মাদুর পাতিয়া দিল বিপিনের জন্য। এ গ্রাম অনাদিবাবুর খাস তালুকেরঅন্তর্গত, গোটা গ্রামখানার সব লোকই কাছারির প্রজা।

বাঁওড়ের দখলের মীমাংসা করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল।

দুই-তিনজন প্রজা বলিল, নায়েববাবু, বলতে আমাদের বাধো-বাধো ঠেকে, কিন্তু আপনারএকটু জল মুখে দিলে হত।

বিপিন বলিল, না, সে থাক। এখনও অনেক কাজ বাকি। আমাকে আবার সব কাজ সেরেফিরতে হবে এতখানি রাস্তা।

প্রজারা ছাড়িল না, শেষ পর্যন্ত বিপিনকে একটা ডাব খাইতে হইল।

একটি চাষাদের বউ কি মেয়ে এক কাঠা ধান হাতে কলুবাড়ির উঠানে আসিয়া বলিল, হ্যাদে, ইদিকি এসো! তেল দ্যাও আধপোয়া আর এক ছটাক নুন, আধপয়সার ঝাল—

সে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কি ধান দিয়ে জিনিস কেনো ?

মেয়েটি বলিল, হ্যাঁ বাবু, কনে পয়সা পাব? শীতকাল গেল, একখানা বস্ত্র নেই যে গায়ে দিই। যে ক'বিশ ধান পেয়েলাম, সব মহাজনের ঘরে তুলে দিয়ে খাবার ধান চাট্টি ঘরে ছেল, তাই দিয়ে তেল নুন হবে সারা বছরের, আর খাওয়াও হবে।

—এতে কুলোবে সারা বছর?

—তা কি কুলোয় বাবু? আষাঢ় শ্রাবণ মাসের দিকি আবার মহাজনের গোলায় ধামা হাতে যাতি হবে। ধান কর্জ না করলি আর চলবে না তারপর।

কলু-বাড়িতে একটা ছোট মুদীর দোকানও আছে। আরও কয়েকটি লোক জিনিসপত্র কিনিতে আসিল। মেয়েটি তেল নুন কিনিয়া যাইবার সময় বলিল, মুসুরি নেবা ?

হরি কলু বলিল, নতুন মুসুরি? কাল নিয়ে এসো।

—মুসুরির বদলে কিন্তু চাল দিতি হবে।

বিপিন বলিল, তোমার ঘরে ধান আছে তো চাল নিয়ে কি করবে?

মেয়েটি উঠানে দাঁড়াইয়া গল্প করিতে লাগিল। তাহার ভাই জন খাটিয়া খায়, কিন্তু তাহারহাঁপানির অসুখ, দশ দিন খাটে তো পনেরো দিন পড়িয়া থাকে। সংসারের বড় কষ্ট, সাত জনলোক এক এক বেলায় খায়, দুবেলায় চোদ্দো জন। যে কয়টি ধান আছে, তাহাতে কয় মাসযাইবে? সামান্য কিছু মুসুরি ছিল, তাহার বদলে চাল না লইলে চলে কি করিয়া!

এই সব প্রজা, ইহাদের নিকট খাজনা আদায় করিয়া তাহাকে চাকুরি বজায় রাখিতেহইবে। অনাদিবাবুর চাকরি লইয়া সে মস্ত বড় ভুল করিয়াছে। এ সব জিনিস তাহার ধাতেনাই। বাবা কি করিয়া কাজ চালাইতেন সে জানে না, কিন্তু তাহার পক্ষে অসম্ভব।

মানী ঠিক পরামর্শ দিয়াছে।

ডাক্তারি শিখিতেই হইবে তাহাকে। ডাক্তারি শিখিলে এই সব গরিব লোকেরঅনেকখানি উপকার করিতেও তো পারিবে।

এখানকার আর একজন প্রজার কাছে অনেকগুলি টাকার খাজনা বাকি। বিপিন সন্ধ্যারপরে তাহার বাড়ি তাগাদা দিতে গেল। গিয়া দেখিল, খড়ের ঘরের দাওয়ায় লোকটা শয্যাগত, মলিন লেপকাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। তিন-চারটি পাড়ার লোক নায়েববাবুর আগমনসংবাদ শুনিয়া বাড়ির উঠানে আসিয়া উপস্থিত হইল। রোগীর বিছানার পাশে দুইটি স্ত্রীলোক বসিয়া ছিল, বিপিনকে দেখিয়া ঘোমটা টানিয়া দিল।

লোকটির নাম বিশু ঘোষ, জাতিতে কৈবর্ত্য। বিপিনকে সে অনেকবার দেখিয়াছে, কিন্তু বিপিন দাওয়ায় উঠিয়া বসিতেই তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, কে, ছিরাম? তামাক দে, ছিরাম খুড়োকে তামাক দে!

বিপিন তো অবাক! পরে রোগীর চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল, চোখ দুইটা জবাফুলেরমতো লাল। ঘোর বিকার। রোগী মানুষ চিনিতে পারিতেছে না। বিপিন বলিল, ওর মাথায় জলদাও। দেখছে কে?

একজন উত্তর দিল, ফকির সায়েব দেখছেন।

—কোথাকার ফকির সায়েব? ডাক্তার?

—আজ্ঞে না, তিনি ঝাড়ফুঁক করেন খুব ভাল। তিনি বলেছেন, উপরিভাব হয়েছে। বিপিন বুঝিতে না পারিয়া বলিল, উপরিভাব কি ব্যাপার?

দুই তিন জন বুঝাইয়া দিবার উৎসাহে একসঙ্গে বলিল, আজ্ঞে, এই দৃষ্টি হয়েছে আর কি, অপদেবতার দৃষ্টি হয়েছে!

—ভূতে পেয়েছে? —ভূতে পাওয়া না ঠিক, দিষ্টি হয়েছে আর কি!

বিপিনের যতটুকুডাক্তারি-বিদ্যা এই কয়দিন বই পড়িয়া হইয়াছে, তাহারই বলে সেবলিল, ওর ঘোর জ্বরবিকার হয়েছে। লোক চিনতে পারছে না, চোখ লাল, মাথায় জল ঢাল। উপরিভাব-টাব বাজে, ওকে ডাক্তার দেখাও, নইলে বাঁচবে না। ফকিরের কর্ম নয় এ সব।

উহাদের মধ্যে একজন বলিল, এ দিগরে বরাবর থেকে ফকির সায়েব ঝাড়ান-ফাড়ান, তেলপড়া দিয়েই রোগ সারান বাবু। ডাক্তার কোথায় এখানে? ডাক্তার আছে সেই রামনগরের হাটে, নয়তো সেই চাকদার বাজারে। আর এক আছে রাণাঘাটে। দু কোশ রাস্তা। এক মুঠো টাকা খরচ করে কি গরিবোগুবরো লোকে ডাক্তার আনতি পারে?

২

গদাধরপুর হইতে বিপিন যখন বাহির হইয়া ফাঁকা মাঠে পড়িল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াগিয়াছে। অন্ধকার রাত্রি, একটু পরেই চাঁদ উঠিবে। চাঁদ ওঠার জন্যই সে এতক্ষণ অপেক্ষাকরিতেছিল।

মাঠে জনপ্রাণী নাই। অপূর্ব তারাভরা রাত্রি। আকাশের দিকে বিপিনের নজর পড়িত না, যদি চাঁদ কখন ওঠে, ইহা দেখিবার প্রয়োজন তাহার না হইত। কিন্তু আকাশের দিকে চাহিয়ানক্ষত্রভরা অন্ধকার আকাশের দৃশ্য দেখিয়া জীবন এই বোধ হয় প্রথম বিপিনের বড় ভাল লাগিল।

কেমন নিস্তব্ধতা, কেমন একটা রহস্যময় ভাব রাত্রির এই নিস্তব্ধতায়! এত ভাললাগিবার প্রধান কারণ, এই সময় মানীর কথা তাহার মনে পড়িল।।

আজ যে এই সব দরিদ্র রোগপীড়িত মানুষদের সে চোখের উপর অজ্ঞতার ফলে মরণেরপথে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আসিল, মানীই তাহাকে পথ দেখাইয়া বলিয়া দিয়াছে, ইহাদিগকে মৃত্যুর হাত হইতে কি করিয়া বাঁচাইতে হইবে। ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, সৎপরামর্শ দিবারমানুষ নাই, কঠিন সান্নিপাতিক বিকারের রোগী, সম্পূর্ণ অসহায়। জলপড়া, তেলপড়ার চিকিৎসাচলিতেছে। ওদিকে কামিনী-মাসির এই অবস্থা, তাহার ভাইয়ের ওই অবস্থা।

মানী তাহাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে, যে পথে গেলে অর্থ ও পুণ্য দুইই মিলিবে।

গরিব প্রজাদের প্রতি অত্যাচার করিয়া, তাহাদের রক্ত চুষিয়া তাহার বাবা এবং মানীরবাবা দুইজনেই ফুলিয়া ফাঁপিয়া মোটা হইয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের ছেলেমেয়েরা সে পাপ পথে চলিবে তো না-ই, বরং পিতৃদেবের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করিবে নিজেদের দিয়া।

মানী তাহাকে জীবনের আলো দেখাইয়াছে।

একটি অদ্ভুত মনের ভাবের সহিত বিপিনের পরিচয় ঘটিল আজ হঠাৎ এই মাঠের মধ্যে।

মানীর সঙ্গে ভালবাসার যে সম্পর্ক তাহার গড়িয়া উঠিয়াছে, এতদিন অন্তত বিপিনের মনেরদিক হইতে তাহা দেহসম্পর্কহীন ছিল না, মনে মনে মানীর দেহকে সে বাদ দিতে পারে নাই।বিপিনের স্বভাবই তা নয়, সূক্ষ্ম মানসিক স্তরের আদানপ্রদান তাহার ধাতুগত নয়। মানীর সম্বন্ধে এ আশা বিপিন কখনও ছাড়ে নাই যে, একদিন না একদিন সে মানীকে নামাইবে তাহারনিজস্ব নিম্নস্তরে। সুবিধা সুযোগ এখন নাই বলিয়া ভবিষ্যতেও কি ঘটিবে না?

আজ হঠাৎ তাহার মনে হইল, মানীর সহিত তাহার সম্বন্ধ অন্য ধরনের। মানী তাহাকে যে স্তরে লইয়া গিয়াছে, বিপিনের মন তাহার সহিত পরিচিত ছিল না। অনেক মেয়ের সঙ্গে বিপিন মিশিয়াছে পূর্বে অন্যভাবে। মন বলিয়া জিনিসের কারবার ছিল না সেখানে। হয়তো মনজিনিসটাই ছিল না সে ধরনের মেয়েদের।

কিন্তু মনোরমা? বিপিন জানে না, মনোরমা মন সম্বন্ধে বিপিনের কখনও কৌতূহল জাগেনাই। তেমন ভাবে মনোরমার কখনও বিপিনের সঙ্গে মিশে নাই। হয়তো সেটা বিপিনের দোষ, মনোরমার মনকে বিপিন সে ভাবে চাহিয়াছে কবে? যে সোনার কঠিন স্পর্শে মনোরমা মনেরঘুম ভাঙিত, বিপিনের কাছে সে সোনার কাঠি ছিল না।

বিপিনের মনের ঘুম ভাঙাইয়াছে মানী। সে সোনার কাঠি ছিল মানীর কাছে।

দূর মাঠের প্রান্তে চাঁদ উঠিতেছে। বিপিন একটা খেজুরগাছের তলায় ঘাসের উপর বসিয়াপড়িল। ভারী ভাল লাগিতেছিল, কি যে হইয়াছে তাহার, কেন আজ এত ভাললাগিতেছে—এই আধো-অন্ধকার মাঠ, পুব-আকাশে উদীয়মান চন্দ্র, মাঠের মধ্যে ঝাড় ঝাড় সাদাআকন্দফুল, হুহু হাওয়া—কখনও তেমন ভাবে বিপিন এদিকে আকৃষ্ট হয় নাই, আজ যেন কিহইয়াছে তাহার।বলিতে লজ্জা করিলেও বলিতে হইবে, তাহাদের গ্রামের দোকানে

সে সন্ধ্যার পরগোপনে তাড়ি পর্যন্ত খাইয়া দেখিয়াছে—কি রকম মজা হয়। এই বছর পাঁচ আগেও বাবা তখনঅল্পদিন মারা গিয়াছেন। হাতে কাঁচা পয়সা, বিপিন তখন খুব উড়িতেছে। অবশ্য কৌতূহলেরবশবর্তী হইয়াই খাইয়াছিল। খানিকটা বাহাদুরিও বটে। ভোলা ছুতারের ছেলে হাবুলের সহিতবাজি ফেলা হইয়াছিল।

এ সব কথা বিপিনের আজ এমন করিয়া কেন মনে হইতেছে?

সে মানীর বন্ধুত্বের উপযুক্ত নয়। নিজেকে ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বিপিনের তাহাইমনে হইল। নিজেকে সে কলঙ্কিত করিয়াছে নানা ভাবে। মানী নিষ্পাপ নির্মল।

বিপিন উঠিয়া পথ চলিতে লাগিল। বোধ হয় সে অপেক্ষা করিতেছিল, চাঁদ ভাল করিয়াউঠিবার জন্য।

একটা নীচু খেজুরগাছে এক ভাঁড় খেজুর রস দেখিয়া সে ভাঁড় পাড়িয়া রস খাইল, সন্ধ্যায় টাটকা রস সাধারণত মেলে না। ভাঁড়টা আবার গাছে টাঙাইয়া রাখিবার সময় সে ভাঁড়টার মধ্যে দুইটি পয়সা রাখিয়া দিল। পল্লীগ্রামে এত ধার্মিক কেহ হয় না, কিন্তু আজ বিপিনের মনে হইল, চুরি সে করিতে পারিবে না। মানীর কাছে দাঁড়াইতে হইবে তাহাকে, চোরের বিবেক লইয়াদাঁড়াইতে পারিবে সেখানে?

কাছারি ফিরিয়া দেখিল, ছোকরা চাকরটা তাহার জন্য বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে।

বিপিন বলিল, এই ওঠ, উনুন ধরাগে যা। দুধ দিয়ে গিয়েছে এবেলা?

চাকরটা চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, বাবা! কত রাত করে আলেন নায়েববাবু! আমি বলি রাত্তিরি বুঝি থাকবেন সেখানে!

—কামিনী-মাসি কেমন আছে রে? রাণাঘাট থেকে লেবু নিয়ে ফিরেছে কিনা জানিস?

—জানিনে বাবু।

৩

বিপিন আহারাদি শেষ করিয়া কামিনীকে দেখিতে গেল।

বেশ জ্যোৎস্নাভরা রাত। কিন্তু গাঁয়ের লোক প্রায় সব ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, গোয়ালাপাড়ারমধ্যে কাহারও বড় একটা সাড়াশব্দ নাই।

কামিনীর ঘরের দোর ভেজানো ছিল, ঠেলিতে খুলিয়া গেল। ঘরের মেঝেতে একটা পিলসুজের উপরে মাটির পিদিম টিমটিম জ্বলিতেছে, বোধ হয় পাঁচুর মা জ্বালিয়া রাখিয়া দিয়াগিয়াছে। রোগী কাঁথামুড়ি দিয়া একলাটি শুইয়া বোধহয় ঘুমাইতেছে।

বিপিন ডাকিল, ও মাসি, কেমন আছ, ও মাসি?

সাড়াশব্দ নাই।

বিপিন বিছানার পাশে গিয়া বসিয়া বৃদ্ধার গায়ে হাত দিয়া দেখিল। নাড়ী দেখিয়া মনেহইল, নাড়ীর গতি খুব ক্ষীণ। খুব ঘাম হইতেছে, বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে ঘামে। বৃদ্ধাঘুমাইতেছে, না ক্রমশ অবস্থা খারাপ হওয়ার দরুন জ্ঞানহারা হইয়া পড়িয়াছে, বোঝাও কঠিন।

যাই হোক, অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিবার পরে কামিনী চোখ মেলিয়া বিপিনের দিকে চাহিল। কি যেন বলিল, বোঝা গেল না, ঠোঁট যেন নড়িল।

বিপিন বলিল, কি মাসি, কেমন আছ? বলছ কিছু?

কামিনীর জ্ঞান নাই। সে দৃষ্টিহীন নেত্রে বিপিনের দিকে চাহিল, ঘরের বাঁশের আড়ার দিকে চাহিল, আলনায় বাঁধা পুরানো লেপকাঁথার দিকে চাহিল। বৃদ্ধার এই ঘরে বিনোদ চাটুজ্জেনিয়মিত আসতেন, কামিনী তখন দেখিতে বেশ ফর্সা ও দোহারা চেহারার স্ত্রীলোক ছিল, কালাপেড়ে কাপড় পরিত, পান খাইয়া ঠোঁট রাঙা করিয়া রাখিত, হাতে সোনার বালা ও অনন্তপরিত, কালো চুলে খোঁপা বাঁধিত, এ কথা বিপিনের অল্প অল্প মনে আছে। বাইশ তেইশ বছরআগের কথা। এই যে বৃদ্ধা বিছানার সঙ্গে মিশিয়া শুইয়া আছে, মাথায় পাকা চুল, গায়ের রং হাজিয়া আধকালো, দাঁত পড়িয়া গালে টোল খাইয়া গিয়াছে, বিশেষত জ্বরে ভুগিয়া বর্তমানে তারকা রাক্ষসীর মতো চেহারা হইয়া উঠিয়াছে যাহার, এই যে সেই একদিনের হাস্যলাস্যময়ী সুন্দরী কামিনী, যাহার চটুল চাহনিতে দোর্দণ্ডপ্রতাপ বিনোদ চাটুজ্জে নায়েব মহাশয়ের মাথাঘুরিয়া গিয়াছিল, ইহাকে দেখিয়া কে বলিবে সে কথা?

প্রথম যৌবনে দুইজনের দেখাশোনা হয়। কামিনী ছিল গোয়ালার মেয়ে—বালবিধবা, সুন্দরী। বিনোদ চাটুজ্জেও ছিলেন লম্বা-চওড়া জোয়ান, বড় বড় চোখ, গলার স্বর গম্ভীর ওভারী-পুরুষের মতো শক্ত-সমর্থ চেহারা। তা ছাড়া ছিল অসম্ভব দাপট। পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরআগের কথা, তখন নায়েববাবুই ছিলেনএ অঞ্চলের দারোগা, নায়েবাবুই ম্যাজিস্ট্রেট।

কামিনী বিনোদ চাটুজ্জেকে ভালবাসিবে, এ বিচিত্র কথা কি?

সারাজীবন একসঙ্গে যাহার সহিত কাটাইয়া, নিজের উজ্জ্বল যৌবন যাহাকে দান করিয়াকামিনী নারীজন্মের সার্থকতাকে বুঝিয়াছিল, সেই বিনোদ চাটুজ্জের অভাবে তাহার জীবন শূন্যহইয়া পড়িবে ইহাও বিচিত্র কথা নয়।

হয়তো এইমাত্র জ্বরঘোরে অজ্ঞান অচৈতন্য কামিনীর মন ঘুরিয়া ফিরিতেছিল তাহারপ্রথম যৌবনের সেই পাখি-ডাকা, ফুল-ফোটা, আলো-মাখা মাধবী রাত্রির প্রহরগুলি অনুসন্ধান করিয়া, আবার মনে মনে সেখানে বাস করিয়া হারানো রাত্রির শিশিরসিক্ত স্মৃতির পুনরুদ্বোধনকরিয়া।

হয়তো মনে পড়িতেছিল প্রথম দিনের সেই ছবিটি।

ষোড়শী বালিকা তাহাদের বাড়ির সামনের বেগুন ক্ষেত হইতে ছোট্ট চুপড়ি করিয়াবেগুন তুলিয়া ফিরিতেছিল।

পথে আসিতেছিল যুবক বিনোদ চাটুজ্জে, ধোপাখালি কাছারির নায়েব, ধোপাখালি গ্রামেরদণ্ডমুণ্ডের কর্তা। সবাই বলাবলি করিত, নায়েববাবুর কাছে গেলে সব জব্দ হয়ে যাবে এখন!নায়েব এসেছে যা জবর! কোনো ট্যাঁ-ফোঁ খাটবে না সেখানে! নায়েবের মতো নায়েব!

সে কৌতূহলের সহিত চাহিয়া দেখিল, বেশ মনে আছে, বেগুনের ক্ষেতের কঞ্চি-বাঁধা আগড়ের কাছে দাঁড়াইয়া।

লম্বা, সুপুরুষ টকটকে ফর্সা, মাথায় ঢেউ-খেলানো কালো চুল—তবে বয়স খুব কম নয়, ত্রিশ-বত্রিশ হইবে, কিংবা তারও কিছু বেশি।

নায়েববাবু যখন কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহার তখন বড় লজ্জা হইল। বাঁ হাতে বেগুনের চুপড়িটা, ডানহাতে কঞ্চির আগড়টা শক্ত করিয়া ধরিয়া রহিল।

হঠাৎ বিনোদ চাটুজ্জে তাহারই দিকে মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন।

—বেগুন ওতে? এ কাদের ক্ষেত? সে লজ্জায় সঙ্কোচে বেড়ার সহিত মিশিয়া কোনোরকমে উত্তর দিল, আমাদের ক্ষেত। —তুমি কি রসিক ঘোষের মেয়ে?

—হ্যাঁ।

—বেগুন কি বিক্রি করো তোমরা?

—না, এ খাবার বেগুন।

—তোমার বাবা কোথায় ?

—চিলেমারি দুধ আনতে গেছে।

—ও।

নায়েববাবু চলিয়া গেলেন।

তাহার বুক ঢিপঢিপ করিতেছিল। কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে। ভয় না লজ্জা, কে জানে!বাড়ি আসিয়া দিদিমাকে (মা তাহার আগের বছর মারা গিয়াছিল) বলিল, আইমা, ওই বুঝিকাছারির নতুন নায়েব? যাচ্ছিলেন এখান দিয়ে, আমার কাছে বেগুন দেখে বললেন, বেগুনবিক্রির? কি জাত, আইমা?

তাহার দিদিমা বলিল, বামুন যে, তাও জানো না পোড়ারমুখো মেয়ে! চাইলেন কিনতে, বেগুন ক'টা দিয়ে দিলেই হত। আমার তো মনে থাকে না, তোর বাবাকে বেগুন দিয়ে আসতে বলিস কাছারিতে। বামুন মানুষ।

এক চুপড়ি ভাল কচি বেগুন ও এক ঘটি দুধ সে-ই কাছারিতে দিয়া আসিয়াছিল। পরদিনবিকেলবেলা বাবার সঙ্গে গিয়াছিল।

কিন্তু হায়! সে প্রেমমুগ্ধা তরুণী পল্লীবালিকা আর নাই, সে সুপুরুষ বিনোদ চাটুজ্জে নায়েববাবুও আর নাই।

অনেক কালের কথা এ সব। সেকালের কথা।

বিপিন পড়িল মহা মুশকিলে।

কামিনী যখন মারা গেল, তখন রাত দেড়টার কম নয়। মৃতদেহ ফেলিয়াই বা কোথায় সেযায় কেন? বাধ্য হইয়া ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেই হইল। বৃদ্ধার মৃতদেহ এ ভাবে ফেলিয়া সে যাইতে পারিবে না, মনে মনে সে মায়ের মতোই ভালবাসিত কামিনীকে। ভোর হইল। কাককোকিল ডাকিয়া উঠিতেই বিপিন গিয়া হাঁকডাক করিয়া লোকজন উঠাইল। পাঁচু কাল অনেকরাত্রে রাণাঘাট হইতে কমলালেবু লইয়া ফিরিয়াছিল, সকালে দিতে আসিতেছিল, পথে দেখা।তাহাকে পাঠাইয়া ওপাড়া হইতে গোয়ালার পুরোহিত বামনদাস চক্কত্তিকে আনাইল। এসবপাড়াগাঁয়ে 'প্রাচিত্তির' না করাইলে মড়া কেহ ছুঁইবে না, বিপিন জানে। কামিনীর আপনার বলিতেকেহ ছিল না, দূর-সম্পর্কের এক বোনপো আছে রাণাঘাটে, তাহাকে খবর দিবার জন্য লোকপাঠাইল। তাহাকে দিয়াই শ্রাদ্ধ করাইতে হইবে। সব কাজ শেষ করাইয়া দাহ করিতে বেলা একটা বাজিল।

কাছারি ফিরিয়া দেখিল, পলাশপুর হইতে জমিদারবাবুর পত্র লইয়া লোক আসিয়া বসিয়াআছে। নানারকমের কাজের তাগাদা চিঠির মধ্যে, বিশেষ করিয়া টাকার তাগাদা—ত্রিশটি টাকাএই লোকের হাতে যেন আজই পাঠানো হয়।

লোকটাকে বিপিন বলিল, আজ কাছারিতে থাক। এখন টাকা অবেলায় কোথায় পাব? কাল যাবে। দেখি, নরহরি দাসকে বলে।

লোকটা আর একখানি ক্ষুদ্র খামের চিঠি বাহির করিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, মনেছেল না নায়েববাবু, দিদিমণি এই চিঠিখানা আপনাকে দিতে বলেছেলেন। আমি যখন আসি, খিড়কি-দোরের পথে এসে দিয়ে গেলেন।

মানীর চিঠি! কখনও তো সে বিপিনকে চিঠি দেয় নাই! কি লিখিয়াছে মানী? বিপিননিজেকে সামলাইয়া লইয়া যতদূর সম্ভব উদাসীন মুখে বলিল, ও, বোধ হয় বড় মাছ চাই!বাবাকে লুকিয়েমাঝে মাঝে মাছ চেয়ে পাঠায় বটে! আচ্ছা, তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম করো।

বাদামতলায় দাঁড়াইয়া মানীর চিঠি খুলিয়া পড়িল। ছোট্ট চিঠি। লেখা আছে—

"বিপিনদা,

প্রণাম নেবে। অনেকদিন গিয়েছ, আদায়পত্র কেমন হচ্ছে! নায়েবির কাজে যেন গলদ না হয়, তাগাদাপত্রঠিকমতো হচ্ছে তো? নইলে কৈফিয়ত তলব করব, মনে থাকে যেন। আমিওজমিদারের মেয়ে।

আর একটি বিশেষ কথা। আমি এই মাসেই চলে যাব, আমার ছোট দেওরের বিয়ের হঠাৎ ঠিক হয়েছে। যাবার আগে তুমি অবিশ্যি একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবে।একবার এসেই না হয় চলে যেও, কিন্তু আসা
চাই-ই। আবার কবে আসব, তার ঠিকানা নেই।চিঠির কথা কাউকে বল না।

ইতি—
মানী”

৪

পরদিন অনাদিবাবুর লোক বিপিনের একখানা চিঠি লইয়া চলিয়া গেল, তাহাতে বিপিন লিখিল, টাকা আদায় হইলেই কাল কিংবা পরশু নাগাদ সে নিজে লইয়া যাইতেছে। মানীর সঙ্গে দেখা করিবার এই উত্তম সুযোগ।

সন্ধ্যা হইল। বাদামগাছের পাতায় হাওয়া লাগিয়া একপ্রকার শব্দ হইতেছে। অন্ধকাররাত্রি, জ্যোৎস্না উঠিবার দেরি আছে।

কামিনীর মৃত্যু বিপিনের মনে বিষাদের রেখাপাত করিয়াছে, পুরাতন দিনের সঙ্গে ওইএকটি যোগসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল চিরকালের জন্য।

আজ তাহার মনে হইল, এই প্রবাসে বৃদ্ধা তাহার সুখদুঃখ যত বুঝিত, এত আর কেবুঝিত? তাহার খাওয়ার কষ্ট, শোওয়ার কষ্ট হইলে কামিনীর মনে তাহা বাজিত, সাধ্যমতোচেষ্টা করিত সে কষ্ট দূর করিতে। টাকার দরকার হইলে বিপিন যদি হাত পাতিত, কামিনী তাহাকে বিমুখ করিত না কখনও। গতবার যে পঞ্চাশটি টাকা সে ধার দিয়াছিল বিপিন একবারদুইবার চাওয়ামাত্র, সে দেনা বিপিন শোধ করে নাই। পুত্রহীনা বৃদ্ধা তাহাকে সন্তানের মতোইস্নেহ করিত।

তাহার বাবার কথা উঠিলে বৃদ্ধা আর কোনো কথা বলিতে ভালবাসিত না। কতবার এ ব্যাপার বিপিন লক্ষ্য করিয়াছে। তরুণ মনের স্পর্ধিত ঔদাসীন্যে হয়তো বিপিন এই ব্যাপারে কৌতুকই অনুভব করিয়া আসিয়াছে বরাবর, আজ তাহার মনে হইতেছে, বৃদ্ধা কি ভালই বাসিত তাহার স্বর্গগত পিতা বিনোদ চাটুজ্জেকে! আগে যাহা সে বুঝিত না, আজকাল তাহা সে ভালকরিয়াই বোঝে। মানী তাহার চোখ খুলিয়া দিয়াছে নানা দিকে।

অথচ আশ্চর্য এই যে, মানীকে সে কখনও এ ভাবে দেখে নাই। এই কয় মাসে যে মানীকেসে দেখিতেছে, সে কোন মানী? ছেলেবেলার সাথী সেই মানী কিন্তু এ নয়। বালক-বালিকাহিসাবে সে খেলা তো বিপিন অনেক মেয়ের সঙ্গেই করিয়াছে; অন্য পাঁচটা ছেলেবেলার সঙ্গিনীমেয়ের সহিত যেমন ভাব হয়, মানীর সহিত তাহার বেশি কিছু হয় নাই, এ কথা বিপিন বেশজানে।

মধ্যে সে হইয়া গিয়াছিল জমিদার অনাদিবাবুর মেয়ে সুলতা।

তখন কলিকাতায় থাকিয়া কোনো মেয়ে-স্কুলে মানী পড়িত। খুব সম্ভব ম্যাট্রিক পাসওকরিয়াছিল—সেকথা বিপিন ঠিকমতো জানে না; বাবা মারা গিয়াছেন তখন, বিপিন আর পলাশপুরে জমিদারবাটীতে আসে নাই।

তবে সুলতার কথা মাঝে মাঝে বিপিনের মনে পড়িত—বাল্যপ্রীতির দিক দিয়া নয়, সুলতা সুন্দরী মেয়ে এইজন্য। না জানি সে এতদিনে কেমন সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে! সেই সুন্দরী সুলতা আবার ‘মানী’ হইয়া দেখা দিন তো সেদিন!

টাকা যোগাড় করিতে পারিলেই পলাশপুর জমিদারের বাড়ি যাওয়া যায়। কিন্তু এখনওএমন টাকা যোগাড় হয় নাই, যাহা হাতে করিয়া সেখানে যাওয়া চলে। এদিকে বেশি দেরীহইলে যদি মানী চলিয়া যায়!

কামিনী মাসি থাকিলে এসব সময়ে সাহায্য করিত।

উপায় অন্য কিছু না দেখিয়া নরহরি মুচিকে সন্ধ্যার পর ডাকিয়া পাঠাইল। নরহরি আসিয়াপ্রণাম করিয়া বলিল, লায়েব মশাই, কি জন্যি ডেকেচ? দণ্ডবৎ হই।

—এসো নরহরি, বসো। গোটা কুড়ি টাকা কাল যেখান থেকে পারো দিতে হবেই। জমিদারবাবু চেয়েছেন, নিয়ে যেতে হবে।

নরহরি চিন্তিত মুখে বলিল, তাই তো, বিষম হ্যাঙ্গনামায় ফ্যাললেন যে! কুড়ি টাকা এখন কোথায় পাই? আচ্ছা দেখি। কাল বেন্‌বেলা এস্তক যদি যোগাড়যন্তর করতে পারি, তবে সে কথা বলব। হ্যাঁ, একটা কথা বলি লায়েব মশাই—

—কি?

—কামিনী পিসির কিছু টাকা ছেল। সিন্দুক-প্যাঁটরা খুলে দেখেছেলেন? ওর বেশ টাকাছেল হাতে, আমরা যদ্দুর জানি। আপনি তো সে রাত্তিরি ওর কাছে ছেলেন, আপনাকে কিছুবলে যায়নি?

বিপিনের এ কথা বাস্তবিকই মনে হয় না। কামিনীর টাকা ছিল, সে শুনিয়াছে বটে; কিন্তু তাহার মৃত্যুর সময়ে বা তাহার পরে এ কথা বিপিনের মনে উদয় হয় নাই যে, তাহার টাকাগুলি কোথায় রহিল বা সে টাকার কি ব্যবস্থা কামিনী করিতে চায়!

আর যদি থাকেই টাকা, তাহাতেই বা বিপিনের কি? কামিনী বিপিনের নামে উইল করিয়া দিয়া যায় নাই, সুতরাং অত গরজ নাই বিপিনের কামিনীর টাকা কোথায় গেল তাহা জানিতে। মুখে বলিল, ছিল বলে জানতাম বটে, তবে আমায় কিছু বলে যায়নি। কেন বলো তো?

কথাটা বলিয়াই বুঝিল নরহরি যে প্রশ্ন করিয়াছে, তাহার বিশেষ অর্থ আছে। নরহরি বৃদ্ধব্যক্তি, তাহার বাবার সঙ্গে কামিনীর সম্পর্ক যে কি ছিল, এ গ্রামের বৃদ্ধ লোকেরা সবাই জানে।কামিনীর টাকার যদি কেহ ন্যায্য ওয়ারিশন থাকে, তবে সে বিপিন। সেই বিপিন কামিনীরমৃত্যুর সময়ে উপস্থিত ছিল অথচ টাকার কথা সে কিছু জানে না, পাড়াগাঁয়ে ইহা কে বিশ্বাসকরিবে?

—কামিনীর বাড়িডায় ভাল চাবিতালা লাগিয়ে দেবেন, লায়েব মশাই। রাতবিরেতের কাণ্ড, পাড়াগাঁ জায়গা—কখন কি হয়, কার মনে কি আছে, বলা তো যায় না! আচ্ছা, কালআসব বেন্‌বেলা। এখন যাই।

নরহরি চলিয়া গেলে বিপিন কথাটা ভাবিল। সিন্দুক তোরঙ্গ একবার ভাল করিয়া খুঁজিয়াদেখিবে। টাকাকড়ি এ সময় পাইলে কিছু সুবিধা ছিল বটে। কিন্তু বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা হাতড়াইতেগেলে শেষে কি একটা হাঙ্গামায় পড়িয়া যাইবে! যদি কামিনীর কোনো দূর-সম্পর্কের ভাসুরপোবাহির হইয়া পড়ে, তখন? না, সে দরকার নাই। বরং মানীর সঙ্গে পরামর্শ করা যাইবে। তার কিমত জানিয়া তবে যাহা হয় করিলে চলিবে।

সন্ধ্যাবেলা একা বসিয়া একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল বিপিনের জীবনে।

বিপিন কখনও কাহারো জন্য চোখের জল ফেলে নাই। সে এই দিক দিয়া বেশ একটুকঠোর প্রকৃতির মানুষ, কথায় কথায় চোখের জল ফেলিবার মতো নরম মন নয় তাহার। আজহঠাৎ একা বসিয়া কামিনীর কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার অজ্ঞাতসারে চোখ দিয়া জল গড়াইয়াপড়িল। মনে মনে সে একটু লজ্জিত হইয়া উঠিয়া কোঁচার কাপড় দিয়া জল মুছিয়া ফেলিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহা ভাবিয়াও আশ্চর্য হইল, কামিনী মাসিকে সে এতখানি ভালবাসিত!

আজ সে স্নেহময়ী বৃদ্ধা নাই, যে দুধের বাটি, কি লাউটা শসাটা হাতে আসিয়া তাহাকে খাওয়াইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিবে, দুটা মিষ্ট কথা বলিবে!

নিঃসঙ্গ ঘরের রোগশয্যায় একা মরিল, কেহ আপনার জন ছিল না যে একটু মুখে জল।দেয়।

কে জানে, তাহার পিতা স্বর্গগত বিনোদ চাটুজ্জে পুরাতন বন্ধুর মৃত্যুপার্শ্বে অদৃশ্য চরণেআসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন কিনা?

বুড়ি ভালবাসা কাহাকে বলে জানিত। বিনোদ চাটুজ্জে মহাশয় পরলোকগমন করিলে পরআর সে ভাল করিয়া হাসে নাই, ভাল করিয়া আনন্দ পায় নাই জীবনে।

তাহাকে ছুটিয়া দেখিতে আসিত এইজন্য যে, তাহার মুখে-চোখে হাবে-ভাবে স্বর্গীয়নায়েব মহাশয়ের অনেকখানি ফুটিয়া বাহির হয়। কর্তা মহাশয়েরই ছেলে, কর্তা মহাশয়েরতরুণ প্রতিনিধি। তাহার সঙ্গে দুইটা কথা কহিয়াও সুখ।

আজ সে বোঝে, এই যে মানীর সম্বন্ধে কথা বলিতে তাহার ইচ্ছা হয়, কাহারও সঙ্গেঅন্তত কিছুক্ষণ সেকথা বলিয়াও সুখ, না বলিলে মন হাঁপাইয়া উঠে। দেখা তো হইতেছেই না, তাহার উপর তাহার সম্বন্ধে কথা না বলিলে কি করিয়া টিকিয়া থাকা যায়—এরকম তো কামিনী মাসিরও হইত তাহার বাবার সম্বন্ধে !

অভাগিনী যে আনন্দ হয়তো পায় নাই প্রথম জীবনে, বিনোদ চাটুজ্জে নায়েব মহাশয়েরসাহচর্যে তাহা সে পাইয়াছিল। তাহার বঞ্চিতা নারী-হৃদয়ের সবটুকুকৃতজ্ঞতা প্রেমের আকারেঢালিয়া দিয়াছিল তাই নায়েব মহাশয়ের চরণযুগলে। কি পাইয়াছিল, কি না পাইয়াছিল, আজতাহা কে বুঝিবে? ত্রিশ বছর পরে কে বুঝিবে মানী তাহার জীবনে কি অমৃত পরিবেশন করিয়াছিল একদিন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

বেলা পড়িলে বিপিন পলাশপুরে পৌঁছিল।

বাহিরের বৈঠকখানায় শ্যামহরি চাকর ঝাঁট দিতেছিল, বিপিন বলিল, বাবু কোথায় রে?

—রাণাঘাট গিয়েছেন আজ সকালবেলা। সন্ধের সময় আসবেন বলে গিয়েছেন। —রাণাঘাটে কেন?

—উকিলবাবু পত্তর দিয়েছেন, বলছিলেন গিন্নিমাকে—কি মামলার কথা আছে। আপনারকথাও হচ্ছিল।

—আমার কথা ?

—হ্যাঁ, বাবু বলছিলেন, ধোপাখালির কাছারি থেকে আপনি টাকা নিয়ে এলি আপনাকে রাণাঘাট পাঠাবেন। টাকার বড় দরকার নাকি—

—বাড়িতে কে কে আছেন?

—গিন্নিমা আছেন, দিদিমণি আছেন। দিদিমণিকে নিতে আসবেন কিনা জামাইবাবু, তাইবাবু বলছিলেন আপনার নাম করে, আপনি এই সময় টাকা নিয়ে এসে পড়লে ভাল হয়, খরচপত্তর আছে।

—ও। তা এর মধ্যে আসবেন বুঝি?

—আজ্ঞে, পরশু বুধবারে তো শুনছিলাম আসবেন।

—বেশ বেশ, খুব ভাল কথা। জামাইবাবুর সঙ্গে দেখাটা হয়ে যাবে এখন এই সময় তাহলে। তুই যা দিকি বাড়ির মধ্যে। গিন্নিমাকে বলো, আমি এসেছি। আর আমার সঙ্গে টাকা রয়েছে কিনা—সেগুলো কি তাঁর হাতে দোব, না বাবু এলে বাবুকে দোব, জিজ্ঞেস করে আয়।

শ্যামহরি বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার একটু পরেই স্থানীয় পুরোহিত বটুকনাথ ভট্টাচার্য আসিয়াহাজির হইলেন। তিনি বৈঠকখানায় উঁকি দিয়া বলিলেন, কে বসে? বিপিন? বাবু কোথায়?

বিপিন আশা করিতেছিল এই সময় অনাদিবাবু বাড়ি নাই, মানী তাহার আসিবার খবর শুনিয়া বৈঠকখানায় আসিতে পারে। কিন্তু মানীর পরিবর্তে বৃদ্ধ বটুক ভট্চাজকে দেখিয়াবিপিনের সর্বশরীর জ্বলিয়া গেল।

মুখে বলিল, আসুন ভট্চাজ মশাই, বাবু নেই, রাণাঘাটে গিয়েছেন মামলার তদারক করতে। কখন আসবেন ঠিক নেই, আজ বোধ হয় আসবেন না।

এই উত্তর শুনিয়া বুড়া চলিয়া যাইবে এই আশা করাই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা না গিয়া সে দিব্য জাঁকিয়া বসিয়া গেল। বিপিন প্রমাদ গনিল, বৃদ্ধ অত্যন্ত বকবক করে সে জানে, বকুনি পাইলে উঠিতে চায় না—মাটি করিল দেখিতেছি! বাহিরের ঘরে অন্য লোকের গলার আওয়াজপাইলে মানী সেখানে পা দিবে না। অনাদিবাবু বাড়ি নাই—এমন ঘটনা ক্বচিৎ ঘটে, সাধারণততিনি কোথাও বাহির হন না। মানীও চলিয়া যাইতেছে, এমন একটা সুবর্ণ সুযোগ যদি বাঘটিল তাহার সহিত নির্জনে দুইটা কথা বলিবার, তাহাও যাইতে বসিয়াছে! বটুক ভট্চাজবলিল, মামলা? কিসের মামলা ?

বিপিন উদাস নিস্পৃহ সুরে বলিল, আজ্ঞে তা ঠিক বলতে পারছি না। শুনলাম, উকিল সুরেনবাবু চিঠি লিখেছিলেন!

—সুরেন উকিল? কোন্ সুরেন? সুরেন মুখুজ্জে?

—আজ্ঞে না, সুরেন তরফদার।

—কালী তরফদারের ছেলে ? সুরেন আবার কি হে, ওকে আমরা পটলা বলে জানি।ছেলেবেলা থেকে ওদের বাড়িতে আমার যাতায়াত, অবিশ্যি আমি ক্রিয়াকর্ম কখনও করিনিওদের বাড়ি। শূদ্রযাজক হতে পারতাম যদি, তা হলে আজ এ দুর্দশা ঘটত না। কিন্তু আমার কর্তা মশায়ের নিষেধ আছে। তিনি মরবার সময় বলে গিয়েছিলেন, বটুক না খেয়ে কষ্ট যদি পাও সেও ভাল, কিন্তু নারায়ণ-শিলা-হাতে শুদ্দুরের বাড়ি কখনও ঢুকো না। আমাদের বংশে ও কাজ কখনও কেউ করেনি, বুঝলে?

বিপিন বলিল, হুঁ।

—তা সেই পটলা আজ উকিল হয়েছে, কালী তরফদার মারা যাওয়ার পর হাতে কিছু টাকাও আজকাল পেয়েছে শুনেছি। তা ছাড়া টাকা জমাতে কি করে হয়, তা ওরা জানে।হাড়কঞ্জুস ছিল সেই কালী তরফদার, তার ছেলে তো ? ওদের আদি বাড়ি শান্তিপুর, তা জানো তো? ওর জ্যাঠামশায় এখনও শান্তিপুরের বাড়িতেই থাকে। জমিজমা আছে শান্তিপুরে। বেশ বড় বাড়ি, দোমহলা।

—ও।

—অনেকদিন আগে একবার শান্তিপুর গিয়েছি রাস দেখতে, ভারি যত্ন-আত্তি করলে আমাদের। শান্তিপুরের রাস দেখেছ কখনও? দেখবার মতো জিনিস; অত বড় মেলা এ দিগরেহয় না কোথাও।

—ও।

—এখানে তামাক-টামাক দেবার কেউ নেই? বল না একটু ডেকে! আর একটু চা যদিহয়, কাউকে বলে পাঠাও না! আমি এসেছি শুনলেই বউমা চা পাঠিয়ে দিবেন। তবে শোনো, একটা রাসের মেলার গল্প করি। সেবার হল কি জানো—ওই যে চাকরটা যাচ্ছে—ও শ্যামহরি, শোন একবার এদিকে বাবা, বাড়ির মধ্যে যা তো, বলগে, ভট্চাজ্যি মশাই একটু চা খেতেচাইছেন, আর একবার এক কলকে তামাক দিয়ে যা তো বাবা! বিপিন চা খাবে কি? ও কি, উঠছ কোথায়? বসো,বসো!

—আজ্ঞে, আপনি বসে চা খান। আমি একটু তাগাদায় যাব ওপাড়ায়, বাবু বলেগিয়েছেন, কিছু টাকা পাওয়া যাবে, এখন না গেলে হবে না, সন্ধে হয়ে এল। আমি আসি।

বিপিন বাহির হইয়া পড়িল। বটুক ভট্চাজের সঙ্গে বসিয়া গল্প করা বর্তমানে তাহারমনের অবস্থায় সম্ভব নয়।

সব নষ্ট হইয়া গেল। অনাদিবাবু সন্ধ্যার পরই আসিয়া পড়িবেন। তাহাকে তাঁহার সঙ্গে বসিয়া মুখ বুজিয়া খাইতে হইবে; তাহার পর বৈঠকখানায় আসিয়া চুপচাপ শুইয়া পড়িতেহইবে। হয়তো সে সময়ে অনাদিবাবু গড়গড়া হাতে বাহিরে আসিয়া তাহাকে জমিদারী সংক্রান্তকিছু উপদেশ দিবেন, তাহাও শুনিতে হইবে। তারপর কাল সকালে আর সে কোন ছুতায়পলাশপুরে বসিয়া থাকিবে? তাহার তো আসার কথাই ছিল না, টাকা আনিবার ছুতায় সেআসিয়াছে। টাকা ইরশালে ধরা হইয়া গিয়াছে, তাহার কাজও শেষ হইয়াছে। যাও চলিয়াধোপাখালির কাছারি—মিটিয়া গেল।

বিপিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো কিছুক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় পায়চারি করিয়া বেড়াইল। সন্ধ্যার বেশি দেরি নাই, হয়তো এতক্ষণ অনাদিবাবু আসিয়া পড়িয়াছেন। আচ্ছা, সে একটু দেরি করিয়াই যাইবে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর-ঘোর হইতে বিপিন ফিরিল। উঁকি মারিয়া দেখিল, বটুক ভট্চাজ বৈঠকখানায় বসিয়া আছে কিনা। না, কেহই নাই। অনাদিবাবুও আসে নাই, কারণ উঠানে তাহাহইলে গরুরগাড়ি থাকিত। বাড়ির গরুরগাড়ি করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই ফিরিবেন।

গাড়ি উঠানে না দেখিয়া বিপিন যে খুব আশ্বস্ত হইল, তাহা নয়। আসেন নাই বটে, কিন্তুআসিলেন বলিয়া। আর বেশি দেরি হইবার কথা নয়, দুই ক্রোশ পথ গরুরগাড়ি আসিতে।

বিপিন বৈঠকখানায় ঢুকিয়া গায়ের জামাটা খুলিবার আগে একটুখানি বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় অন্দরের দিকের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল মানী।

বিপিনের সারা দেহে যেন বিদ্যুতের মতো কি একটা খেলিয়া গেল। সে কিছু বলিবারপূর্বেই মানী বলিল, আচ্ছা, কি কাণ্ড বল তো বিপিনদা? এলে সেই ধোপাখালি থেকেতেতে-পুড়ে—শ্যামহরি চাকর গিয়ে বললে—চা করে নিয়ে আসছি, এসে দেখি ভট্চাজজ্যাঠামশাই বসে আছেন, তুমি নেই! ভট্চাজ জ্যাঠামশাই বললেন, কোথায় তাগাদায় বেরুলেএইমাত্র। তারপর দু'বার এসে খুঁজে গেলাম—কোথায় কে? এলে—চা খাও, জিরোও, তারপরতাগাদায় গেলে হত না কি? প্রজারা পালিয়ে যাচ্ছে না তো!

বিপিনের মাথার মধ্যে সব কেমন গোলমাল হইয়া গিয়াছিল মানীকে দেখিয়া, আমতা আমতা করিয়া বলিল, না, সে জন্যে নয়—তা বেশ ভাল—মেসোমশাই কি রাণাঘাটে—

মানী বলিল, দাঁড়াও, আগে তোমার চা আর খাবার আনি।

মানী কথাটা ভাল করিয়া শেষ না করিয়াই চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। বিপিন দাঁড়াইয়া বলিয়া উঠিল, মানী, শোন শোন, যাসনি, দুটো কথা বলি আগে দাঁড়া।

মানী বলিল, দাঁড়াচ্ছি, চা-টা আনি আগে।কতক্ষণ লাগবে! স্টোভ ধরাব আর করব।আগে যে চা করেছিলুম, তা তো জুড়িয়ে জল হয়ে গেল!

আবার সে চলিয়া যায়। এদিকে অনাদিবাবুও আসিয়া পড়িলেন বলিয়া। হঠাৎ বিপিন বেদনাপূর্ণ আকুল মিনতির সুরে বলিল, মানী, চা আমি খাব না। তুই যাসনি, একবার আমারকথা শোন। তুই চা আনতে যাসনি।

মানী বিস্মিত হইয়া বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, কেন বিপিনদা? চা খাবে নাকেন? কি হয়েছে তোমার? অমন করছ কেন?

বিপিন লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল, সত্যই তাহার কণ্ঠস্বরটা তাহার নিজের কানেইস্বাভাবিক শোনায় নাই! কিন্তু সে কি করিবে? মেয়েমানুষ কি কথা শোনে? চা আনিবার ঝোঁকযখন করিয়াছে, তখন চা সে আনিবেই। ধোপাখালি হইতে পথ হাঁটিয়া বিপিন এখানে চা খাইতেআসিয়াছিল?

নিজেকে খানিকটা সংযত করিয়া লইয়া বলিল, মানী যাসনি।

মানী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

—অনেকদিন তোকে দেখিনি, কথাও বলিনি, এলি আর চলে যাবি চা করতে? চা কি এতভাল জিনিস যে, না খেলে দিন যাবে না? আমি যেতে দেব না তোকে। এখানে দাঁড়িয়ে থাক।

মানী শান্তসুরে মৃদু হাসিমুখে বলিল, বিপিনদা, মেয়েমানুষের একটা কর্তব্য আছে। তুমিতেতে-পুড়ে এসেছ রাস্তা হেঁটে, আর আমি তোমার মুখে একটু জল দেবার ব্যবস্থা না করে সঙের মতো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকব—এ হয় না। তুমি একটু বসো,আমি আগে চা আনি, খেয়ে যত খুশি গল্প করো। আমি পালিয়ে যাচ্ছি না। আমারও কি ইচ্ছে নয় তোমার সঙ্গে দুটো কথা কইবার ?

মিনিট পনেরো—প্রত্যেক মিনিট এক-একটি দীর্ঘ ঘণ্টা-কাটিয়া গেল। মানীর তবুও দেখা নাই।

অনাদিবাবু কি আসিলেন? বাহিরে গরুরগাড়ির শব্দ হইল না? না, কিছু নয়। অন্যগরুরগাড়ি রাস্তা দিয়া যাইতেছে।

প্রায় পঁচিশ মিনিট পরে মানী আসিল। একটা থালায় খানকতক পরোটা, একটু আলুচচ্চড়ি, একটু গুড়। বিপিনের সামনে থালা রাখিয়া বলিল, ততক্ষণ খাও, আমি চা আনি। কতক্ষণলাগল, এই তো গিয়ে ময়দা মেখে

বেলে ভেজে নিয়ে এলুম! চায়ের জল ফুটছে, এখুনি আনছিকরে। সব ক'খানা কিন্তু খাবে, নইলে রাগ করব, আস্তে আস্তে খাও।

বিপিনের সত্যই অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল। পরোটা ক'খানা সে গোগ্রাসে খাইতে লাগিল। অনাদিবাবু বুঝি আসিলেন ? গরুরগাড়ির শব্দ না ?

চা করিতে এত সময় লাগে? কত যুগ ধরিয়া মানী কেটলিতে চায়ের জলফুটাইতেছে—যুগ-যুগান্তর ধরিয়া চায়ের জল ফুটিতেছে!

মানী আসিল। এক পেয়ালা চা এক হাতে, অন্যহাতে একটি ছোট খাগড়াই কাঁসাররেকাবে পান।

—কই, দেখি কেমন সব খেয়েছ? বেশ লক্ষ্মী ছেলে! এই নাও চা, এই নাও পান।

বিপিন হাসিয়া বলিল, ভারী খিদে পেয়েছিল, সত্যি বলছি। আঃ, চা-টুকুযে কি চমৎকারলাগছে!

মানী বলিল, মুখ দেখে বুঝতে পারি বিপিনদা। তোমার যে অনেকক্ষণ খাওয়া হয়নি, তা যদি তোমার মুখ দেখে বুঝতে না পারলুম, তবে আবার মেয়েমানুষ কি?

—দাঁড়িয়ে কেন, বসো এই চেয়ারখানায়। ভাল কথা, মেশোমশাই তো এখনও এলেন না?

—বাবা বলে গিয়েছিলেন কাজ সারতে পারলে আজ আসবেন, নয়তো কাল আসবেন।বোধ হয় আজ এলেন না, এলে এতক্ষণ আসতেন।

ওঃ এত কথা মানীর পেটে ছিল! মানী জানিত যে বাবা আজ ফিরিবেন না, তাই সে নিশ্চিন্ত মনে চা ও খাবার করিতে গিয়াছিল! আর মূর্খ সে ছটফট করিয়া মরিতেছে!

সে বলিল, মানী, তুই অমন ভাবে চিঠি আর আমায় পাঠাসনে। পাড়াগা জায়গার ভাব তুমি জানো না, থাক কলকাতায়, যদি কেউ দেখে ফেলে বা জানতে পারে, তাতে নানা রকমকথা ওঠাবে। তোমার সুনাম বজায় থাকে এটা আমি চাই। কেউ কোনো কথা তোমাকে এইনিয়ে বললে আমি তা সহ্য করতে পারব না মানী।

মানী বলিল, আমাদের চাকরের হাতে দিয়েছিলুম, সে নিজে চিঠি পড়তে পারে না। তারকাছ থেকে নিয়েই বা কে পড়বে পরের চিঠি, আর তাতে ছিলই বা কি?

তুমি আমায় আসতে বলছ এ কথাও আছে। যদি কেউ সে চিঠি দেখত, ওর অনেকরকম মানে বার করত। দরকার কি সে গোলমালের মধ্যে গিয়ে?

মানী চুপ করিয়া শুনিল, তারপর গম্ভীর মুখে বলিল, শোনো বিপিনদা, আমিও একটা কথাবলি। যদি কেউ সে চিঠি দেখত, তার কি মানে বার করত আমি জানি। তারা বলত, আমিতোমায় দেখতে চেয়েছি, তোমায় নিশ্চয়ই ভালবাসি তবে, এই তো?

বিপিন অবাক হইয়া মানীর মুখের দিকে চাহিল। মানী এমন কথা মুখ ফুটিয়া কোনোদিন বলে নাই। কোনো মেয়ে কখনও বলে না। 'তোমাকে ভালবাসি' অতি সংক্ষিপ্ত, অতি সামান্য কয়েকটি কথা, কিন্তু এই কথা কয়টির কি অদ্ভুত শক্তি, বিশেষত যখন সে মেয়েটির মুখ হইতে এ কথা বাহির হয়, যাহাকে মনে মনে ভাল লাগে। প্রণয়পাত্রীর মুখে এই স্পষ্ট সহজ উক্তিটি শুনিবার আশ্চর্য ও দুর্লভ অভিজ্ঞতা বিপিনের জীবনে এই প্রথম হইল।

মানীর উপরে সঙ্গে সঙ্গে একট অদ্ভুত ধরনের স্নেহ ও মায়া হইল। এতদিন যেন সেটামনের কোণেই প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু বাহিরে ফুটিয়া প্রকাশ পায় নাই। ওগো কল্যাণী, এই অদ্ভুতঅভিজ্ঞতা তোমারই দান, বিপিন সেজন্য চিরদিন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিবে।

মানী বলিল, বিপিনদা, কথা বললে না যে? ভাবছ বোধ হয় মানীটা বড্ড বেহায়া হয়েউঠেছে দেখছি, না?

বিপিন তখনও চুপ করিয়া রহিল। সে অন্য কথা ভাবিতেছিল, মানীর বিবাহিত জীবন কিখুব সুখের নয়? স্বামীকে কি তাহার মনে ধরে নাই?

খুব সম্ভব। বেচারি মানী ! অনাদিবাবু বড় ঘরে বিবাহ দিতে গিয়া মানীর ভাল লাগানা-লাগার দিকে আদৌ লক্ষ করেন নাই, মেয়েকে ভাসাইয়া দিয়াছেন হয়তো ধনীর সহিতকুটুম্বিতার লোভে।

মানী মৃদু হাসিমুখে বলিল, রাগ করলে বিপিনদা ?

বিপিন বলিল, রাগের কথা কি হয়েছে যে রাগ করব? কিন্তু আমি ভাবছি মানী, তোরমতো মেয়ে আমার ওপর—ইয়ে—একটুও স্নেহ দেখাতে পারে, এর মানে কি? আমার কোনকথা তোর কাছে না বলেছি! কি চরিত্রের মানুষ আমি ছিলাম, তুই তো সব জানিস। সেহীনচরিত্রের লোককে তোর মতো একটা শিক্ষিতা ভদ্র মেয়ে যে এতটুকু ভাল চোখে দেখতেপারে, সেইটেই আমার কাছে বড় আশ্চর্য মনে হয়!

মানী বলিল, থাক ও কথা বিপিনদা।

বিপিনের যেন ঝোঁক চাপিয়া গিয়াছিল, আপনমনে বলিয়াই চলিল, না মানী, আমার মনে হয়, আমার সব কথা তুই জানিসনে। কি করেই বা জানবি, ছেলেবেলার পর আর তো দেখাহয়নি! তোকে সব কথা বলি—শুনেও যদি মনে হয়, আমি তোর স্নেহের উপযুক্ত, তবে স্নেহ করিস, ধন্য হয়ে যাব। আর যদি—

মানী বলিল, আমি শুনতে চাইছি বিপিনদা?

—না, তোকে শুনতে হবে। তুমি আমাকে ভারী সাধুপুরুষ ভেবে রেখেছ, সেটা আমিবরদাস্ত করতে পারব না। রাণাঘাটে বা বনগাঁয়ে এমন কোনো কুস্থান নেই, যেখানে আমিযাতায়াত করিনি। মদ খেয়ে বাবার বিষয় উড়িয়েছি, স্ত্রীর গায়ের গহনা বন্ধক দিয়ে অন্যমেয়েমানুষের আবদার রেখেছি। যখন সব গেল, মদ জোটেনি, তাড়ি খেয়েছি, হয়তো চুরি পর্যন্ত করতাম, কিন্তু নিতান্ত ভদ্রবংশের রক্ত ছিল বলেই হোক বা যাই হোক, শেষ পর্যন্ত করা হয়নি! তাও অন্য কিছু চুরি নয়, একখানা শাড়ি। শামকুড় পোস্ট-আপিসের বারান্দায় শাড়িখানা শুকুতে দেওয়া ছিল, বোধ হয় পোস্টমাস্টারের স্ত্রীর। আমার হাতে পয়সা নেই, শাড়িখানানতুন আর বেশ ভাল, একজনকে দিতে হবে। সে চেয়েছিল, কিন্তু কিনে দেবার ক্ষমতা নেই।চুরি করবার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরলাম, পাড়াগাঁয়ের ব্রাঞ্চ পোস্ট-আপিস, পোস্টমাস্টারআপিস বন্ধ করে ছেলে পড়াতে গিয়েছে। কেউ কোনো দিকে নেই। একবার গিয়ে এক দিকেরগেরো খুললাম—

মানী চুপ করিয়া শুনিতেছিল, এইবার অধীরভাবে বলিয়া উঠিল, তুমি চুপ করবে, নাআমি এখান থেকে চলে যাব?

—না শোন, ঠিক সেই সময় একটা ছোট মেয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল। সামনেই একটা বাঁধানো পুকুরঘাট। মেয়েটাকে দেখে আমি ডাকঘরের রোয়াক থেকে নেমে বাঁধাঘাটে গিয়েবসলাম। মেয়েটা চলে গেল, আমি আবার গিয়ে উঠলাম রোয়াকে। এবারে কাপড় নেবই এইরকম ইচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, ছিঃ, আমি না বিনোদ চাটুজ্জের ছেলে? আমার বাবা কতগরিব-দুঃখী লোককে কাপড় বিলিয়েছেন আর আমি কিনা একখানা অপরের পরনের কাপড় চুরি করছি! তখন যেন ঘাড় থেকে ভূত নেমে গেল, ঠিক সেই সময় বাড়ির মধ্যে থেকে একটাছেলে বার হয়ে এসে বললে, কাকে চান? বললাম, খাম কিনতে এসেছি। খাম পাব? ছেলেটা বললে, না, ডাকঘর বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তখন চলে এলাম সেখান থেকে।

মানী বলিল, বেশ করেছিলে, খুব বাহাদুরি করেছিলে। নিজে আর নিজের গুণ ব্যাখ্যায় দরকার নেই, থাক। আমার দেওয়া বইগুলো পড়েছিলে?

—ওই যে বললাম, সব পড়া হয়নি। 'দত্তা'খানা পড়েছি, বেশ চমৎকার লেগেছে।

—'শ্রীকান্ত' পড়োনি?

—সময় পাইনি। সেখানা আনিওনি সঙ্গে, এর পর পড়ব বলে রেখে এসেছি কাছারিতে। 'দত্তা'খানা ফেরত এনেছি।

—তোমার কাছে সবই রেখে দাও না, মাঝে মাঝে পোড়ো। একলাটি থাক কাছারিতে।আমার সঙ্গে আরও যে সব বই আছে, যাবার সময় তোমার কাছে রেখে যাব। তুমি সেখানেপোড়ো বসে। আচ্ছা, বল তো বিজয়া কে?

বিপিন হাসিয়া বলিল, ও! এক্‌জামিন করা হচ্ছে বুঝি? মাস্টারনী এলেন আমার।

মানী কৃত্রিম রাগের সুরে অথচ ঈষৎ লাজুক ভাবে বলিল, আবার! উত্তর দাও আমারকথার !

—বিজয়া তোমার মতো একটি জমিদারের মেয়ে।

—তারপর?

—তারপর আবার কি? নরেনের সঙ্গে তার ভালবাসা হল। —কথাটা বলিয়াই বিপিনের মনে হইল, মানী পাছে কি ভাবে, কথাটা বলা উচিত হয় নাই, মানীও তো জমিদারের মেয়ে! 'তোমার মত' কথাটা না বলিলেই চলিত। কিন্তু মানীর মুখ দেখিয়া বোঝা গেল না। সে বেশসহজ ভাবেই বলিল, মনে হচ্ছে, পড়েছ। ভাল, পড়লে মানুষ হয়ে যাবে। এইবার রবি ঠাকুরের 'চয়নিকা' বলে কবিতার বই আছে, সেখান থেকে কবিতা মুখস্থ করো। খুব ভাল ভাল কবিতা।

বিপিন খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, কবিতা আবার মুখস্থও করতে হবে। উঃ, তুইহাসালি মানী! পাঠশালায় ইস্কুলে যা কখনও হল না, উঃ, এই বুড়ো বয়সে বলে কি না, হি-হিবলে কি না—

—হ্যাঁ, মুখস্থ করতে হবে। আমার হুকুম। শুনতে বাধ্য তুমি। মানুষ বলে যদি পরিচয় দিতে চাও তবে তা দরকার। যা বলি তাই শোনো, হাসিখুশি তুলে রাখ এখন—

কিন্তু অত্যন্ত কৌতুকের প্রাবল্যে বিপিনের হাসি তখনও থামিতে চায় না। মানী মাস্টারনীসাজিয়া তাহাকে কবিতা মুখস্থ করাইতেছে—এই ছবিটা তাহার কাছে এতই আমোদজনক মনেহইল যে সে হাসির বেগ তখনও থামাইতেই পারিল না।

এবার মানীও হাসিয়া ফেলিল। বলিল, বড্ড হাসির কথাটা কি যে হল তা তো বুঝিনে।আমার কথাগুলো কানে গেল, না গেল না?

—খুব গিয়েছে। আচ্ছা, তোর কবিতা মুখস্থ আছে?

—আছেই তো, চয়নিকা'র আদ্ধেক কবিতা মুখস্থ আছে।

—সত্যি? একটা বল না?

—এখন কবিতা বলবার সময় নয়। আর বললেই বা তুমি বুঝবে কি করে হয়েছে কিনা? তুমি তো জানোঢেঁকি, কি করে ধরবে?

—তাতেই তো তোর সুবিধে, যা খুশি বলবি, ধরবার লোক নেই।

মানী মুখে কাপড় দিয়া খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল, ওমা কি দুষ্টবুদ্ধি!

—তা বল একটা শুনি।

—শুনবে? তবে শোনো। দাঁড়াও, কেউ আসছে কিনা দেখে আসি, আবার বাইরের ঘরে দাঁড়িয়ে কবিতা বলছি শুনলে কে কি মনে করবে!

একটু পরে ফিরিয়া আসিয়া মানী স্কুলের ছাত্রীর মতো কবিতা আবৃত্তির ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়াশুরু করিল—

‘অত চুপিচুপি কেন কথা কও, ওগো মরণ হে মোর মরণ!’

বিপিন হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে আর কি! মানীর কি চোখমুখের ভাব, কি হাত-পা নাড়ারকায়দা! যেন থিয়েটারের অ্যাক্টো করিতেছে। অথচ হাসিবার জো নাই, মুখ বুজিয়া বসিয়াথাকিতে হইবে শান্ত ছেলেটির মতো। এমন বিপদেও মানুষ পড়ে। মানীটা চিরদিনই একটু ছিটগ্রস্ত!

কিন্তু খানিকটা পরে মানীর আবৃত্তি বিপিনের বড় অদ্ভুত লাগিতে লাগিল।—

‘যবে বিবাহে চলিলা বিলোচন, ও গো মরণ হে মোর মরণ!'

এই জায়গাটাতে যখন মানী আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তখন বিপিনের হাসিবার প্রবৃত্তি আরনাই, সে তখন আগ্রহের সঙ্গে মানীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বাঃ, বেশ লাগিতেছে তো পদ্যটা! মানী কি চমৎকার বলিতেছে! অল্পক্ষণের জন্য মানী বদলাইয় গিয়াছে, তাহার চোখেমুখে অন্য এক রকমের ভাব। কবিতা যে এমনভাবে বলা যাইতে পারে, তাহা সে জানিত না, কখনও শোনে নাই।

—বাঃ, বেশ, খাসা ! চমৎকার বলতে পারিস তো?

মানী যেন একটু হাঁপাইতেছে। নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছে, বড় কষ্ট হয় পদ্য আবৃত্তিকরিতে, বিশেষত অমনি হাত-পা নাড়িয়া। ভারী সুন্দর দেখাইতেছে মানীকে। মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমিয়াছে, একটু রাঙা হইয়াছে মুখ, বুক ঈষৎ উঠিতেছে নামিতেছে। এ যেন মানীর অন্য রূপ, এ রূপে কখনও সে মানীকে দেখে নাই।

নেবু খাবে বিপিনদা ? –কি নেবু?

—কমলানেবু, সেদিন কলকাতা থেকে এক টুকরি এসেছে। দাঁড়াও, নিয়ে আসি।

—যাসনি মানী, তুই চলে গেলে আমার নেবু ভাল লাগবে না।

মানী যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, বাজে কথা বোলো না বিপিনদা!বিপিন হতবুদ্ধি হইয়া বলিল, বাজে কথা কি বললাম?

—বাজে কথা ছাড়া কি! যাক, দাঁড়াও, লেবু আনি।

মানী একটু পরে দুইটি বড় বড় কমলালেবু ছাড়াইয়া একটা চায়ের পিরিচে আনিয়া যখন হাজির করিল, বিপিনের তখন লেবু খাইবার প্রবৃত্তি আদৌ নাই, অভিমানে তাহার মন বিমুখ হইয়া উঠিয়াছে।

সে শুষ্ককণ্ঠে বলিল, নেবু আমি খাব না নিয়ে যা।

—কি, রাগ হল অমনিই? তোমার তো পান থেকে চুন খসবার জো নেই, হল কি?

—না না, কিছু হয়নি, তুই যা। মিটে গেল গণ্ডগোল।

–কেন, কি হয়েছে বল না?

—আমার সব কথা বাজে। আমার কথা তোর কি শুনতে ভাল লাগে! আমি যখন বাজে লোক তখন তো বাজে কথা বলবই। তবে ডেকে এনে অপমান করা কেন?

মানী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। পরে গম্ভীর সুরে বলিল, দেখ বিপিনদা, আমি যা ভেবে বলেছি, তা যদি তুমি বুঝতে পারতে, তবে এমন কথা ভাবতে না বা বলতেও না। তোমারকথাকে কেন বাজে কথা বলেছি, তা বুঝবার মতো সূক্ষ্ম বুদ্ধি তোমার ঘটে থাকলে কথায় কথায় অত রাগও আসত না।

বিপিন চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নয়, বলিল, জানিস তো আমার মোটা বুদ্ধি, তবেআর—

মানী পূর্ববৎ গম্ভীর সুরে বলিল, তোমার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করবার সময় নেই এখনআমার, তুমি বসো। কমলালেবু এই রইল, খাও তো খেও, না খাও রেখে দিয়ো, শ্যামহরি এসেনিয়ে যাবে, আমি চললুম।

কথা শেষ করিয়া মানী এক মুহূর্তও দাঁড়াইল না।

২

বিপিন কিছুক্ষণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পূর্বের তাহার মনের সে আনন্দ আর নাই, জগৎটা যেন এক মুহূর্তে বিস্বাদ হইয়া গেল। মানী এমন ধরনের কথা কখনও তাহাকে বলেনাই। মেয়েমানুষ সবাই সমান, যেমন মানী তেমনই মনোরমা। মিছামিছি মনোরমার প্রতি মনেমনে সে অবিচার করিয়াছে। মানীও রাগি কম নয়, এখন দেখা যাইতেছে। স্বরূপ কি আর দুই-একদিনে প্রকাশ হয়, ক্রমে ক্রমে প্রকাশ হয়। যাক ওসব কথায় দরকার নাই। সেআজই—এখনই ধোপাখালি কাছারিতে ফিরিবে। কত রাত আর হইয়াছে। সাতটা হয়তো।দুইঘণ্টা জোর হাঁটিলে রাত নয়টার মধ্যে খুব কাছারি পৌঁছানো যাইবে। কমলালেবু খাওয়ারদরকার নাই আর।

কিন্তু একটা মুশকিল হইয়াছে এই, অনাদিবাবু এখনও রাণাঘাট হইতে ফিরিলেন না।সঙ্গে যে টাকা আছে, তাহা ইরশাল না করিয়া কি ভাবে যাওয়া যায়? সে আসিয়া কেন চলিয়াগেল হঠাৎ, না খাইয়া রাত্রিবেলাতেই চলিয়া গেল, একথা যদি অনাদিবাবু জিজ্ঞাসা করেন, তখন সে কি জবাব দিবে? তাঁহার মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিয়াছে— একথা বলিতে পারিবে না!

বিপিন ঠিক করিল, আর একটু অপেক্ষা করিয়া সে দেখিবে অনাদিবাবু আসেন কিনা।দেখিয়া যাওয়াই ভাল। বাড়ির মধ্যে মানীর মায়ের কাছে টাকা দেওয়া চলে না, তিনি জিজ্ঞাসাকরিবেন এত রাত্রে সে না খাইয়া কেন কাছারি ফিরিবে ? যাইতে দিবেন না, পীড়াপীড়িকরিবেন। সব দিকেই বিপদ।

মানী কেন ও কথা বলিল? বড় হেঁয়ালি ধরনের কথাবার্তা বলে আজকাল। কি গূঢ় অর্থ জানি উহার মধ্যে নিহিত আছে! আছে থাকুক, গূঢ় অর্থ মাথায় থাকুক, সে এখন চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে।

কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও অনাদিবাবু আসিলেন না। রাত নয়টা বাজিয়া গেল, পল্লীগ্রামে ইহারই মধ্যে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া যায়। একবার শ্যামহরি চাকর আসিয়া বলিল, মাবলে পাঠালেন আপনি একা খেয়ে নেবেন, না বাবু এলে খাবেন?

বিপিন বলিল, বলগে বাবু এলে খাব এখন একসঙ্গে। কিন্তু রাত দশটা বাজিয়া গেল, তখনও অনাদিবাবুর দেখা নাই। অগত্যা সে বাড়ির মধ্যে একাই খাইতে গেল।

মানীর মা পরিবেশন করিতেছিলেন, মানী সেখানে নাই। বিপিনের মন ভাল ছিল না, সেঅন্যমনস্কভাবে তাড়াতাড়ি খাইতে লাগিল। যেন খাওয়া শেষ করিতে পারিলে বাঁচে।

মানীর মা বলিলেন, বিপিন, টাকাকড়ি কিছু এনেছ নাকি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মাসিমা, মেশোমশাই তো এলেন না রাণাঘাট থেকে, আমি কাল খুব ভোরে চলে যাব ধোপাখালি কাছারি। টাকা আপনি নিয়ে রাখুন। খেয়ে উঠে আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

—কাল সকালেই কাছারি যাবে কেন? কর্তার সঙ্গে দেখা করে যাবে না? তিনি বলেইগিয়েছিলেন, আজ যদি না আসেন, কাল নিশ্চয়ই আসবেন সকাল আটটার মধ্যে।

—আমার থাকা হবে না মাসিমা, কাজ আছে।

—কাল জামাই আসবেন মানীকে নিতে, এদিকে দেখ বাবা, মেয়ের কি হয়েছে সন্ধেরপর থেকে—ওপরে শুয়ে আছে, খায়নি দায়নি। ওর আবার কি যে হল! এদিকে কর্তা নেই বাড়ি, তুমি যাচ্ছ চলে, আমি আতান্তরে পড়ে যাব তা হলে।

বিপিন ভাতের গ্রাস হাতে তুলিয়াছিল, মুখে না দিয়া সেই অবস্থাতেই মানীর মায়েরমুখের দিকে চাহিয়া কথাটা শুনিতেছিল। কথা শেষ হইতে বলিল, কি হয়েছে মানীর ?

কি হয়েছে কি জানি বাবা! দু'বার ওপরে গেলাম, বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে, উঠলও না। বললে, আমার শরীর ভাল না, রাত্তিরে খাব না কিছু। বললুম, একটু গরম দুধ খাবি? বললে তাও খাবে না। কি জানি বাবা, কিছুই বুঝলুম না। একালের ধাতের মেয়ে, ওদের কথাআদ্ধেক থাকে পেটে, আদ্ধেক মুখে, কি হয়েছে না হয় বল, তাও বলবে না।

বিপিন আহারাদি শেষ করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিল বটে, কিন্তু নিদ্রা যাইবারএতটুকু ইচ্ছা মনে জাগিল না। মানীর মনে নিশ্চয়ই সে কষ্ট দিয়াছে, মানীর অসুখবিসুখ কিছুইনয়, বাহিরের ঘর হইতে গিয়াই সে উপরের ঘরে শুইয়া পড়িয়াছে। কেন? কি বলিয়াছিল সেমানীকে? সে চলিয়া গেলে লেবু ভাল লাগিবে না—এই কথার মধ্যে প্রেমনিবেদনের গন্ধ পাইয়া কি মানী নিজেকে অপমানিতা মনে করিয়াছে? কিন্তু এ ধরনের কথা সে তো ইতিপূর্বে আরও কয়েকবার মানীকে বলিয়াছে, তাহাতে তো মানী চটে নাই!বিপিনের মন বলিল এ কারণ আসল কারণ নয়। অন্য কোনো ব্যাপার আছে ইহার মধ্যে। তা ছাড়া মানীর অত যত্নে দেওয়া লেবু সে খাইতে চাহে নাই, রাগের মাথায় অত্যন্ত রূঢ়ভাবে মানীর সঙ্গে কথাবার্তা বলিয়াছিল। ছিঃ, ছিঃ, কি অন্যায় সে করিয়া বসিয়াছে! মানীর মতোতাহার শুভাকাঙ্ক্ষিণী জগতে খুব বেশি আছে কি?

রাত তিনটে পর্যন্ত বিপিনের ঘুম হইল না। মানীর সঙ্গে যদি এখনই একবার দেখা হইত!সত্যই, সে বড় আঘাত দিয়াছে মানীর মনে। মানীর নিকট ক্ষমা না চাহিয়া সে ধোপাখালিযাইতে পারিবে না। কে জানে হয়তো এই মানীর সঙ্গে শেষ দেখা! এ চাকুরি কবে আছে, কবেনাই। আজ সে অনাদিবাবুর নায়েব, কালই সে অন্যত্র চলিয়া যাইতে পারে। মানী হয়তোকতদিন এখন আর আসিবে না। অনুতাপের কাঁটা চিরদিনই ফুটিয়া থাকিবে বিপিনের মনে।

সকাল হইলে যে-কোনো ছুতায় মানীর সঙ্গে দেখা করিতেই হইবে। না হয়, দুপুরেআহারাদি করিয়া কাছারি রওনা হইলেই চলিবে এখন। মানীর মনের কষ্ট না মুছাইয়া সে এ স্থানত্যাগ করিবে না।

৩

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। শেষরাত্রের দিকে বিপিনের ঘুম আসিয়াছিল, কাহাদের ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকিতে তাহার ঘুম ভাঙিয়া গেল। চোখ মুছিতে মুছিতে উঠানের দিকে চাহিয়াদেখিল, একখানা গরুরগাড়ি দাঁড়াইয়া আছে, গাড়োয়ান একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন উঁচু করিয়াহাঁকডাক করিতেছে, অনাদিবাবু ছইয়ের ভিতর হইতে নামিতেছেন।

শ্যামহরি চাকরও বৈঠকখানায় শোয়, বিপিন তাহাকে জাগাইয়া তুলিল। অনাদিবাবুবিপিনকে দেখিয়া বলিলেন, এই যে বিপিন! তোমার কথাই ভাবছিলাম। বড্ড জরুরি কাজেরাণাঘাট যেতে হবে তোমাকে কাল সকালেই। আজ রাত্রেই তোমায় কাগজপত্র দিয়ে দিই, কাল বেলা আটটার মধ্যে উকিল-বাড়ি দাখিল করে দিতে হবে। ভাবছিলাম কাকে দিয়ে পাঠাই! তুমিএ সময়ে এসে পড়েছ, খুব ভাল হয়েছে। বসো,আমি আসছি ভেতর থেকে। সেখান থেকেবেরিয়েছি রাত দশটার পরে। নতুন গরু, চলতে পারে না পথে, এখন রাত তো প্রায়—আঃ, কিকষ্টই গিয়েছে সারারাত!

বাড়ির ভিতর হইতে তখনই ফিরিয়া অনাদিবাবু বিপিনকে কাগজপত্র বুঝাইয়া দিলেন।

বলিলেন, আমি গিয়ে শুয়ে পড়ি, তুমিও শোও। এখনও ঘণ্টা দুই রাত আছে। ভোরে উঠে চলেযেও। যদি উকিলবাবু ছেড়ে দেন, তবে কালই ওখানে খাওয়াদাওয়া করে বিকেল নাগাদ এখানেচলে এসো। কাল আবার

আমার মেয়েকে নিতে জামাই আসছেন কলকাতা থেকে, পারো তো কিছুমিষ্টি এনো সাধুচরণ ময়রার দোকান থেকে। এই একটা টাকা নিয়ে যাও।

খুব ভোরে উঠিয়া বিপিন রাণাঘাট রওনা হইল। যাইবার সময় সারাপথ দেখিল, খুবভোরে উঠিয়া চাষারা জমি নিড়াইতেছে। এবার বৈশাখের প্রথমে বৃষ্টি হইয়া ফসল বুনিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিল, এখন বৃষ্টি আদৌ নাই, জমিতে জমিতে নিড়ানি দেওয়া চলিতেছে।হয়তো এবার জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি বর্ষা নামিবে—এই ভয়ে চাষিরা শীঘ্র শীঘ্র ছাঁটার কাজ শেষকরিতে চায়। সারাপথ দুইধারে মাঠে ধান-পাটের ক্ষেতে চাষারা জমি নিড়াইতেছে।

ভোরের অতি সুন্দর মিষ্টি বাতাস। মাঠে ও পথের ধারে ছোট বড় গাছে সোঁদালি ফুলের ঝাড় ঝুলিতেছে, বিশেষ করিয়া কানসোনার মাঠে। রেলের ফটক পার হইয়া আবাদ তত নাই, ফাঁকা মাঠের মধ্যে চারিধারে শুধুই সোঁদালি ফুলের গাছ।

কলাধরপুরের বিশ্বাসদের বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে বিপিন একবার তামাক খাইবার জন্য বসিল।প্রতিবার রাণাঘাট হইতে যাতায়াতের পথে এইটা তাহার বিশ্রামের স্থান। বিশ্বাসদের বাড়িরসকলেই বিপিনকে চেনে। বিশ্বাসদের বড়কর্তা রমা বিশ্বাস চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পাটের দড়ি পাকাইতে ব্যস্ত ছিলেন। বিপিনকে দেখিয়া বলিলেন, এই যে আসুন চাটুজ্জে মশায়, প্রণাম হই।আজ যে বড্ড সকালে রাণাঘাট চলেছেন, মোকদ্দমা আছে নাকি? উঠে বসুন ভাল হয়ে, একটু চাকরে দিক!

—না না, চায়ের দরকার নেই। একটু তামাক খাই বরং।

—আরে, তামাক তো খাবেনই, চা একটু খান। অত সকালে তো চা খেয়ে বেরোননি? এখন সাতটা বাজে, আমিও তো চা খাব। বসুন, চার ক্রোশ রাস্তা হেঁটেছেন এর মধ্যে, কষ্ট কম হয়েছে? একটু জিরোন।

মানীর সঙ্গে ফিরিয়া আজ দেখা হইবে কি? আর দেখা হওয়া সম্ভবও নয়। দেখা হইলেওকথাবার্তা তেমনভাবে হইবে না। জামাইবাবু আসিবেন, কর্তা বাড়ি রহিয়াছেন। তবুও একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে হইবে।

বিশ্বাস মহাশয় চা ও মুড়ি আনিয়া দিলেন। বিপিন খাইতে খাইতে বলিল, এবার পাট ক'বিঘে বুনলেন বিশ্বেস মশায় ?

—তা ধরুন, প্রায় বারো-চোদ্দো বিঘে হবে। বুনলে কি হবে, খরচা পোষায় না, দশ টাকাকরে দুটো কিষান, তা বাদে জন-মজুর তো আছেই। পাটের দর তো উঠল না। ওই দেখুন।ছত্রিশ সালে পাটের দর ভাল পেয়ে উত্তরের পোতায় বড় ঘরখানা তুলতে গিয়েছিলাম, আদ্ধেক গাঁথুনি হয়ে দেখুন পড়ে আছে, আর দর পেলাম না, তা কি হবে?

—আপনার বড়ছেলে কোথায়?

—সে ওই বীজপুরের কারখানায় ত্রিশ টাকা মাইনেয় ঢুকেছে, রং-মিস্ত্রী। আমি বলি, ওকেন, বাড়িতে এসে ফলাও করে চাষ-বাস লাগা। মেসে খায়, একটু দুধ-ঘি পেটে যায় না, শরীর মাটি। ও মাসে বাড়ি এসেছিল, আমার স্ত্রী এক বোতল ঘরের গাওয়া ঘি সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে আবার। ওই খাটুনি, দুধ ঘি না খেলে শরীর থাকে? উঠলেন? ফিরবার পথে পায়ের ধুলো দিয়ে যাবেন। না হয় এখানেই ফিরবার সময় দুটো স্বপাকে আহার করে যাবেন এখন।

—না না, আমি সেখানেই খাব। উকিলের কাজ মিটতে বেলা এগারোটা বাজবে। তারপরহয়তো একবার কোর্টেও যেতে হবে স্ট্যাম্পভেন্ডারের কাছে। ফিরতে তো তিনটের কম হবে না। আচ্ছা, আসি।

—আজ্ঞে আসুন, প্রণাম হই।

রাণাঘাট কোর্টে বিপিনের স্বগ্রামের নিবারণ মুখুজ্জের সঙ্গে দেখা। নিবারণ মুখুজ্জেবিপিনকে দূর হইতে দেখিয়া কাছে আসিলেন, বিপিন প্রথমে তাহাকে দেখিতে পায় নাই।

—কে বিপিন?, কোর্টে কাজে এসেছিলে বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাকা। আপনি?

—আমিও এসেছিলাম একবার একটা কাগজের নকল নিতে। আমার আবার একটুব্রহ্মোত্তর জমি নদীয়ার এলাকায় পড়ে কিনা, সেজন্যে রাণাঘাট ছুটোছুটি করতে হল। হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে বাবা। দেখা হল ভালই হল। একটু আড়ালের দিকে চলোযাই, গোপনীয় কথা।

বিপিন একটু কৌতূহলী হইয়া নিবারণ মুখুজ্জের সহিত লোকজন হইতে একটু দূরেগেল।

—বাবা, কথাটা খুব গুরুতর। তোমার বাড়ির সম্বন্ধেই কথা। তুমি থাক বারো মাস বিদেশে, নিশ্চয়ই তোমার কানে এখনও ওঠেনি। বড় গুরুতর কথা আর বড় দুঃখের কথা।

বিপিন আশঙ্কায় উদ্বেগে কাঠ হইয়া গেল। বাড়ির সম্বন্ধে কি গুরুতর, আর কি দুঃখের কথা! প্রথমেই তাহার মুখ দিয়া আপনা-আপনি বাহির হইয়া গেল—কাকাবাবু, বেঁচে আছে তো?

তাহার বুকের মধ্যে কেমন ধড়াস ধড়াস করিতেছে, জজের মুখে ফাঁসির হুকুম শুনিবারভঙ্গিতে সে আকুল ও শঙ্কিত দৃষ্টিতে নিবারণমুখুজ্জের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিবারণ মুখুজ্জে বলিলেন, না না, সে সব কিছু নয়। ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। বলেই ফেলি। এই গিয়ে তোমার বোনকে নিয়ে গায়ে কথা উঠেছে—মানে ওপাড়ার পটলের সঙ্গেসর্বদাই মেলামেশা করে আসছে তো অনেকদিন থেকেই—সম্প্রতি একদিন নাকি সন্ধেবেলাতোমাদের বাড়ির পেছনে বাগানে কাঁটালতলায় দুজনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল—যে দেখেছিল সে-ই বলেছে। এই নিয়ে গাঁয়ে খুব কথা চলছে। এইসময় তোমার একবার যাওয়া খুব দরকার বলে মনে করি।

বিপিন শুনিয়া অবাক হইয়া গেল—তাহার বোন অসঙ্গত কিছু করিতে পারে ইহা তাহারমাথায় আসে না। তাহাকে বিপিন নিতান্ত ছেলেমানুষ বলিয়া জানে—আচ্ছা, যদি পটলের সঙ্গে কথাই বলিয়া থাকে তাহাতে দোষ বা কি আছে?

পরক্ষণেই তাহার মনে হইল বাড়ি যাওয়াটা খুব দরকার বটে এসময়। পলাশপুরে এমন কোনো জরুরি দরকার নাই যে আজ না ফিরিলেই চলিবে না। বরং একবার বাড়ি ঘুরিয়া আসাযাক্।

৪

বৈকালের দিকে বিপিন গ্রামে পৌঁছিল। বাড়ি ঢুকিতেই প্রথমে মনোরমার সঙ্গে দেখা। স্বামীকেহঠাৎ এভাবে আসিতে দেখিয়া সে যেন একটু অবাক হইয়া গেল। বলিল—কখন এলে, কোন্ গাড়িতে? চিঠি তো দাওনি? ভাল আছ তো?

বিপিন পুঁটুলিটা স্ত্রীর হাতে দিয়া বলিল—ধরো এটা। মার জন্যে বাতাসা আছে, ভেঙ্গে নাযায় দেখো। নেবেঞ্চুস্ আছে, ছেলেপিলেদের ডেকে দাও। তোমরা কেমন আছ? বলাই কোথায় ?

বলাই গিয়েছে মাছ ধরতে।

—কেমন আছে সে?

মনোরমা চুপ করিয়া রহিল।

—কেমন আছে বলাই?

—ভাল না। আমার কথা কেউ তো শোনে না, যা পাচ্ছে তা খাচ্চে, রোজ নদীর ধারেমাছ ধরতে গিয়ে জলের হাওয়ায় বসে থাকে জ্বর হয় রোজ রাত্তিরে—তার ওপর খায়-দায়।ওষুধবিষুধ কিছুই না।

—মুখ হাত পা কেমন আছে?

—বেজায় ফোলা। এলেই দেখে বুঝতে পারবে। আজ একটা কথা শুনেচ? -হ্যাঁ, নিবারণ কাকার মুখে শুনলাম রাণাঘাটে। কি ব্যাপার বলো তো?

—যা শুনেছ, সব সত্যি, আমার কথা ঠাকুরঝি একেবারে শোনে না—কতদিন বারণ করেছি। মাকেও বলে দিইছি, মা শুনেও শোনেন না। এখন গাঁয়ে ঢি-ঢি পড়ে গিয়েছে—এখন আমার কথা হয়তো তোমাদের ভাল লাগলেও লাগতে পারে। দাসী-বাঁদীর মতো এ বাড়িতে আছি বই তো নয়!

বিপিন বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ, যা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও না আগে! তুমিনিজের চোখে কিছু দেখেছ?

—কত দিন। তোমাকে বললেই তুমি রেগে যাবে বলে কিছু বলিনি—মাকে বলে কিহবে—বলা না বলা দুই সমান।

—আচ্ছা থাক। বীণাকে একবার ডেকে দাও—আমি তাকে দু-একটা কথা বলি। তুমি এঘর থেকে যাও।

কিন্তু মনোরমা ঘর হইতে চলিয়া গেলেও বীণার আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। এব্যাপার লইয়া সে কি বলিবে ? বীণা তাহার ছোট বোন, কখনও তাহাকে সে রূঢ় কথা জীবনেবলে নাই—বিশেষ করিয়া বীণা বিধবা হইবার পরে বিপিন সাধ্যমতো চেষ্টা করে ছেলেমানুষ বীণাকে কি করিয়া একটুখানি সুখী করা যায়। বিপিন ভাবিতে লাগিল—বীণার দোষ কি? অল্পবয়সে বিধবা—ওর মনের কোন্ সাধই বা পুরেছে? পটলকে হয়তো ওর চোখে ভাল লেগেছে—সম্পূর্ণ সম্ভব। ছেলেবেলা থেকেই পটলের সঙ্গে ওর ভাব ছিল, আর কেউ নাজানুক, আমি জানি। যদি পটলের সঙ্গে দুটো কথা কয়ে ওর তৃপ্তি হয়—তা আমি বারণ করি বা কি ভাবে!...তবে বীণা ছেলেমানুষ, সংসারের কি-ই বা জানে! কত বিপদ আছে কত দিকে, সে কি তার খবর রাখে? না—আমার কাজ নয়। মনোরমাকে দিয়ে বলাতে হবে।

হঠাৎ তাহার মনে আসিল মানীর কথা।

সেও তো এই রকম ছেলেবেলার বন্ধুত্ব। মানী বিবাহিতা, তার স্বামী শিক্ষিত, মার্জিত, ভদ্র যুবক। তবে মানীকেন তাহার সহিত কথা বলিতে আসে? কেন তাহাকে দেখিবার জন্যমানীর এত আগ্রহ?

এসব কথার কোনো মীমাংসা নাই। মীমাংসা হয় না। এই যে সে আজ বাড়ি আসিয়াছে —সারা পথ সারা ট্রেনে কাহার কথা সে ভাবিয়াছে ?

নিজের মনকে চোখ ঠারা চলে না। ছেলেমানুষ বীণাকে সে কি দোষ দিবে? তাহার বাবা কি করিয়াছিলেন?

যাক ওসব কথা। মনোরমাকে দিয়া বীণাকে বলাইতে হইবে। গ্রামে কোনো কুৎসা রটেবীণার নামে—তাহা কখনই হইতে দেওয়া চলিবে না। আবশ্যক হইলে বীণাকে এখান হইতেসরাইয়া ধোপাখালি কাছারিতে নিজের কাছে কিছুদিন না হয় রাখিবে।

এই সময় বীণা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ডাকছিলে দাদা?

বিপিন চোখ তুলিয়া বীণার দিকে চাহিল। অনেক দিন ভাল করিয়া সে বীণাকে দেখে নাই।বীণার মুখশ্রী আজকাল এত সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে! কি সুন্দর দেখিতে হইয়াছে বীণা ! চোখ দুটি যেমন ডাগর, তেমনি স্নিগ্ধ। মুখখানি এখনও ছেলেমানুষের মতোই। এ চোখে ও মুখে কোনোপাপ থাকিতে পারে?

বিপিন বলিল—বলাই কোথায় ?

—ছোড়দা মাছ ধরতে গিয়েছে।

—তোর শরীর ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ। তুমি হঠাৎ চলে এলে যে?

—এমনি। রাণাঘাটে এসেছিলাম কাজে—ভাবলুম একবার বাড়ি ঘুরে যাই। হ্যাঁ, মাকোথায় ?

—মা বড়ির ডাল ধুতে গিয়েছেনপুকুরের ঘাটে। ডেকে আনব?

—থাক এখন ডাকার দরকার নেই, তোর সঙ্গে একটা কথা ছিল।

—কি বল না?

—তুই পটলের সঙ্গে বেশি মেলামেশা করিসনে। গাঁয়ে ওতে পাঁচরকম কথাউঠছে—আমরা গরিব লোক, আমাদের পক্ষে সেটা ভাল নয়।

বিপিন কথাটা মরীয়া হইয়া বলিয়াই ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও লক্ষ্য না করিয়া পারিলনা, পটলের কথা বলিতেই বীণার চোখমুখের ভাব যেন কেমন হইয়া গেল—যে ভাব সেবীণার মুখে-চোখে কখনও দেখে নাই।

মনোরমার কথা তাহা হইলে মিথ্যা নয়—নির্বারণ মুখুজ্জেও বাজে কথা বলেন নাই! পূর্বে হইলে হয়তো বিপিন বীণার এ পরিবর্তন লক্ষ্য করিত না—কিন্তু গত কয়েক মাসেরব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে বিপিন এসব লক্ষণ বুঝিতে পারে এখন।

বীণা কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেকে যেন সামলাইয়া লইয়া সহজ ভাবেইবলিল—যা বলো দাদা, পটলদা আসে, কথাবার্তা বলে—তাই বলি। না হয় আর বলব না।

বিপিন বুঝিল ইহা মিথ্যা আশ্বাস। বীণা ছলনা করিতেছে—পটলের সঙ্গে তাহার কিছুই নাই, ইহা সে দেখাইতে চায়—আর একটা খারাপ লক্ষণ, ছেলেমানুষ বীণা ভাবিয়াছে ইহাতেইদাদার চোখে ধূলা দেওয়া যাইবে—যাইতও যদি মানীর সঙ্গে পলাশপুরের বাড়িতে তাহার দেখা নাহইত!

ইহা ঠিকই যে বীণা মিথ্যা কথা বলিতেছে। পটলের সঙ্গে কথাবার্তা সে বন্ধ করিবে না।লুকাইয়া দেখা করিবার চেষ্টা করিবে। বিপিন বুঝিল, সে বীণা আর নাই, তাহার ছোট বোনসরলা ছেলেমানুষ বীণা এ নয়, এ প্রেমমুগ্ধা তরুণী নারী, প্রেমিকের সহিত মিশিবার সুবিধাখুঁজিতে সব রকম ছলনা এ অবলম্বন করিবে। সহোদরা বটে, কিন্তু বীণাকে আর বিশ্বাস নাই।বীণা দূরে সরিয়া গিয়াছে।

বিপিন তবুও হাল ছাড়িল না। বীণাকে কাছে বসাইয়া তাহাদের বংশের পূর্ব-গৌরবসবিস্তারে বর্ণনা করিল। গ্রাম্য কুৎসা যে ভয়ানক জিনিস, তাহাতে একটি গৃহস্থের ভবিষ্যৎ কি ভাবে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, দু-একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিল।বীণা খানিকক্ষণ মন দিয়া শুনিল—কিন্তু ক্রমশ সে যেন অধীর হইয়া পড়িতেছে, দু-একবার উঠিবার চেষ্টা করিয়াও সে সাহস পাইতেছে না—দাদার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইতে পারিলেযেন বাঁচে, এরূপ ভাব তাহার চোখে মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

৫

এই সময়ে বলাই আসিয়া পড়াতে বিপিনের বক্তৃতা আপনা-আপনিই বন্ধ হইয়া গেল। বলাই ঘরে ঢুকিয়া বলিল—দাদা কখন এলে? মাছ ধরে এনেছি দেখবে এসমস্ত একটা শোল মাছআর দুটো ছোট ছোট বান—

বিপিন বলাইয়ের চেহারা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। মুখ আরও ফুলিয়াছে, শরীরে রক্তনাই—পায়ের পাতা বেরিবেরি রোগীর মতো দেখিতে, চোখের কোণ সাদা। অথচ এই চেহারালইয়া বলাই দিব্য মনের আনন্দে মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে, খাওয়া-দাওয়া করিতেছে।

ভগবান এ কি করিলেন? চারিদিক হইতে তাহার জীবনে বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহা বুঝিতে বাকি নাই। বলাই বাঁচিবে না—নেফ্রাইটিসের রোগীর শেষ অবস্থা তাহার চেহারায় পরিস্ফুট—অথচ সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত আছে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে।

বিপিন বলাইকে কিছু বলিল না। বলিয়া কোনো ফল নাই—যেমন বীণাকে বলিয়া কোনোফল নাই। কেহই তাহার কথা শুনিবে না। সে চাকুরি করিতে বাহির হইলেই উহারা যাহা খুশিতাহাই করিবে। এ জগতে কেহ কাহারও কথা শোনে না—সবাই স্বার্থপর, যাহার যাহা ভাললাগে সে তাহাই করে, অন্য কারও মুখের দিকে চাহিবার অবসর তখন তাহাদের বড় একটা থাকে না। সে নিজে সারাজীবন তাহাই করিয়া আসিয়াছে—এখনও করিতেছে—অপরের দোষ দিয়া লাভ কি?

দুপুরের পর সে নিজের ঘরে বিশ্রাম করিতেছে, মনোরমা ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ঘুমুলে নাকি?

—না ঘুমুইনি, বসো।

মনোরমা বিছানার এক কোণে বিপিনের মাথার কাছে বসিল। একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—বীণাকে বল্লে কিছু নাকি?

—বলেছি।

—ও কি বল্লে ?

—বল্লে পটলের সঙ্গে আর কথা বলবে না।

—একটা কথা বলি শোনো। এরকম করলে হবে না কিছু। বীণা ঠাকুরঝি যাই বলুক, পটলের সঙ্গে দেখা না করে পারবে না। তুমি বাড়ি থেকে বেরুতে যা দেরি। তার চেয়ে এককাজ করো, পটলকে একবার বলে যাও কথাটা। ওকে ভয় দেখাও, বাড়ি আসতে বারণ করেযাও—তাতে কাজ হবে। বুঝলে আমার কথা?

বিপিন মনে মনে মনোরমার বুদ্ধির প্রশংসা না করিয়া পারিল না। মেয়েমানুষের মন সে অনেক বেশি বোঝে তাহার নিজের চেয়ে।

মনোরমা আবার বলিল—না হয় পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে তাদের সামনে পটলকে দু'কথা বল। এ বাড়ি আসতে মানা করে দাও। তাতে দু'কাজই হবে। গাঁয়ের লোক জানুক তুমি বাড়িএসে দুজনকেই শাসন করে দিয়েছ—পটলেরও একটা ভয় আর লজ্জা হবে—সে হঠাৎ এবাড়িতে আসতে পারবে না।

—কিন্তু তাতে একটা বিপদ আছে। গাঁয়ের লোকের কথা আমিই বা অনর্থকগায়ে মেখেনিতে যাই কেন? তাতে উল্টো উৎপত্তি হবে না?

—কিছু উল্টো উৎপত্তি হবে না। বেশ, ভয় দেখিয়ে না হয়, মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে বলোপটলকে—যখন এরকম একটা কথা উঠেছে—তখন ভাই আমাদের বাড়ি আর তোমারযাওয়া-আসাটা ভাল দেখায় না—এই ভাবে বলো।

—তাই তবে করি। এদিকে আর একটা কথা বলি শোনো। বলাইয়ের অবস্থা ভাল নয়। আজ দেখে বুঝলাম, ও আর বেশি দিন নয়।

—বলো কি গো? অমন বলতে নেই।

—আর বলতে নেই! মনোরমা, সামনে আমার অনেক বিপদ আসছে আমি বুঝতেপেরেছি। এই বীণার ব্যাপার, বলাইয়ের চেহারা—এ সব দেখে তোমারই বা কি মনে হয়? আমার এখন পলাশপুরে যাওয়া হয় না।...

সেই রাত্রেই বিপিনের আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হইল। শেষরাত্রি হইতে বলাই হঠাৎযন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িল, মাঝে মাঝে চিৎকার করে, মাঝে মাঝে ছুটিয়া বাহির হইতে যায়। প্রতিবেশীরা অনেকে দেখিতে আসিলেন—নানারকম টোটকা ওষুধের ব্যবস্থা করিলেন— কিছুতেই কিছু হইল না। যত বেলা বাড়িতে লাগিল, বলাই-এর মুখের বুলিই হইল—জ্বলে গেল, জ্বলে গেল!..যন্ত্রণায় বলাই যেন পাগলের মতো হইয়া উঠিল, মুখে যাহা আসে বকে, হাত-পা ছোঁড়ে, আর কেবলই ছুটিয়া বাহির হইতে যায়।'

তিন দিন তিন রাত্রি একই ভাবে কাটিল। কত রকম তেল-পড়া, জল-পড়া, ঝাড়ফুঁক যেযাহা বলে তাহাই করা হইল। কিছুতেই কিছু হইল না। চতুর্থ দিন সকাল আটটার সময় হইতেবলাইয়ের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল।

বিপিন স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল—কি করছ?

মনোরমার চক্ষু রাত জাগিয়া লাল, চোখের নীচে কালি পড়িয়াছে—বৃদ্ধা শাশুড়ি. রাত জাগিতে পারেন না—বিপিনও আয়েসী লোক, রাত একটা পর্যন্ত কায়ক্লেশে জাগিয়াথাকে—তারপর গিয়া শুইয়া পড়ে। মনোরমা সারারাত জাগিয়া থাকে রোগীর পাশে আর থাকে বীণা।

মনোরমা বলিল—গোয়ালে আজ চারদিন ঝাঁট পড়েনি, গোয়ালটা একটু ঝাঁট দিচ্ছি।

বিপিন বলিল—গোয়াল-ঝাঁট থাকুক। সকাল সকাল নেয়ে এসে দুটো যা হয় রেঁধেছেলেপিলেদের খাইয়ে-দাইয়ে নাও—বীণাকে আর মাকে খাইয়ে দাও। বলাইয়ের অবস্থা দেখেবুঝতে পারছ না?

মনোরমা স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, কেন গো—ঠাকুরপোর অবস্থাখারাপ?

তা দেখে বুঝতে পারছ না? আজই হয়ে যাবে। আর দেরি নেই। শীগ্‌গির করে ঘাটেযাও।

মনোরমা নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। বিপিন বলিল—কেঁদে কি হবে, এখন যা করবারআছে করে ফেল। মায়ের সামনে কেঁদো না, ঘাটে যাও চলে।

মনোরমার একটা অভ্যাস সংসারের মধ্যে যে যে আছে তাহাদের সকলকেই সে ভালবাসে, স্নেহ করে—মা, বীণা ঠাকুরঝি, ঠাকুরপো—সকলেরই সুখসুবিধা দেখা তাহার চিরকালের অভ্যাস। এই সাজানো সংসারের মধ্য হইতে বলাই ঠাকুরপো চলিয়া গেলেসংসারের কতখানি চলিয়া যাইবে!..সে চিন্তা মনোরমার পক্ষে অসহ্য।

বিপিন ভাইয়ের সামনে গিয়া বসিল। বীণাকে বলিল—যা বীণা, ঘাটে যা—আমি আছিবসে। মাকে নিয়ে যা।

সত্যি, এতটুকু মেয়ে বীণা কয়দিন কি অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছে, সমানে রাত জাগিতেছে মা ও উহার বউদিদির সঙ্গে। দেবীর মতো সেবা করিতেছে ভাইয়ের, অথচ কি অভাগিনী! জীবনে সে কখনও যাহা পায় নাই—অথচ যার জন্য তার বালিকা-মন বুভুক্ষু, অপরের নিকট হইতে তারই এককণা পাইবার নিমিত্ত অভাগিনীর কি ব্যর্থ আগ্রহ! নিজেকেদিয়া বিপিন বোঝে এ নিদারুণ বুভুক্ষা।

সকলে আহারাদি শেষ করিয়া লইয়া বলাইয়ের কাছে বসিল। বলাইয়ের গত দুই দিনকোনো জ্ঞান ছিল না—যন্ত্রণায় চিৎকার করে মাঝে মাঝে কিন্তু মানুষ চিনিতে পারে না। বিপিনের মা খুব শক্ত মেয়ে—তিনি সবই বুঝিয়াছিলেন, অথচ এ পর্যন্ত তাহার চোখে জল পড়ে নাই—বরং বীণা ও মনোরমা কাঁদিলে তিনি কালও বুঝাইয়াছেন। আজ কিন্তু দুপুরের পর হইতেতিনি অনবরত কাঁদিতেছেন। বীণা ডোবার ধারে বাসন লইয়া গিয়াছিল।

ডোবার ওপারের ঘাটে রায়-বউ ও নিবারণ মুখুজ্জের বড় মেয়ে নলিনী কথাবলিতেছিল। নলিনী হাত-পা নাড়িয়া বলিতেছে—তা হবে না ওরকম? বাড়িতে বিধবা মেয়েরওই রকম অনাচার ভগবান সহ্যি করেন? জলজ্যান্ত ভাইটা ধড়ফড় করে মরল চোখের সামনে!এখনও চন্দ্র-সূর্য আছেন—অনাচার ঢুকলে সে সংসারে মঙ্গল হয় কখনও?

বীণা জলে নামিতে পারিল না—জলের ধারে কাঠের মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

উহারা বীণাকে দেখিতে পায় নাই—বীণা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া বাসন লইয়া চলিয়া আসিল—চোখের জল সামলাইতে পারিল না ফিরিবার সময়। পটলদা'র সঙ্গে কথা বলাঅনাচার! এ ছাড়া আর কি অনাচার সে করিয়াছে? ভগবান তো সব জানেন। তাহারই পাপেছোড়দা মরিতে বসিয়াছে—একথা যদি সত্য হয়—সে পিতল-কাঁসা-হাতে শপথ করিয়াবলিতেছে, আর কোনো দিন সে পটলদার মুখ দেখিবে না। ভগবান ছোড়দাকে বাঁচাইয়া দিন।

কিন্তু ভগবান তাহার অনুরোধ রাখিলেন না। বৈকাল পাঁচটার সময় বলাই মারা গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

বলাইয়ের দাহকার্য সম্পাদন করিয়া বিপিন রাত্রি দুপুরের পর বাড়ি আসিল। বাড়িসুদ্ধ সবাইচিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওপাড়া হইতে কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী আসিয়া অনেকক্ষণ হইতে বসিয়া ছিলেন, বিপিনের মাকে নানারকম বুঝাইতেছিলেন—তিনি বুঝিলেন, এ সময় সান্ত্বনাদেওয়া বৃথা, সুতরাং হুঁকা হাতে রোয়াকের এক পাশে গিয়া দাঁড়াইলেন।

বিপিন বলিল, কাকা, কখন এলেন? তামাক পেয়েছেন?

—আর বাবা তামাক! তামাক তো আছেই, এখন যে বিপদে পড়ে গেলে তা থেকেসামলে উঠলেই বাঁচি। বউদিদিকে বোঝাচ্ছি সেই সন্দে থেকে, উনি মা, ওঁর কষ্ট তো চোখেদেখা যায় না—এসো বাবা–পরে বিপিনের চোখে জল পড়িতে দেখিয়া বলিলেন— আহা-হাতুমি অধৈর্য হলে চলবে কেন বাবা? এদের এখন তোমাকেই ঠাণ্ডা করতে হবে—বোঝাতেহবে বউদিদি, বউমা, বীণা—তোমাকে দেখে ওরা বুক বাঁধবে—তোমার চোখের জল পড়লে কিচলে?...

এমন সময় আরও দু-পাঁচজন প্রতিবেশী আসিয়া উঠানে দাঁড়াইলেন। একজন ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিনের মাকে বোঝাইতে গেলেন, একজন বিপিনের হাত ধরিয়া পাশের ঘরে লইয়াগিয়া বসাইলেন।

—রাত অনেক হয়েছে, শুয়ে পড়ো সব। সকলেরই শরীর খারাপ, কেঁদেকেটে আর কিহবে বলো বাবা, যা হবার তা হয়ে গেল। সবই তার খেলা, দুনিয়াটাই এইরকম বাবা—আজআমার, কাল আর একজনের পালা—শুয়ে পড়ো—

কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী রাত্রি এখানেই কাটাইবেন। ইহারা একা থাকিবে তাহা হয় না। আজরাত্রে অন্তত বাড়িতে অন্য কেহ থাকা খুব দরকার। বিপিন সারারাত্রি ঘুমাইতে পারিল না, কৃষ্ণলালের সঙ্গে কথাবার্তায় রাত কাটিয়া গেল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন—তুমি ক'দিনের ছুটি নিয়ে এসেছ বাবাজি?

—আজ্ঞে ছুটি তো নয়, রাণাঘাট কোর্টে এসেছিলাম কাজে—সেখান থেকে বাড়ি এলামএকদিনের জন্যে। তারপর তো বলাইয়ের অসুখ ক্রমেই বেড়ে উঠল, আর যাই কি করে—আটকে পড়লাম। তবে জমিদারবাবুকে চিঠি লিখে সব জানিয়েছি—এ কথাও লিখে দেবকাল। এখন ধরুন এদের ফেলে হঠাৎ কি করে বাড়ি থেকে যাই? মায়ের ওই অবস্থা, আমিকাছে থাকলেও একটা সান্ত্বনা, তারপর ছোঁড়াটার শ্রাদ্ধশান্তির একটা ব্যবস্থাও আমি না থাকলে কি করে হয় বলুন?

শ্রাদ্ধশান্তি আর কি, তিলকাঞ্চন করে দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ খাইয়ে দাও-এ তো জাঁকিয়েশ্রাদ্ধ করার কিছু নেই, কোনোরকমে শুদ্ধ হওয়া।

সকালের দিকে মা চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন দেখিয়া বিপিন বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। গ্রামের মধ্যে কাহারও বাড়িতে যাইতে ভাল লাগে না—সকলে সহানুভূতি দেখাইবে, 'আহা উহু' করিবে—বর্তমান অবস্থায় বিপিনের তাহা অসহ্য মনে হইতে লাগিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া সে আইনদ্দির বাড়িতে গেল, পাশের গ্রামে। আইনদ্দির বয়স একশত বছরহইলেও (অন্তত সে বলে) বসিয়া থাকিবার পাত্র সে নয়। বাড়ির উঠানে একটা আমড়াগাছেরছায়ায় বসিয়া বৃদ্ধ জালের সুতা পাকাইতেছিল।

—বাবাঠাকুর সকালে কি মনে করে? বোসোতামাক খাবা? সাজি দাঁড়াও। আইনদ্দিরসঙ্গেই তামাক খাইবার সরঞ্জাম মজুত। সে চকমকি ঠুকিয়া সোলা ধরাইয়া হাতে করিয়া সোলারটুকরাটি কয়েকবার দোলাইয়া লইয়া কলিকায় কাঠকয়লার উপর চাপিয়া ধরিল।

বিপিন বলিল—চাচা, দেশলাই বুঝি কখনও জ্বালো না?

—ও সব আজকাল উঠেছে বাবাঠাকুর—ও সব তোমাদের মতো ছেলেছোকরারা কেনে। সোলা-চকমকির মতো জিনিস আর আছে? আপনি ভাল হয়ে বোসো। সেকালের দু-একটা গল্পকরি শোনো। ওই যে দ্যাখচো অশথ গাছ, ওর পাশের জমিটার নাম ছেল ফাঁসিতলার মাঠ।নীলকুঠীর আমলে ওখানে লোকের ফাঁসি হোত। আমার জ্ঞানে আমি ফাঁসি হতে দেখেছি। তুমিআজ বলচ দিশলায়ের কথা—দিশলাই ছেল কোথায় তখন? তুষের আর ঘুঁটের আগুন মাগীন্‌রামালসায় পুরে রেখে দিত ঘরে—আর প্যাঁকাটির মুখে গন্ধক মাখিয়ে এক আঁটি করে রেখে দিতমালসার পাশে। এই ছেল সেকালের দিশলাই বাবাঠাকুর—তবে তামাক খাতি সোলা চকমকির রেওয়াজ ছেল। চাঁদমারির বিলি সোলার জঙ্গল—এক বোঝা তুলে এনে শুকিয়ে রাখো, ভোর বছর তামাক খাও। একটা পয়সা খরচ নেই। আর এখন? একটা দিশলাই এক পয়সা, একটাদিশলাই দেড় পয়সা—হুঁ—

কথা শেষ করিয়া অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে আইনদ্দি একবার চারিদিকে চাহিয়া লইয়া জোরেজোরে তামাক টানিতে লাগিল।

বিপিন বলিল—আচ্ছা চাচা, তুমি তো অনেক মন্তরতন্তর জানো—মানুষ মলে তাকেএনে দেখাতে পারো?

আইনদ্দি বিপিনের হাতে কলিকা দিয়া বলিল—ধরো, একটা সোলা ফুটো করে তোমায়হুঁকো বানিয়ে দিই। মন্তরতন্তর অনেক জানি বাবাঠাকুর তোমার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে। শূন্যভরে উড়ে যাব, আগুন খাব, কাটামুণ্ডুজোড়া দেব—

বিপিন এই কথা অন্তত ত্রিশবার শুনিয়াছে বৃদ্ধের মুখে।

—কিন্তু মরা মানুষ আনতে পারো চাচা?

—মলে কি মানুষ ফেরে বাবাঠাকুর? আশমানে তারা হয়ে ফুটে থাকে—নয়তো শেয়ালকুকুর হয়ে জন্মায়। তবে একটা গল্প বলি শোনো—

ইহার পর আইনদ্দি একটা খুব বড় আজগুবি গল্প দিল—কিন্তু বিপিনের সেদিকে মনছিল না—সে আইনদ্দির বাড়ির উত্তরে সুবিস্তৃত বেল্‌তার মাঠ ও চাঁদমারির বিলের ধারেরসবুজ পাতি ঘাসের বনের দিকে চাহিয়া অন্যমনস্ক হইয়া গেল। যখনই এখানটিতে আসিয়াবসে, তখনই তাহার মনে কেমন অদ্ভুত ধরনের সব ভাব আসিয়া জোটে।

বলাই চলিয়া গেল...কতদূরে, কোথায় কে জানে? সে-ও একদিন যাবে, বীণাও যাইবে, মনোরমাও যাইবে...মানী...মানীও যাইবে।

কেন খাটিয়া মরা? কেন দুমুঠা অন্নের জন্য অনর্থক লোকপীড়ন করিয়া অভিশাপকুড়ানো? আজ গেল বলাই...কাল তাহার পালা।

একটা জিনিস তাহার মনে হইতেছে। মানী তাহার মাথায় ঢুকাইয়া দিয়াছিল...মানীর নিকট এজন্য সে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে।

বলাই বিনা চিকিৎসায় মারা গেল। গরিব লোক এমনি কত আছে এই সব পাড়াগাঁয়ে—যাহারা অর্থের অভাবে রোগের চিকিৎসা করাইতে পারে না। সে ডাক্তারি বই পড়িয়া কিছুশিখিয়াছে, বাকিটা না হয় মানীকে বলিয়া, তাহার দেওর বীজপুরে ডাক্তারি করে, তাহার অধীনেকিছুদিন থাকিয়া শিখিয়া লইবে। ডাক্তারিই সে করিবে—প্রজাপীড়ন কার্য তাহার দ্বারা আর চলিবে না।

তাহার বাপ বিনোদ চাটুজ্জে প্রজাপীড়ন করিয়া যথেষ্ট জমিজমা করিয়াছিলেন— যথেষ্টপসার প্রতিপত্তি, যথেষ্ট খাতির। আজ সে সব কোথায় গেল? বিনোদ চাটুজ্জে আজ মাত্রসতেরো-আঠারো বছর মারা গিয়াছেন—ইহার মধ্যেই তাহার পুত্রবধূ খাইতে পায় না—পুত্র বিনা চিকিৎসায় মারা যায়—বিধবা কন্যার সম্বন্ধে গ্রামে নানা বদনাম ওঠে। অসৎ উপায়েউপার্জনের পয়সাই বা আজ কোথায়—কোথায় বা জমিজমা !

মানী তাহার চক্ষু ফুটাইয়া দিয়াছে নানা দিক দিয়া।

জীবনে মানীকে সে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিতে চায় বহুবার, বহুবার।সারাজীবন ধরিয়া।

বিপিন উঠিল। আইনদ্দি বলিল—কি নিয়ে যাবা হাতে করে বাবাঠাকুর? দুটো মুরগীর আন্ডা নিয়ে যাবা? না, তোমরা বুঝি ও খাও না! তবে দুটো শাকের ডাঁটা নিয়ে যাও। ভালশাকের ডাঁটা হয়েল বাবাঠাকুর, সুমুন্দিদের গরুর জন্য বাড়তি পারল না। ও মাখন—হ্যাদে ওমাখন—

বিপিন প্রভাতের রৌদ্রদীপ্ত সুবিস্তীর্ণ বেল্‌তার মাঠের দিকে চাহিয়া ছিল। চমৎকার জীবন।এই রকম বাঁশতলার ছায়ায়...এই রকম সকালের বাতাসে বসিয়া চুপ করিয়া মানীর কথা ভাবা...

কিন্তু ইহা জীবন নয়। ইহা পুরুষমানুষের জীবন নয়। বিনোদ ঁচাটুজ্জে পুরুষমানুষ ছিলেন—তিনি পৌরুষদীপ্ত জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন—হৈ-হৈ, হল্লা, কঠিন কাজ, মামলা মোকদ্দমা, জমিদারি শাসন, দাঙ্গাহাঙ্গামা—বিপিন জানে সে এই সব কাজের উপযুক্ত নয়। সেশাসন করিতে পারে না তাহা নয়—সে দুর্বল বা ভীরু নয়—কিন্তু তাহার ধাতে সহ্য হয় না ওসব। বিশেষতমানীর সংস্পর্শে আসিয়া সে আরও ভাল করিয়া এসব বুঝিয়াছে। জীবনে অনেক ভাল জিনিস আছে—ভাল বই, ভাল গান, ভাল কথা-খাওয়া-দাওয়ার কথা, মামলামোকদ্দমা বা পরচর্চা ছাড়াও আরও ভাল কথা জগতে আছে, মানী তাহাকে দেখাইয়াছে।

জমিদারি শাসন ছাড়াও পুরুষমানুষের জীবন আছে—রোগের সঙ্গে, মৃত্যুর সঙ্গে, নিজের দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া বড় হইতে চেষ্টা পাওয়াও পুরুষমানুষের কাজ। একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেই সে।

২

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে।

এই তিন মাসের মধ্যে অনেক কিছু ঘটিয়া গেল। বিপিনকে বলাইয়ের শ্রাদ্ধ পর্যন্ত বাড়ি থাকিতে হইল। বীণার ব্যাপার একটু আশঙ্কাজনক বলিয়া মনে হইল বিপিনের কাছে। মনোরমাপ্রায়ই বলে, দুজনে গোপনে দেখাশোনা এখনও করে—মনোরমা স্বচক্ষে দেখিয়াছে। বীণাকে বিপিন এজন্য তিরস্কার করিয়াছে, কড়া কথা শোনাইয়াছে, বীণা কাঁদিয়া ফেলে ছেলেমানুষের মতো, বলে—ও সব মিছে কথা দাদা। আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি, আমিপটলদার সঙ্গে আর দেখাই করিনে।

কথার মধ্যে খানিকটা সত্য ছিল।

বলাইয়ের মৃত্যুর পর বীণার ধারণা হইল, পটলদা'র সঙ্গে গোপনে কথা বলিবার এলোভ ভাল নয়, এ সব অনাচার, বিধবা মানুষের করা উচিত নয় যাহা, তাহা সে করিতেছেবলিয়াই আজ ভাইটা মরিয়া গেল।

বলাই মারা যাওয়ার ছ'দিন পরে পটল একদিন তাহাদের বাড়িতে আসিল। বীণার মাবাহিরের রোয়াকে বসিয়া তাহার সহিত কথাবার্তা কহিতেছিল—বলাইয়ের মৃত্যু সংক্রান্ত কথাই বেশি।বীণা লক্ষ্য করিল কথা বলিতে বলিতে পটলদা জানালার দিকে আগ্রহ-দৃষ্টিতেচাহিতেছে। অন্য অন্য বার এতক্ষণ বীণা মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়ায়,পটলের সঙ্গে কথা শুরুকরে—কিন্তু আজ সে ইচ্ছা করিয়াই যায় নাই। আর কখনও সে পটলদার

সামনে বাহির হইবেনা। বেড়াইতে আসিয়াছ, ভালই; মায়ের সঙ্গে গল্পগুজব করো, চলিয়া যাও—আমার সঙ্গেতোমার কি? বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে তোমার কি?

প্রায় এক ঘণ্টা থাকিয়া পটল যেন নিরাশ মনে চলিয়া গেল। পটল যেমন বাড়ির বাহিরহইল—বীণার তখন মনে পড়িল ছাদের উপর ওবেলা বউদিদির রাঙাপাড় শাড়িটা রৌদ্রেদেওয়া হইয়াছিল—তুলিয়া আনা হয় নাই। ছাদে উঠিয়া কাপড় তুলিতে তুলিতে সে নিজেরঅজ্ঞাতসারে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। ওই তো পটলদা চলিয়া যাইতেছে... তেঁতুল গাছটারকাছে গিয়াছে...সে ছাদের উপরে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আছে...যদি পটলদা হঠাৎফিরিয়া চায়? পটলদাকে একটা পান সাজিয়া দিলে ভাল হইত—দেওয়া উচিত ছিল, মা যেনকি! লোক বাড়িতে আসিলে তাহাকে শুধু-মুখে বিদায় করিতে নাই। ইহা ভদ্রতা। তাহাকে ডাকিয়া পান সাজিয়া দিতে বলিলেই সে পান দিত।

কাপড় তুলিয়া বীণা নামিয়া আসিল। তাহার মন খুব হালকা—ভালই হইয়াছে, আজ সেবুঝিয়াছে—পটলের সঙ্গে দেখা না-করা এমন কঠিন কাজ নয়, ইচ্ছা করিলেই হয়। একটা কঠিনকর্তব্য সে সম্পন্ন করিয়াছে।

বলাইয়ের শ্রাদ্ধ মিটিয়া গেলে পটল আর একদিন আসিল। বীণা উঠান ঝাঁট দিতেছিল, মুখ তুলিয়া সে আসিতেছে দেখিয়াই সে হাতের ঝাঁটা ফেলিয়া ছুটিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিল। তাহারবুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়িতেছে। মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়াই মনে হইল, ছিঃ, অমন করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া আসা উচিত হয় নাই!—পটলদা কি দেখিতে পাইয়াছে ? বোধহয় পায় নাই, কারণ তখনও সে তেঁতুলতলার মোড়ে; তেঁতুলগাছের গুড়িটার আড়ালে। যাহাহউক, পটলদা তো বাঘ নয়, ভালুকও নয়—অমনভাবে ছুটিয়া পলাইবার মানে হয় না।সহজভাবে মায়ের সামনে গিয়া কথা বলাই তো ভাল। ব্যাপারটাকে সহজ করিয়া তোলাই ভাল।

কিন্তু বীণা একদিনও বাহিরে আসিল না—এমন কি যখন পটল জল খাইতে চাহিল—বীণার মা বলিলেন, ওমা বীণা, তোর পটলদাদাকে এক গেলাস জল দিয়ে যা—বীণা নিজে না গিয়া বিপিনের বড়ছেলে টুনুর হাতে দিয়া জলের গ্লাস পাঠাইয়া দিল।

তাহার হাসি পাইতেছিল। মনে মনে ভাবিল—সব দুষ্টুমি পটলদার! জলতেষ্টা না ছাইপেয়েছে। আমি আর বুঝিনে ও সব যেন!

সে যাইবে না, কখনও যাইবে না। জীবনে আর কখনও পটলদার সঙ্গে দেখা করিবে না। শেষ, সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

ইহার পাঁচ-ছ'দিন পরে বীণা একদিন সন্ধ্যার সময় ছাদে শুকাইতে দেওয়া মুসুরির ডাল তুলিতে গিয়াছে—ছাদের আলিসার কাছে আসিতেই দেখিতে পাইল, পটলদা নীচে বাগানেরকাঁঠালতলায় দাঁড়াইয়া ওপরের দিকে চাহিয়া আছে।

বীণার সমস্ত শরীর দিয়া যেন কি একটা বহিয়া গেল! হঠাৎ পটলদাকে এ ভাবে দেখিবে তাহা সে ভাবে নাই। কিন্তু আজ কয়দিন বীণা দুপুরে ও বিকালের দিকে নির্জনে থাকিলেই ভাবিয়াছে পটলদার কথা। অন্য কিছু নয়, সে শুধু ভাবিয়াছে এই কথা—আচ্ছা এই যে দু'দিন সে পটলদার সঙ্গে ইচ্ছা করিয়াই দেখা করিল না, পটলদা কি ভাবে লইয়াছে জিনিসটা? খুব চটিয়াছে কি? কিংবা হয়তো তাহার কথা লইয়া পটলদা আর মাথা ঘামায় না। তাহাকে মনহইতে দূর করিয়া দিয়াছে। দিয়া যদি থাকে, খুব বুদ্ধিমানের মতো কাজ করিয়াছে। পটলদা কষ্টপায়, তাহা বীণা চায় না। ভুলিয়া যাক্, সেই ভাল। মনে রাখিয়া যখন কষ্ট পাওয়া, ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।

দুপুরে এ কথা ভাবিয়া বীণা দেখিয়াছে বেলা যত পড়ে সেই কথাই মনের মধ্যে কেমনএকটা—ঠিক বেদনা বা কষ্ট বলা হয়তো চলিবে না—কিন্তু কেমন একটা কি হয় ঠিক বলিয়াবোঝানো কঠিন—কি বলিয়া বুঝাইবে সে ভাবটা?...যাহোক, যখন সেটা হয়, বিশেষত সন্ধ্যারদিকে, যখন বড় তেঁতুল গাছটায় কালো কালো বাদুড়ের দল ঝাঁক বাঁধিয়া ফেরে, সন্তুদেরনারকেল গাছটার মাথায় একটা নক্ষত্র ওঠে, বউদি সাঁজালের মালসা হাতে

গোয়ালঘরে সাঁজাল দিতে ঢোকে, একটু পরে ঘুঁটের ধোঁয়ায় উঠানের পাতিলেবুতলাটা অন্ধকার হইয়া যায়—তখনছাদের ওপর একা দাঁড়াইয়া বাঁশঝাড়ের মাথার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বীণার যেন কান্না আসে...কোথাও কিছু যেন নাই—কোথাও কিছু নাই...

এ ভাবটা সে বেশিক্ষণ মনে থাকিতে দেয় না—তখনি তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নীচেনামিয়া আসে। নিজের কান্নাতে নিজে লজ্জিত হয়, ভীত হয়।

অথচ কাহাকেও কিছু বলিবার উপায় নাই। কাহারও নিকট একটু সান্ত্বনা পাইবার উপায় নাই। মা নয়, বউদিদি নয়—কাহারও কাছে কিছু বলা চলিবে না, বীণা বোঝে। এ তার নিজস্বকষ্ট, অত্যন্ত গোপন জিনিস—গোপনেই সহ্য করিতে হইবে।

হঠাৎ এ সময় পটলদাকে এ ভাবে দেখিয়া বীণা যেন কেমন হইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়াকথা বাহির হইল না। পটল গাছের গুড়িটার দিকে আর একটু হটিয়া গেল। বীণার দিকে চাহিয়াএকটু হাসিয়া বলিল—বীণা, আমার ওপর তোমার রাগ কিসের?

বীণা এবার কথা খুঁজিয়া পাইল। বলিল—রাগ কে বল্লে?

—দু'দিন তোমাদের বাড়ি গেলাম, বাইরে এলে না, দেখা করলে না—রাগ নয় তো কি?

—রাগ নয়, এমনি। কাজে ব্যস্ত ছিলাম।

—মিথ্যে কথা। কাজে ব্যস্ত থাকলেও একটু বাইরে আসা যায় না কি? না, সত্যি বলোলক্ষ্মীটি, আমি কি দোষ করেছি?

—তুমি পাগল নাকি পটলদা? আচ্ছা, সন্ধ্যাবেলায় এখানে এসেছ আবার, লোকে দেখলেকি মনে করবে—তোমায় একদিন বারণ করে দিইছি মনে নেই! যাও বাড়ি যাও—

বীণা কথাটা বলিল বটে কিন্তু তাহার মনের মধ্যে হঠাৎ একটা অদ্ভুত ধরনের আনন্দ আসিয়া জুটিয়াছে—সন্ধ্যার অন্ধকার অদ্ভুত হইয়া উঠিয়াছে, জোনাকী-জ্বলা অন্ধকার, সাঁজালের ঘুঁটের চোখ-জ্বালা-করা ধোঁয়ায় ঘনীভূত অন্ধকার।...

তাকে কেহ চায় নাই জীবনে এমন করিয়া—সে কথা কহে নাই বলিয়া ছুটিয়াআশসেওড়া বিছুটিবনের আগাছায় জঙ্গলের মধ্যে, সাপে খায় কি ব্যাঙে খায়, সন্ধ্যার অন্ধকারেভূতের মতো দাঁড়াইয়া থাকে নাই কখনও—কাঙালের মতো, একটুখানি মিষ্ট কথার প্রত্যাশীহইয়া—বিশেষ করিয়া যখন সে তাচ্ছিল্য দেখাইয়াছে, সামনে বাহির হয় নাই, কথা কয়নাই—তাহার পরেও,—এক পটলদা ছাড়া।

পটল মিনতির সুরে বলিল—কেন এমন করে তাড়িয়ে দেবে, বীণা? আমি কি করেছিবলো—

—তুমি কিছু করোনি। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কথাবার্তা আর চলবে না—

—কেন চলবে না বীণা?

—কেউ পছন্দ করে না।

—কেউ মানে কে কে, শুনতে পাব না?

—না, তা শুনে কি হবে? ধরো আমার বাড়ির লোক। আমি তো স্বাধীন নই—তারা যদিবারণ করেন, অসন্তুষ্ট হন, আমার তা করা উচিত নয়।

—তুমি আমায় ভালবাসো না?

বীণা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

—আমার কথার উত্তর দাও, বীণা!

—আচ্ছা পটলদা, ও কথার উত্তর শুনে লাভই বা কি? আমার আর তোমার সঙ্গে দেখাকরা চলবে না। তুমি কিছু মনে কোরো না পটলদা, এখন বাড়ি যাও, লোকে কি মনে করবেবলো তো! সন্ধেবেলা এখানে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলছ দেখলে বউদি এখুনি ছাদের ওপর আসবে, তুমি যাও এখন।

—আচ্ছা এখন যাচ্ছি, কাল আসব?

—না।

—পরশু আসব?

—না।

—কবে আসব, আচ্ছা তুমিই বল বীণা!

—কোনোদিন না। কেন আমায় এসব কথা বলাচ্ছ পটলদা? আমি এক কথার মানুষ—যাবলেছি তা বলেছি, এখন যাও।

—তাড়াবার জন্যে অত ব্যস্ত কেন বীণা, যাবই তো, থাকতে আসিনি। বেশ তাই যদিতোমার ইচ্ছে হয় তবে চল্লাম—এ-ও বলে রাখছি, জীবনে আর কখনও আমায় দেখতে পাবেনা।

—না পাই না পাব, তা আর কি হবে? না পটলদা, আর বকিও না, কথায় কথা বাড়ে, আমি নীচে নেবে যাই, বউদিদি কি মনে করবে—কতক্ষণ ছাদের ওপর এসেছি!

পটল আর কোনো কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু বীণা যেমন সিঁড়ির মুখে নামিতেযাইবে দেখিল অন্ধকারের মধ্যে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছে। বউদিদির ভাব দেখিয়া বীণার মনেহইল সে বেশিক্ষণ আসে নাই—এবং সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া তাহাদের শেষ কথা শুনিয়াছে।

আসলে মনোরমা কিছুই শুনিতে পায় নাই—কিন্তু ছাদে উঠিবার সময় বীণা কাহার সঙ্গেসন্ধ্যাবেলা কথা কহিতেছে জানিবার জন্য সিঁড়ির মুখে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া ছিল। এবং অল্প কিছুক্ষণ দাঁড়াইবার পরেই বীণা কথা বন্ধ করিয়া তাহার সঙ্গে ধাক্কা খাইল।

মনোরমা বলিল—কার সঙ্গে কথা বলছিলে ঠাকুরঝি ?

বীণা ঝাঁজের সঙ্গে বলিল—জানিনে—সরো—রাস্তা দাও—উঠে এসে দাঁড়িয়ে তো আছদিব্যি অন্ধকারে! বাবারে, সবাই মিলে খাও আমাকে খেয়ে ফেল—বলিয়া সে তরতর করিয়া নামিয়া গিয়া মায়ের ঘরে একখানা ছেঁড়া মাদুর এককোণে পাতিয়া সোজাসুজি শুইয়া পড়িল।

মনোরমা মনে মনে বড় অস্বস্তি বোধ করিল। বীণা আবার গোপনে পটলের সঙ্গেদেখাশুনা করিতেছে তাহা হইলে! নিশ্চয়ই পটল ও—আর কাহার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ছাদ হইতে চাপাসুরে কথাবার্তা বলিবে সে! ঠাকুরঝির রাগের কারণই বা কি আছে তাহা সে বুঝিয়া পাইলনা।সে আড়ি পাতিয়া কাহারো কথা শুনিতে যায় নাই সিঁড়ির ঘরে। কি কথা হইতেছিল, কাহার সহিত কথা হইতেছিল তাহাও সে জানে না—তবে আন্দাজ করিয়াছিল বটে। দুশ্চিন্তায় মনোরমার রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। ঠাকুরঝি দিনকতক পটলের সামনে বাহির হইত না, তাহাতে মনোরমা খুব খুশি হইয়াছিল মনে মনে। কিন্তু এত বলার পরেও আবার যখন শুরু করিল, তাও আবার লুকাইয়া, তখন ফল ভাল হইবে না।

কি করা যায়, কি করিয়া সংসারে শান্তি আনা যায়? তাহাদের বাড়িটাকে যেন অলক্ষ্মীতেপাইয়া বসিয়াছ। দারিদ্র্য, রোগ, মৃত্যু...অনাচার...কুৎসা কলঙ্ক...বীণা ঠাকুরঝি যে রাগ করে, নতুবা কাল দুপুরবেলা রান্নাঘরে বসিয়া সে বেশ করিয়া বুঝাইয়া সুঝাইয়া বলিতে পারে। বলিতেপারে যে, এসব ব্যাপারের ফল কখনও ভাল হয় না। পটল বিবাহিত লোক, তাহার স্ত্রী-পুত্রবর্তমান—বীণাকে লইয়া নাচানো ছাড়া তাহার আর কি ভাল উদ্দেশ্য

থাকিতে পারে? সমাজে থাকিতে হইলে সমাজ মানিয়া চলিতে হয়—বীণা বিধবা, বিশেষত ছেলেমানুষ, অনেক বুঝিয়া তাহাকে এখন সংসারে চলিতে হইবে।...কিন্তু বীণা শুনিবে কি তাহার হিতোপদেশ ?

৪

ইহার পর পটল আর একদিন আসিল। অমনি সন্ধ্যাবেলা, অমন ভাবে লুকাইয়া। কিন্তু একদিনবীণা গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিল, ছাদে যাইবার প্রয়োজন ছিল না বলিয়া যায় নাই। ছাদে গিয়াছিলমনোরমা। সিঁড়ির মুখে নামিবার সময় দেখিতে পাইল পটল কাঁটালতলায় দাঁড়াইয়া আছে।তাহাকে দেখিয়াই পটল গুঁড়ির আড়ালে সরিয়া যাইবার উপক্রম করিল, একটু থতমত খাইয়া গেল—তাহাকেই বীণা বলিয়া ভুল করিয়াছিল সন্ধ্যার অন্ধকারে নাকি? মনোরমার হাসিওপাইল। ভাবিলপোড়ারমুখো ড্যাকরার কাণ্ড দ্যাখো! জঙ্গলের মধ্যে এই ভর-সন্ধেবেলা দাঁড়িয়ে মরছেন মশার কামড় খেয়ে! খ্যাংরা মারো মুখে! বীণাকে সে কিছুই বলিল না নীচেনামিয়া। তাহাকে চোখে চোখে রাখিল, বীণা চুপি চুপি ছাদে যায় কিনা। ওদের মধ্যে নিশ্চয় পূর্বহইতে বলা-কওয়া ছিল।

রাত্রে শুইবার সময় সে কৌশল করিয়া বীণাকে কথাটা বলিল।

—আজ হয়েছে কি জানো ঠাকুরঝি, ওপরে তো ছাদে গিয়েছি সন্ধের সময়—দেখি কেএকজন কাঁটালতলায় দাঁড়িয়ে—ভাল করে চেয়ে দেখি—

বীণার মুখ শুকাইয়া গেল। বলিল—পটলদা?

মনোরমা খিলখিল করিয়া হাসিয়া ফেলিল। হাসির ধমকে কথা উচ্চারণ করিতে না পারিয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "পটলই বটে।"

—আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি বউদি, আমি কিছুই জানিনে।

বীণা কিন্তু একথা বলিতে পারিল না যে সে পটলদাকে সেদিনই আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছে। সেকথা তাহার আর পটলদার মধ্যে গুপ্ত থাকিবে—বাহিরের লোককে তাহা জানাইলে পটলদার অপমান হইবে। লোকের সামনে পটলদাকে সে ছোট করিতে চায় না। তাহার মনতাহাতে সায় দেয় না।

কিন্তু আশ্চর্য, এত বলার পরও পটলদা আবার আসিয়াছিল! রাত্রে শুইয়া শুইয়া কতবার পটলের উপর রাগ করিবার...দারুণ রাগ করিবার চেষ্টা করিল। ভারি অন্যায় পটলদা'র, যখনসে বারণ করিয়া দিয়াছে, তখন কেন আবার দেখা করিবার চেষ্টা পাওয়া? ছিঃ ছিঃ, বউদিদি নাদেখিয়া যদি অন্য লোক দেখিত ? পটলদা লোক ভাল নয়—ভাল লোক নয়, খারাপ চরিত্রের লোক। ভাল চরিত্রের লোক যারা তারা এমন করে না।

আচ্ছা একটা কথা—তাহারই সঙ্গে বা পটলদা দেখা করিবার অত আগ্রহ কেন দেখায় ? আরও তো কত মেয়ে আছে। এই অন্ধকারে...আগাছার জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়াইয়া সত্যি যদিসাপে কামড়াইত? কথাটা মনে করিবার সঙ্গে সঙ্গে পটলের উপর এক প্রকার অদ্ভুত ধরনের সহানুভূতি আসিয়া জুটিল বীণার মনে। মাগো, পটলদাকে সাপে কামড়াইত! না, ভাবিতেও কষ্ট হয়। তাহারই জন্য পটলদাকে সাপে কামড়াইত তো? আর কেহ তো তাহার জন্য ভাবে না, তাহার মুখের কথা শুনিবার অত আগ্রহ দেখায় না, সংসারে কে তাহার জন্য ভাবিয়া মরিতেছে? কোন্ আলো আছে তাহার জীবনে?...

এই শূন্য, অন্ধকার জীবনের মধ্যে তবুও পটলদা তাহার সঙ্গে একটু কথা কহিবার ব্যাকুল আগ্রহে রাত্রি, অন্ধকার, সাপের ভয়, মশার কামড়, লোকনিন্দা আগ্রাহ্য করিয়া চোরের মতো দাঁড়াইয়া থাকে ভাঙা কোঠার

পাত্রে জঙ্গলের মধ্যে—যেখানে বিছুটি জঙ্গল এমন ঘন যে দিনমানেই যাওয়া যায় না! তাও দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বৃথা ফিরিয়া গেল চোখের দেখাও তোতাহাকে দেখিতে পায় নাই !

নিজের স্বামীকে বীণা মনে করিতে পারে—খুব সামান্য, অস্পষ্ট ভাবে। এগারো বৎসরবয়সে বীণার বিবাহ হয়। এক বৎসর পরে বাপের বাড়ি থাকিতেই একদিন সে শুনিল স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। মনে আছে, বেশ ছেলেটি। খুব অল্পদিন দেখাশোনা হইয়াছিল। কোথায় স্কুলে পড়িত, শ্বশুর-শাশুড়ি তাহাকে বাড়ি বেশিদিন থাকিতে দিতেন না—স্কুল-বোর্ডিং-এ পাঠাইয়া দিতেন।

সে-সব আজকার কথা নয়—বীণার বয়স এখন তেইশ-চব্বিশ—বারো বছর আগের কথা, স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে।

হঠাৎ বীণা দেখিল সে কাঁদিতেছে—হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে, বালিশের একটা ধার একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে চোখের জলে।

৫

দেনা জড়াইয়া গিয়াছে একরাশ। কোনো দোকানে আর ধার পাইবার জো নাই।

কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী সংসারের বন্ধু, দুবেলাই যাতায়াত করেন, খোঁজখবর যা লইবারতিনিই লইয়া থাকেন, অন্যলোকে বড় একটা ইহাদের লইয়া মাথা ঘামায় না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা রোয়াকে বসিয়া কথাবার্তা কহিতে কহিতে কৃষ্ণলাল বলিলেন, পলাশপুর যাবার তোমার আর দেরি কিসের হে বিপিন ? বেরিয়ে পড়ো, চলে যাও এবার।তোমার দোষ, একবার বাড়ি এসে চেপে বসলে তুমি নড়তে চাও না!

—আপনার কাছে আর লুকোব না কাকা, চাকুরি গিয়েছে আজ মাসখানেক হল, অনাদিবাবু চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যদি আমি এক হপ্তার মধ্যে না ফিরি, তিনি অন্য লোক রাখতে বাধ্য হবেন। সে চিঠির উত্তর দিইনি।

—চিঠির উত্তর দাওনি? না খেতে পেয়ে কষ্ট পাচ্চ সে ভাল খুব, না? তোমার উপায় যেকি হবে আমি কিছু বুঝিনে বাপু! না, শোনো, আমার মনে হয় তোমার চাকুরি এখনও যায়নি।নতুন লোক খুঁজে পাওয়া শক্তও বটে, আর বিশ্বাস যাকে-তাকে করাও যায় না বটে। তুমি যাও, কাল সকালেই দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়ো।

—বেরিয়ে পড়ব কাকা, তবে সেদিকে নয়। আমি ডাক্তারি করব ভেবে রেখেচি অনেকদিন। ওই সোনাতনপুর, কামার গাঁ, পিপলিপাড়া এ সব অঞ্চলে ডাক্তার নেই। কে যাবে ওসবঅজ পাড়াগাঁয়ে মরতে? আমি সোনাতনপুরে বসব ভেবেচি। সোনাতনপুরের রামনিধি দত্ত ওখানকার মধ্যে একজন বিশিষ্ট লোক, সেখানে গিয়ে বাবার পরিচয় দিয়ে ওই গাঁয়েই বসব।দেখি কি হয়। জমিদারি শাসন আর প্রজা ঠ্যাঙানো, ও আর করচিনে কাকা। বলাই মারাযাওয়ার পর আমি বুঝতে পেরেছি, ও কাজে সুখ নেই। আর আমি ওপথে—

কৃষ্ণলাল অবাক হইয়া বলিলেন, ডাক্তারি করবে! ডাক্তারি শিখলে কোথায় তুমি যে ডাক্তারি করবে! যত বদখেয়াল কি তোমার মাথায় আসে!

—ডাক্তারি আমি করেচি এর আগেও। ধোপাখালির কাছারিতে বসে। আর শেখার কথাবলছেন, কেন, বই পড়ে বুঝি শেখা যায় না? জমিদারবাবুর মেয়ে আমাকে কতকগুলো ডাক্তারিবই দিয়েছিল, তাই পড়ে শিখেচি। সে-ই আমায় ডাক্তারি করতে পরামর্শ দেয়, কাকা। বলেছিল, তার এক দেওর বীজপুরে ডাক্তারি

করে, তার কাছে গিয়ে শেখার ব্যবস্থা করে দেবে—ও-ই বলেছিল। বেশ চমৎকার মেয়ে, মনটিও খুব ভাল, আমায় বলেছিল—

হঠাৎ বিপিন দেখিল মানীর কথা একবার আসিয়া পড়িয়াছে যখন, তখন ওর কথাইবলিবার ঝোঁক তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে। ডাক্তারির কথা গৌণ, মুখ্য কাজ মানীর সম্বন্ধে কথাবলা। কৃষ্ণকাকার সামনে!

বিপিন চুপ করিল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন, জমিদারবাবুর মেয়ে ? বিয়ে হয়েছে? তোমার সঙ্গে কি ভাবেআলাপ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিয়ে হয়েছে বৈকি। বাইশ-তেইশ বছর বয়েস। আমার সঙ্গে তো ছেলেবেলা থেকেই আলাপ ছিল কিনা! বাবার সঙ্গে ওদের বাড়ি ছেলেবেলায় যেতাম, তখনথেকেই আলাপ। একসঙ্গে খেলা করেছি। এখনও আমাকে যত্নআত্তি করে বড্ড, আর কিসেআমার ভাল হবে সর্বদা ওর সেদিকে—

বিপিনের গলার সুরে কৃষ্ণলাল একটু আশ্চর্য হইয়া উহার দিকে চাহিয়া ছিলেন, বিপিনআবার দেখিল সে মানীর সম্বন্ধে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলিয়া ফেলিতেছে। কি যেনঅদ্ভুত নেশা! মানীর সম্বন্ধে কতকাল কাহারও কাছে কোনো কথা বলে নাই। আজ যখন ঘটনাক্রমে তাহার কথা আসিয়া পড়িয়াছে, তখন আর থামিতে ইচ্ছা করে না কেন? অনবরততাহার কথা বলিতে ইচ্ছা করে কেন?

বিপিন আবার চুপ করিয়া রহিল।

কৃষ্ণলাল বলিলেন, তা বেশ। তোমার সঙ্গে এবার বুঝি দেখাশুনো হয়েছিল? শ্বশুরবাড়িথেকে এসেছিল বুঝি?

না, বিপিন আর কিছু বলিবে না। সে সামলাইয়া লইয়াছে নিজেকে। কৃষ্ণলালের প্রশ্নের উত্তরে সংক্ষেপে বলিল, হ্যাঁ। তাহার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করিতেছে, কেমন এক প্রকারের উত্তেজনা। মানীর কথা এতদিন কাহারও সহিত হয় নাই, অনেক জিনিস চাপা পড়িয়াছিল। হঠাৎ অনেক কথা, অনেক ছবি তাহার মনে পড়িয়া গেল মানীর সম্বন্ধে। কান দুটা যেন গরম হইয়া উঠিয়াছে লাল হইয়া উঠিয়াছে কি দেখিতে? কৃষ্ণলাল কি দেখিতে পাইতেছেন ?

৬

দিন পনেরো পরে।

রাত্রে একদিন মনোরমা বলিল, তোমায় তো কোনো কথা বললেই চটে যাও। কিন্তু আমার হয়েছে যত গোলমাল, ঝক্কি পোয়াচ্ছি আমি। তিন দিন কাঠা হাতে করে এর-ওর বাড়িথেকে চাল ধার করে আনি, তবে হাঁড়ি চড়ে। আমি মেয়েমানুষ, ক'দিন বা আমাকে লোকে দেয়? পাড়ায় আর ধার পাওয়া যাবে না, এবার বে-পাড়ায় বেরুতে হবে কাল থেকে। তা আরকি করি, কাল থেকে তাই করব! ছেলেগুলো উপোস করবে, মা উপোস করবেন, এ তো চোখেদেখতে পারব না!

মনোরমার কথাগুলি খুব ন্যায্য বলিয়াই বোধ হয় বিপিনের কাছে তিক্ত লাগে। সেঝাঁজের সহিত বলিল, তা এখন তোমাদের জন্যে চুরি করতে পারব না তো! না পোষায়, ভাইকে চিঠি লিখো, দিনকতক গিয়ে বাপের বাড়ি ঘুরে এসো। সোজা কথা আমার কাছে।

মনোরমা কাঁদিতে লাগিল।

নাঃ, বিপিনের আর সহ্য হয় না। কি যে সে করে! চাকুরি তাহার নিজের দোষে যায় নাই। বলাইয়ের অসুখ, বলাইয়ের মৃত্যু, বীণার ব্যাপার, নানা গোলযোগ। সে ইচ্ছা করিয়া চাকুরি ছাড়িয়া আসে নাই। অথচ স্ত্রী দেখিতেছে সবটাই তাহার দোষ।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। পল্লীগ্রামের লোক সকালে-সকালেই শুইয়া পড়ে। কোনো দিকে কোনো শব্দ নাই। উত্তরে দিকের ভাঙা জানলাটার ধারেই তক্তপোশখানা পাতা। বিপিন উঠিয়া দালান হইতে তামাক সাজিয়া আনিয়া তক্তপোশের উপর বসিয়া জানালা দিয়া বাহিরের দিকেচাহিয়া হুঁকা টানিতে লাগিল। জানালার বাহিরের কোঠার গায়ে লাগানো ছোট্ট তরকারিরক্ষেত, বলাই গত চৈত্র মাসে কুমড়া পুঁতিয়াছিল, কেন খুব বড় গাছ হইয়া অনেকখানি জায়গাজুড়িয়া লইয়াছে বাগানে। তরকারির ক্ষেতের পর তাহাদের কাঁঠাল গাছ, তারপর রাস্তা, রাস্তার ওপারে নবীন বাঁড়ুয্যের বাঁশঝাড় ও গোহাল। ঘন ঠাস্-বুনানি কালো অন্ধকার বাঁশঝাড়ের সর্বাঙ্গে অসংখ্য জোনাকি জ্বলিতেছে।

মনোরমার উপর তাহার সহানুভূতি হইল। বেচারি অবস্থাপন্ন গৃহস্থঘরের মেয়ে, তাহাদের বাড়িতে অনেক আশা করিয়াই উহার জ্যাঠামশাই বিবাহ দিয়াছিলেন। এখন খাইতেপায় না পেট ভরিয়া দু'বেলা। পাড়ায় কোথাও সে বাহির হয় না, সমবয়সী বউ-ঝিয়ের সঙ্গেকমই মেশে, কারণ গরিব বলিয়াও বটে এবং বীণার ব্যাপার লইয়াও বটে, নানা অপ্রীতিকর কথাশুনিতে হয় বলিয়া সে কোথাও বড় একটা যায় না। ঘরের কাজ লইয়াই থাকে।

বিপিন বলিল, কেঁদো না, বলি শোনো।

মনোরমা কথা কহিল না, আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিল। আধ-ময়লা শাড়ির আঁচলটা মাদুর হইতে খানিকটা মেঝের উপর লুটাইতেছে। সত্যই কষ্ট হয় দেখিলে।

—শোনো, আমি কাল কি পরশু বাড়ি থেকে যাই। পিপলিপাড়া গিয়ে ডাক্তারি করবভেবেছি। তুমি কি বলো? পিপলিপাড়া বেশ গাঁ, চাষিবাসী লোক অনেক। হয়তো কিছু কিছুপাব। তুমি কি বলো?

স্বামী তাহার মতামত চাহিতেছে, ইহা মনোরমার কাছে এক নূতন জিনিস বটে। সেএকটু আশ্চর্য হইল, খুশিও হইল। চোখের জল মুছিয়া বিপিনের দিকে চাহিয়া বলিল, তুমি ডাক্তারি জানো?

—জানিই তো। ধোপাখালি থাকতে রুগী দেখতাম।

—কোথা থেকে শিখলে ডাক্তারি?

—বই পেয়েছিলাম জমিদারবাড়ির ইয়ে মানে লাইব্রারি থেকে। বেশ বড় লাইব্রারি আছে কিনা ওঁদের বাড়ি।

মনোরমার পিতৃগৃহ গোয়াড়ি কৃষ্ণনগর। সে বলিল, লাইব্রারি আবার কি? লাইব্রেরি তোবলে! আমাদের পাড়ায় মস্ত লাইব্রেরি আছে গোয়াড়িতে। জেঠিমা বই আনাতেন, আমরাদুপুরবেলা পড়তাম।

—ওই হল, হল। তা আমি বলছিলাম কি, দিনকতকের জন্যে একবার ঘুরে এসো নাকেন সেখানে? আমি একটু সামলে নিই। যদি পিপলিপাড়ায় লেগে যায়, তবে পুজোর পরেইনিয়ে আসব এখন, কি বলো?

মনোরমা বলিল, সেখানে যাব কোন মুখ নিয়ে ? নিজের বাবা-মা থাকলে অন্য কথাছিল। জ্যাঠামশায় বিয়ের সময় যা দিয়েছিলেন, তুমি তা ঘুচিয়েছ। শুধু-গায়ে শুধু-হাতে তাদেরসেখানে গিয়ে দাঁড়াব যে, তারা হল বড়লোক, দুই জ্যাঠতুতো বোন ইস্কুল কলেজে পড়ে, বউদিদিরা বড়লোকের মেয়ে, তারা মুখে কিছু না বললেও মনে মনে হাসে। তার চেয়ে না খেয়েএখানে পচে মরি সেও ভাল।

যুক্তি অকাট্য। ইহার উপর বিপিন কিছু বলিতে পারিল না। বলিল, তা নয় মনোরমা, আমি ডাক্তারিতে বসলেই আজই যে হুড়হুড় করে টাকা ঘরে আসবে তা তো নয়। দু'দিন একটুআমায় নির্ভাবনায় থাকতে না দিলে আমি তোমাদের বেক্ষডাঙায় ফেলে রেখে গিয়ে কি সোয়াস্তি পাব? তাই বলছিলাম।

মনোরমা বলিল, তুমি এসো গিয়ে, আমাদের ভাবনা আমরা ভাবব।

—ঠিক? সে ভার নেবে তো?

—না নিয়ে উপায় কি বলো!

দিন চার পাঁচ পরে বিপিন ছোট্ট একটি টিনের সুটকেস্ হাতে করিয়া পিপলিপাড়া রামনিধি দত্ত মহাশয়ের বহির্বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা প্রায় বারোটা বাজে। সকালে বাড়িহইতে বাহির হইয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়াছে। পায়ে এক পা ধূলা, গায়ের কামিজটি ঘামেভিজিয়া গিয়াছে।

রামনিধি দত্তের বাড়ি দেখিয়া সে কিছু হতাশ হইল। ভাঙা পুরানো কোঠাবাড়ি, বহুকাল মেরামত হয় নাই, কার্নিসে স্থানে স্থানে বট-অশ্বত্থের চারা গজাইয়াছে। আর কি ভয়ানক জঙ্গল গ্রামটিতে! শুধু আমের বাগান আর ঘন নিবিড় বাঁশবন!

দত্ত মহাশয়কে পূর্বে সে একখানা চিঠি লিখিয়াছিল, তিনি বিপিনকে আসিতেও লিখিয়াছিলেন। তবুও নতুন অচেনা জায়গায় আসিয়া বিপিনের কেমন বাধো-বাধো ঠেকিতে লাগিল, বাহিরবাটীর চণ্ডীমণ্ডপে উঠিয়া সে সুটকেসটি নামাইয়া একখানা হাতল-ভাঙা চেয়ারেরউপর বসিয়া চারিদিকে একবার চাহিয়া দেখিল। চণ্ডীমণ্ডপটি সেকালের, দেখিলেই বোঝা যায়।নিম কাঠের বড় কড়ি হইতে একটা কাঠের বিড়াল ঝুলিতেছে, সেকালের অনেক চণ্ডীমণ্ডপে এ রকম বিড়াল কিংবা বাঁদর ঝুলিতে বিপিন দেখিয়াছে। একদিকে রাশীকৃত বিচালি, অন্যদিকে একখানা তক্তপোশের উপর একটা পুরানো শপ বিছানো। ঘরের মেঝেতে একস্থানে তামাকখাইবার উপকরণ—টিকে, তামাক, হুঁকা, কলিকা। ইহা ব্যতীত অন্য কোনো আসবাব চণ্ডীমণ্ডপেনাই।

রামনিধি দত্ত খবর পাইয়া বাহিরে আসিয়া বলিলেন—আপনিই ডাক্তারবাবু? ব্রাহ্মণেরচরণে প্রণাম। আসুন আসুন। বড় কষ্ট হয়েছে এই রোদ্দুরে?

বৃদ্ধ বিবেচক লোক, অল্প কিছুক্ষণ কথা বলিবার পর তিনি বলিলেন, আপনি বসুন, আমি জল পাঠিয়ে দিই হাত-পা ধোবার। জামা খুলে একটু বিশ্রাম করুন, তারপরে পাশেই নদী, ওই বাঁশ-ঝাড়টার পাশ দিয়ে রাস্তা। নেয়ে আসবেন এখন। তেল পাঠিয়ে দিচ্ছি।

স্নান করিতে গিয়া নদীর অবস্থা দেখিয়া বিপিন প্রমাদ গনিল। কচুরীপানার দামে স্নানেরঘাটের জল পর্যন্ত এমন ছাইয়া ফেলিয়াছে যে, জল দেখাই যায় না। জল রাঙা, স্নান করিয়াউঠিলে গা চুলকায়। কোনোরকমে স্নান সারিয়া সে ফিরিল।

বৃদ্ধ বলিলেন, এত বেলায় রান্না করতে গেলে আপনার যদি কষ্ট হয় তবে বলুন চিঁড়ে আছে, দুধ আছে, ভাল কলা আছে, নারকোলকোরা আছে, আনিয়ে দিই। ওবেলা বরং সকালসকাল রান্নার ব্যবস্থা করে দেব এখন।

ইতিমধ্যে দশ-এগারো বছরের একটি ছেলে একখানা রেকাবিতে একপাশে খানিকটা নারিকেলকোরা আর একপাশে একটু গুড় লইয়া আসিল। বৃদ্ধ বলিলেন, জল খেয়ে নিন, সেইকখন বেরিয়েছেন, ব্রাহ্মণ দেবতা, স্নান-আহ্নিক না হলে তো জল খাবেন না, কষ্ট কি কমহয়েছে! ওরে, জল আনলি নে? খাবার জল ঘটি করে নিয়ে আয়, সন্ধে-আহ্নিক হয়েছে কি?

বিপিন দেখিল দত্ত মহাশয় গোঁড়া হিন্দু। এখানে যদি সুনাম অর্জন করিতে হয়, তবে তাহাকে সব নিয়মকানুন মানিয়া আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণসন্তান সাজিয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং সেবলিল, সন্ধে-আহ্নিক নদী থেকে সারব ভেবেছিলাম কিন্তু তা তো হল না, এখানেই একটু—

—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি সব পাঠিয়ে দিচ্ছি। এখানেই সেরে নিন।

ওঃ, ভাগ্যে সে বাড়িতে পা দিয়াই একঘটি জল চাহিয়া লইয়া খায় নাই! তাহা হইলে এ বাড়িতে তাহার মান থাকিত না। অবস্থা-বিপর্যয় ঘটিলে কি কষ্টেই পড়িতে হয় মানুষকে।

—তা হলে রান্নার ব্যবস্থা করে দেব, না চিঁড়ে খাবেন এ বেলা?

—না না, রান্না আর এত বেলায় করতে পারব না। এ বেলা যা হয়—

দত্ত মহাশয় মহাব্যস্ত হইয়া বাড়ির ভিতর চলিয়া গেলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

১

বিপিন থাকে দত্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপে, পাশের একখানা ছোট চালাঘরে রাঁধিয়া খায়। দত্তমহাশয় বাড়ি হইতেই প্রতিদিন চালডাল দেন, বিপিনের তাহা লইতে বাধো-বাধো ঠেকিলেও উপায়নাই, বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হয়।

একদিন রোগী দেখিয়া সে একটি টাকা পাইল। দত্ত মহাশয়ের নাতিকে ডাকিয়া বলিল, হীরু, আজ তোমার মাকে বলো, আজ আর আমায় সিধে পাঠাতে হবে না, রুগী দেখে কিছু পেয়েছি, তা থেকে জিনিসপত্র কিনে আনব।

এখানে কিছুদিন থাকিয়া সে দেখিল একটা ডাক্তারখানা না খুলিলে ব্যবসা ভাল করিয়াচলিবে না। পাশের গ্রামের নাম কাপাসডাঙ্গা, সেখানে সপ্তাহে দুইবার হাট বসে, আট-দশখানিগ্রামের লোক একত্র হয়। দত্ত মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া সেখানে হাটতলায় এক চালাঘরেটিনের উপর আলকাতরা দিয়া নিজের নাম লিখিয়া ঝুলাইল। একটা কেরোসিন কাঠের টেবিলে অনেকগুলি পুরানো শিশি বোতল সাজাইয়া দত্ত মহাশয়ের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে সেই হাতলভাঙ্গা চেয়ারখানা চাহিয়া আনিয়া টেবিলের সামনে পাতিয়া রীতিমতো ডিসপেনসারি খুলিয়া বসিল।

এ গ্রামেও লোক নাই, যেখানে সে থাকে সেখানেও লোক নাই। তাহার উপর নিবিড়জঙ্গল দুই গ্রামেই। দিনমানেই বাঘ বাহির হয় এমন অবস্থা। কথা কহিবার মানুষ নাই। সকালেউঠিয়া সে এখানে আসিয়া ডাক্তারখানায় বসে, দুপুরে ফিরিয়া স্নান ও রান্নাবান্না করে। আহারান্তে কিছু বিশ্রাম করিয়া আবার হাটতলায় আসিয়া ডাক্তারখানা খোলে। চুপ করিয়া সন্ধ্যা পর্যন্ত বসিয়া থাকে, তারপর অন্ধকার ভাল করিয়া হইবার পূর্বেই দত্তবাড়ি ফিরিয়া যায়, কারণ পথের দু'ধারের বনে বাঘের ভয় আছে।

রোগী বিশেষ আসে না। এসব অজ পাড়াগাঁয়ে লোকে চিকিৎসা করাইতে শেখে নাই, ঝাড়ফুঁক শিকড়-বাকড়েই কাজ চালায়। বিপিন তাহা জানে, কিন্তু জানিয়া উপায় কি? তাহারমতো হাতুড়ে ডাক্তারের কোন্ শহরে স্থান হইবে?

বাড়িতে তাহার বাবার একজোড়া পুরানো চশমা পড়িয়া ছিল, সেটা সঙ্গে আনিয়াছিল, ডাক্তারখানায় বসিবার বা দৈবাৎপ্রাপ্ত কোনো রোগীর বাড়ি যাইবার সময়ে সেই চশমা চোখে লাগায়। কিন্তু সব সময় চোখে রাখা যায় না, সে চশমার কাচের ভিতর দিয়া সব যেন ঝাপসাদেখায়, যুবকের চোখের উপযুক্ত চশমা নয়, কাজেই অধিকাংশ সময়েই চশমা চোখ হইতে খুলিয়া পুঁছিবার ছুতা করিয়া হাতে ধরিয়া রাখিতে হয়।

আশপাশের গ্রাম হইতে মাঝে মাঝে লোক হাটবারে আসিয়া ডিসপেনসারিতে বসে।তাহারা প্রায়ই নিরক্ষর চাষি, চশমা-পরা ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া সম্ভ্রমের সহিত বলে, স্যালামডাক্তারবাবু, ভাল আছ? আপনার ডিস্‌পিনসিল ভাল চলছেন?

নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, বড় ডাক্তার গো! ভাল জায়গার ছাওয়াল, হাতের পানি খালি ব্যামো সারে! চেহারাখানা দ্যাখচ না চাচা?

কিন্তু ওই পর্যন্ত। পসার যে খুব বেশি জমে তা নয়। ইহারা নিতান্ত গরিব, পয়সা দিবারক্ষমতা ইহাদের নাই।

২

একদিন একজন লোক তাহাকে আসিয়া বলিল, ডাক্তারবাবু, আপনাকে একটু দয়া করে যাইতেহবে, রুগীর অবস্থা খুব সঙ্গীন। নরোত্তমপুরের যদু ডাক্তার এয়েছেন, আপনার নাম শুনেবললেন আপনারে ডাক্‌তি। সলাপরামর্শ করবার জন্যি।

বিপিন গতিক সুবিধা বুঝিল না। যদু ডাক্তারের নাম সে শুনিয়াছে, তাহারই মতোহাতুড়ে বটে তবে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, অনেক দিন ধরিয়া নাকি এ কাজ করিতেছে আর সে একেবারে নূতন, যদি বিদ্যা ধরা পড়িয়া যায় তবে পসার একেবারে মাটি হইবে। বিপিন লোকটাকে তাড়াইবার উদ্দেশ্যে গম্ভীর মুখে কহিল, ওসব কনসাল করার ফি আলাদা। সেআপনি দিতে পারবেন?

—কত লাগবে বাবু? যদুবাবু যা বলে দেবেন তাই দেব।

—যদুবাবুর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? তিনটাকা ফি দিতে পারবে?

—হ্যাঁ বাবু, চলুন, তিনডে টাকাই দেবানু। মনিষ্যি আগে, না টাকা আগে?

এত সহজে লোকটা রাজী হইবে, বিপিন ভাবে নাই। বিপদ তো ঘাড়ে চাপিয়া বসিলদেখা যাইতেছে। বলিল, গাড়ি নিয়ে আসতে হবে কিন্তু। হেঁটে যাব না।

রোগীর বাড়ি পৌঁছিয়া বিপিন দেখিল বাহিরের ঘরে একজন রোগামতো প্রৌঢ় লোকবসিয়া বিড়ি টানিতেছে, গায়ে কালো সার্জের কোট ও সাদা চাদর, পায়ে কেম্বিসের ফিতা-আঁটাজুতা। বুঝিল ইনিই যদু ডাক্তার। বিপিনের বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে লাগিল।

প্রৌঢ় লোকটি হাসিয়া কালো দাঁতগুলি বাহির করিয়া বলিল, আসুন ডাক্তারবাবু আসুন, নমস্কার। এসেছেন এ দেশে যখন তখন দেখা একদিন না একদিন হবেই ভেবে রেখেছি।বসুন।

বিপিন নমস্কার করিয়া বসিল। পাড়াগাঁয়ের চাষিলোকের বাহিরের ঘর, অন্তঃপুর যেদিকে, সেদিকে কেবল মাটির দেওয়াল, অন্য কোনো দিকে দেওয়াল নাই। নতুন ডাক্তারবাবুকে দেখিবার জন্য বহু ছেলেমেয়ে ও কৌতূহলী লোক উঠানে জড়ো হইয়াছে।

এতগুলি লোকের কৌতূহলী দৃষ্টির কেন্দ্রস্বরূপ হওয়াতে বিপিন রীতিমতো অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু ইহাও সে বুঝিল আজ যদি সে জয়ী হইয়া ফেরে, তবে তাহার নাম ওপসার আজ হইতেই এ অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। জিতিতেই হইবে তাহাকে যেকরিয়াই হউক।

যদু ডাক্তার বলিল, আপনার পড়াশুনা কোথায়?

বিপিন একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়াছিল যদু ডাক্তার সম্পর্কে, লোকটা শিক্ষিত নয়। বিপিন মামলা মোকদ্দমা সম্পর্কে রাণাঘাটে অনেক উকিল-মোক্তারের সঙ্গে মিশিয়াছে, তাহাদের কথাবার্তার সুর ও ধরন অন্য রকম। সে চশমার ভিতর দিয়া যেনসম্মুখের নারিকেল গাছেরমাথার দিকে চাহিয়া আছে এমন ভাবে চশমাসুদ্ধ নাকের ডগাটি খুব উঁচু করিয়া বেপরোয়া ভাবে বলিল, ক্যাম্বেল মেডিকেল স্কুলে।

—ও! কোন্ বছর পাশ করেছেন?

—আজ তিন বছর হল।

—এদিকে কতদূর পড়াশুনা করেছিলেন?

লোকটা নিতান্ত গেঁয়ো বটে। ভাল লেখা-পড়া-জানা লোকে এসব কথা প্রথম পরিচয়েরসময় জিজ্ঞাসা করে না। মানীদের বাড়ি সে এতকাল বৃথাই কাটায় নাই। সে খুব চালের সহিতবলিল, আই এসসি পাস করে ক্যাম্বেল স্কুলে ঢুকি।

যদু ডাক্তার যেন বেশ একটু ঘাবড়াইয়া গেল। বলিল, তা বেশ বেশ।

বিপিন মানীর প্রদত্ত ডাক্তারি বইগুলি পড়িয়া এটুকু বুঝিয়াছিল রোগ নির্ণয় জিনিসটা বড় সহজ নয় এবং ইহা লইয়া ডাক্তারে ডাক্তারে মতভেদ ঘটিলে সাধারণ লোকের পক্ষে ইহা বোঝা শক্ত যে কোন্ ডাক্তারের মত অভ্রান্ত।

সে বলিল, এ বাড়ির পেশেন্টের রোগটা কি?

—রেমিটেন্ট ফিভার, সঙ্গে রক্ত-আমাশা আছে, দেখুন আপনি একবার!

বিপিন ও যদু ডাক্তার বাড়ির মধ্যে গেল। রোগীর বয়স উনিশ-কুড়ির বেশি নয়, চেহারারোগের পূর্বে ভাল ছিল, বর্তমানে জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

বিপিনকে যদু ডাক্তার বলিল, আপনি দেখুন আগে।

বিপিন অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়ী টিপিয়া বুকেপিঠে নল বসাইয়া পিঠ বাজাইয়া বুক বাজাইয়া দেখিয়া বলিল, একটু নিমোনিয়ার ভাব রয়েছে।

যদু ডাক্তার তাড়াতাড়ি বিপিনের মতেই মত দিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটা আমি লক্ষ্যকরেছি।

বিপিন সাহস করিয়া আন্দাজে বলিল, টাইফয়েডের দিকে যেতে পারে বলে মনে হচ্ছে।আজ ন' দিনের দিন বল্লেন না?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ন' দিন। টাইফয়েডের কথা আমারও মনে হয়েছে—

বিপিন দেখিল লোকটা ভড়কাইয়া গিয়াছে, তাহার মতে মত দিতে খুবই আগ্রহদেখাইতেছে। বলিল, আপনি একটা ভুল করেছেন যদুবাবু, কুইনেন্‌টা দেওয়া উচিত হয় নি।প্রেসক্রিপশনটা দেখি ক'দিনের!

যদু সত্যই ভয় খাইয়া গিয়াছিল। সে দু'খানা প্রেসক্রিপশন বিপিনের হাতে দিয়া ভয়ে ভয়েবিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে হাতুড়ে ডাক্তার আর এ তরুণ যুবক, ক্যাম্বেল স্কুল হইতে বছর দুই পাশ করিয়াছে, আধুনিক ধরনের কত রকমের চিকিৎসা- প্রণালীর সহিত পরিচিত! কিভুলই না জানি বাহির করিয়া বসে! যদু ডাক্তারের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল।

কিন্তু বিপিন বুঝিল অনেক দূর আগাইয়াছে, আর বেশি উচিত নয়। যদু ডাক্তারকে হাতেরাখিলে এ সব পাড়াগাঁয়ে অনেক সুবিধা। এ-অঞ্চলে তাহার যথেষ্ট পসার, সলাপরামর্শ করিতেও দু'চার টাকা ভিজিট জুটাইয়া দিতে পারা তাহার হাতের মধ্যে।

সে গম্ভীর সুরে বলিল, চমৎকার প্রেসক্রিপশন। ঠিকই দিয়েছেন। কিছু বদলাবার নেই।

যদু ডাক্তার একবার সগর্বে চারিধারের সমবেত লোকজনের দিকে চাহিল। তাহার মন হইতে বোঝা নামিয়া গিয়াছে।

—যদুবাবু, একটু গরম জলের ফোমেন্ট করলে বোধ হয় ভাল হয়।

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমিও কাল থেকে তাই ভাবছি—

—আর একবার জোলাপটা দেওয়ান—

—জোলাপ? নিশ্চয়ই। আমিও তা

ফিরিবার পূর্বেই দুজনে খুব বন্ধুত্ব হইয়া গেল। দুজনের কেহই বুঝিতে পারিল না, পরস্পরকে তাহারা বুঝিয়া ফেলিয়াছে কিনা।

৩

হাটতলায় বিপিনকে রোগীর আশায় বসিয়া থাকিতে হয় প্রায় সারাদিনই। রোগী যদি আসিত, তবে চুপ করিয়া নিষ্কর্মা বসিয়া থাকিবার কষ্ট হয়তো পোষাইত, কিন্তু রোগী আসে না।

প্রথম মাস দুই রোগী হইয়াছিল, যদু ডাক্তারও কয়েকটি জায়গায় পরামর্শ করিবার জন্য তাহাকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রথম মাসে কুড়ি এবং দ্বিতীয় মাসে পঁয়ত্রিশ টাকা আয়হইবার পরে বিপিনের মনে নতুন আশা, আনন্দ ও উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। পাঁচ টাকা ব্যয়করিয়া সে কলিকাতা হইতে ডাকে একখানা বাংলা 'জ্বর-চিকিৎসা' বলিয়া বই আনাইল। ভারিউপকার হইল বইখানি পড়িয়া। যদু ডাক্তারের ইচ্ছা ছিল তাহাকে দিয়া অসলারের বিখ্যাতবইখানা কেনাইবে। বিপিন বলিতে পারে না যে সে ইংরাজি এমন কিছু জানে না যাহাতেকরিয়া সে অসলারের বই বুঝিতে পারে। সুতরাং সে কোনোরূপে এড়াইয়া পাশ কাটাইয়া চলিতে লাগিল। তৃতীয় মাস হইতে কেন যে দুরবস্থা ঘটিল, তাহা সে বোঝে না।

প্রথম দুই সপ্তাহ তো শুধু বসিয়া। কে একজন এক ডোজ ক্যাস্টর অয়েল লইয়া গিয়াছিল, দুই সপ্তাহের মধ্যে সে-ই একমাত্র রোগী ও খরিদ্দার।

মুদীর দোকানে বাকি পড়িতে লাগিল, ডাক্তারবাবু বলিয়া খাতির করে তাই ধারে জিনিসদেয়, নতুবা কি বিপদেই পড়িতে হইত!

একদিন চুপ করিয়া বসিয়া আছে, প্রায় সন্ধ্যার সময় একজন লোক বিপিনেরডাক্তারখানার চালাঘরের সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, এইটে কি ডাক্তারখানা?

বিপিনের বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। —হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসো, কোত্থেকে আসচো বাপু?

—আপুনিই ডাক্তারবাবু? পেন্নাম হই। আপনাকে যাতি হবে নরোত্তমপুর। যদুবাবু ডাক্তার চিঠি দিয়েছেন, এই নিন্।

লোকটা একটা চিরকুট কাগজ বিপিনের হাতে দিল। বিপিন পড়িয়া দেখিল কলেরাররোগী, যদু ডাক্তার লিখিয়াছে তাহার স্যালাইন দিবার তোড়জোড় নাই, বিপিনকে সে সবলইয়া শীঘ্র আসিতে। বিলম্ব করিলে রোগী বাঁচিবে না।

স্যালাইন দিবার তোড়জোড় বিপিনেরও নাই। কিন্তু বিপিন একটা ব্যাপার বুঝিয়া ঠিক করিয়া লইল। জলে লবণ গুলিয়া শিরার মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে বেশি বেগ পাইতে হইবে না।চিকিৎসা করিবার সাহস আছে বিপিনের। সে বাহির হইয়া পড়িল।

—শোনো, আমার বাক্সটা নিয়ে চলো, পাঁচ টাকা দিতে হবে কিন্তু—

—চলেন বাবু আপুনি। যদুবাবু যা বলে দেবেন, তাই পাবেন।

রোগীর বাড়িতে পৌঁছিয়া গৃহস্থের সাধারণ অবস্থা দেখিয়া বিপিন ভাবিল, ইহাদের নিকটহইতে পাঁচ টাকা তো দূরের কথা, এক টাকা কি আট আনা পয়সা লইতেও বাধে।

যদু ডাক্তার বলিল, স্যালাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়, বিপিনবাবু।

রোগীর ব্যাপার খুব সুবিধার নয়, বিপিন নাড়ী দেখিয়া বুঝিল। বলিল, এ তো শেষ হয়েএসেছে যদুবাবু। এরকম ঘাম হচ্ছে, নাড়ী নেমে যাচ্ছে, কতক্ষণ টিকবে?

যদু ডাক্তার বিপিনের অপেক্ষা অনেক অভিজ্ঞ লোক। সে আজ আট দশ বৎসর এইঅঞ্চলে বহু রোগী ও বহু প্রকার রোগের অবস্থা দেখিয়া আসিতেছে। সে বলিল, স্যালাইন দিনআপনি—টিকে যেতে পারে।

বিপিনের জিদ চাপিয়া গেল। সে বলিল, নুন জলে গুলে ওর শির কেটে ঢুকিয়ে দিতেহবে। অন্য কিছু ব্যবস্থা নেই। কিন্তু রোগী তার মধ্যে মারা না যায়—

আপনি শির কেটে নুনজল ঢোকান, আমি ওর মধ্যে নেই।

বিপিন অসীম সাহসী মানুষ। যে আসুরিক চিকিৎসা করিতে অভিজ্ঞ পাস-করা ডাক্তারভয় খাইত, বিপিন তাহা অনায়াসে বুক ঠুকিয়া করিয়া ফেলিল।

যদু বিপিনের কাণ্ড দেখিয়া ভয় খাইয়া বলিল—কত সি.সি. দেবেন বিপিনবাবু?

—সি.সি.-ফি.সি. কি মশাই এতে? বাংলা নুনগোলা জল, তার আবার সি. সি.! দেখুনআমি কি করি, আপনি যখন হাত দিচ্ছেন না!

এ পল্লীগ্রামের কোনো লোক এ ধরনের কাণ্ড দেখে নাই, ঘরের দোরের কাছে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া সবাই বিপিনের ক্রিয়াকলাপ দেখিতে লাগিল।

হঠাৎ রোগী একেবারে অসাড় হইয়া পড়িল।

যদু ডাক্তার বলিল, বিপিনবাবু, হয়ে গেল বোধ হয়!

—হয়নি। ভয় খাবেন না—

বিপিনের কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। বিপিন হৃদ্‌যন্ত্রেরক্রিয়া সতেজ রাখিবার জন্য একটা ইনজেক্‌শন করিল, যদু ডাক্তারের বারণ শুনিল না।

যদু বলিল, আপনি যা হয় করুন বিপিনবাবু, আমায় যেন এর পরে কেউ দোষ না দেয় তা বলে রাখছি।

বিপিন বলিল, যদুবাবু, সবসময় বই পড়ে ডাক্তারি চলে না, অন্ধকারে লাফিয়ে পড়তেহয়। বাঁচে না বাঁচে রোগী—আমার যা ভাল মনে হচ্ছে তা করে যাব।

যদু ডাক্তার বাহিরে চলিয়া গেল।

রোগী আর নাই বলিলেই হয়। কান্নাকাটি বেজায় বাড়িয়াছে ঘরের বাহিরে। বিপিন আর দু'বার ইনজেকশন করিল, রোগীর বিছানার পাশ ছাড়িয়া সে একটুও নড়িল না। তাহাকে যেন কি একটা নেশায় পাইয়াছে, কিসের ঘোরে সে কাজ করিয়া যাইতেছে সে নিজেই জানে না।আরও আধঘণ্টা পরে রোগী চোখ মেলিয়া চাহিল। রোগীর চোখের চাহনি দেখিয়া বিপিনের মনআহ্লাদে নাচিয়া উঠিল যেন, সে লোকজন ঠেলিয়া বাহিরে গিয়া দেখিল যদু ডাক্তার উঠানেরগোলার তলায় দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছে ও কয়েকজন গ্রাম্য লোকের সহিত কি কথাবলিতেছে।

—আসুন যদুবাবু, একবার নাড়ীটা দেখুন তো! আর ভয় নেই, সামলে নিয়েছে।

যদু ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিল, বেঁচে গেল এ যাত্রা। ওকে যমের মুখ থেকেটেনে বার করলেন মশাই!

যে ঘরে রোগী শুইয়া আছে, সে ঘরের মেঝেতে বন্যার জল কিছুদিন আগেও ছিল প্রায়একহাঁটু, বাঁশের মাচার উপর রোগী শুইয়া, ঘরের চারিদিকে চাহিয়া বিপিন দেখিল কয়েকটিদড়ির শিকা এবং ছেঁড়া কাঁথার পুঁটুলি ও হাঁড়িকুড়ি ছাড়া অন্য আসবাব নাই। ইহাদের কাছে ভিজিটের টাকা লইতে পারা যায়?

বিপিন ও যদু বাহিরে চলিয়া আসিল। যদু বলিল, একটা ডাব খাবেন? ওরে ব্যাটারা, ইদিকে আয়, ডাক্তারবাবুকে একটা ডাব কেটে খাওয়া।

গ্রামসুদ্ধ লোক ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিপিনের চিকিৎসা দেখিয়াছিল। সকলে বলাবলি করিতেলাগিল, এত বড় ডাক্তার বা এমন চিকিৎসা তাহারা জ্ঞানে কখনও দেখে নাই। যদু ডাক্তারলোকটা চালাক, দেখিল এ স্থানে বিপিনের প্রশংসা করিলেই সে নিজেও খাতির পাইবে, নতুবালোকে ভাবিবে যদু ডাক্তারের হিংসা হইয়াছে।

সুতরাং সে বক্তৃতার সুরে সমবেত লোকজনেরসামনে বলিল, ডাক্তার অনেক দেখিচি, কিন্তু বিপিনবাবুর মতো সাহস কোনো ডাক্তারেরদেখিনি। হাজার হোক পেটে বিদ্যে আছে কিনা! ভয়ডর নেই কিছুতেই।

একজন লোক গোটাচারেক কচি ডাব কাটিয়া আনিল। বিপিন বলিল, আমাদের ডাব তো দিচ্ছ, রোগীকে এখন অনবরত ডাবের জল দিতে হবে, সে তৈরি আছে তো?

—খান বাবু, আপনাদের ছিচরণ আশীর্বাদে দশটা নারিকেলের গাছ বাড়িতে। বাবু, শহর বাজার হলি এই গাছ কডার ফল বিক্রি করে বেশ কিছু প্যাতাম, এখানে জিনিসের দর নেই।কাপাসডাঙার হাটে ডাব একটা এক পয়সা, তাও খদ্দের নেই।

৪

ফিরিবার সময় বিপিন ভিজিট লইতে চাহিল না। যদু ডাক্তার অনেক করিয়া বুঝাইল, পাড়াগাঁয়েসবই এই রকম অবস্থার মানুষ। তাহা হইলে চলিবে কি করিয়া যদি ইহাদের নিকট ভিজিট নালওয়া যায় ?

বিপিন বলিল—তা হোক, যদুবাবু। আমি ডাক্তারি করছি শুধুই কি নিজের জন্যে, অপরের দিকটাও দেখি একটু। আচ্ছা যাই, আজ হাটবার, ডাক্তারখানা খুলি গিয়ে ওখানে।লোক এসে ফিরে যাবে।

বিপিন ভিজিট লইবে কি, মানীর কথা এসময় অনবরত মনে পড়িতেছে। মানী তাহাকে এপথে নামাইয়াছে, যদি সে কোনো গরিব রোগীর প্রাণদান দিয়া থাকে তবে তাহার বাপমায়েরআশীর্বাদ মানীর উপর গিয়া পড়ুক। মানীর লাভ হউক। এই অতি দুরবস্থাগ্রস্ত রোগীর নিকট সে মোচড় দিয়া টাকা আদায় করিলে মানীর স্মৃতির সম্মান ঠিকমতো বজায় রাখা হইত না।

কাপাসডাঙার হাটতলায় যখন সে ফিরিয়া আসিল তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে।

আজ এখানকার হাটবার, পাড়াগাঁয়ের ছোট হাট, সবসুদ্ধ একশো কি দেড়শো লোক জমিয়াছে, খুচরো ঔষধ কিছু কিছু বিক্রয় হইয়া থাকে।

কুমড়া বেগুন বিক্রয় করিয়া যে যেখানে চলিয়া গেল। বিপিন ডাক্তারখানা বন্ধ করিয়াপাশে বিষ্ণু নাথের মুদীর দোকান হ্যারিকেন লণ্ঠনটি ধরাইতে গেল। বিষ্ণু খরিদ্দারকে খৈলআর ক্রাসিন তৈল মাপিয়া দিতেছে। বিপিন বলিল, বিষ্ণু, বাড়ি যাবে না?

বিষ্ণু বলিল, আমার এখনও অনেক দেরি ডাক্তারবাবু। এখন তবিল মেলাব, কালকেরতাগাদার ফর্দ তৈরি করব, আপনি যান। হ্যাঁ ভাল কথা, আপনার যে ভারি সুখ্যাত শোনলাম!

—কে করলে সুখ্যাত?

—ওই সবাই বলাবলি করছিল। আজ কোথায় রুগী দেখে এলেন, তাকে নাকি শির কেটে নুনগোলা জল ঢুকিয়ে কলেরার রুগী একেবারে বাঁচিয়ে চাঙ্গা করে দিয়ে এসেছেন, এই সবকথা বলছিল। সবারই মুখে ওই এক কথা।

যাহারা প্রশংসা চিরকাল পাইয়া আসিতেছে, তাহারা জানে না জীবনে কত লোক আদৌকখনও ও জিনিসটার আস্বাদ পায়ই না। বিপিনকে ভাল বলিয়াছিল কেবল একজন, সে গেলঅন্য ধরনের ব্যাপার। কাজ করিয়া অনাদিবাবুর সুখ্যাতি সে কোনোদিনই অর্জন করিতে পারে নাই। এই প্রথম লোকে অযাচিতভাবে তাহার কাজকে ভাল বলিতেছে, তাহার ব্যক্তিত্বকেসম্মান দিতেছে, মানুষের জীবনে এ অতি মূল্যবান ঘটনা।

বিষ্ণু আরও বলিল, ডাক্তারবাবু, আপনি নাকি ওরা গরিব বলে এক পয়সা নেননি? সবাই বলছিল, কি দয়ার শরীর! মানুষ না দেবতা! গরিব বলে শুধু একটা ডাব খেয়ে চলে এলেন বাবু!

হ্যারিকেন লণ্ঠনটা জ্বালিয়া দু'ধারের ঘন বনের ভিতরকার সুঁড়িপথ বাহিয়া বিপিন প্রায়দেড় মাইল দূর রামনিধি দত্তের বাড়ি ফিরিল।

দত্ত মহাশয় চণ্ডীমণ্ডপেই বসিয়া বিষয়সংক্রান্ত কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। তক্তপোশেরউপর মাদুর বিছানো, সামনে কাঠের বাক্স, তাহার উপরে লণ্ঠন।

বলিলেন, আসুন ডাক্তারবাবু, আজ বাড়িতে আমার জামাই-মেয়ে এসেছে অনেক দিনপরে। আজ একটু খাওয়া-দাওয়া আছে, তা আপনাকে আর হাত পুড়িয়ে রাঁধতে হবে না। দু'খানালুচি না হয় অমনি গরিবের বাড়ি—

—বিলক্ষণ, সে কি কথা! তা হবে এখন। ওসব কি বলছেন? জামাইবাবু কই?

—বাড়ির মধ্যে গিয়েছেন। এতক্ষণ বাঁওড়ের ধারে বেড়াচ্ছিলেন, চা খেতে ডাক দিলে তাই গেলেন। ওরে কেষ্ট, ডাক্তারবাবুকে চা দিয়ে যা, সন্দে-আহ্নিক সেরে ফেলুন হাত-পা ধুয়ে।

ইহারা কখনও চা খায় না। আজ জামাই আসিয়াছে, তাই চা খাওয়ার ও দেওয়ার ব্যস্ততা। বিপিনের হাসি পাইল।

একটু পরে দত্ত মশায়ের জামাই বাহিরে আসিল। বিপিনের সমবয়সী হইবে, দেখিতে শুনিতে খুব ভাল নয়, মুখে বসন্তের দাগ।

দত্ত মহাশয়ের কথায় সে বিপিনের পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া তক্তপোশের একপাশে বসিল।

বিপিন বলিল, জামাইবাবু কোথায় থাকেন?

—আজ্ঞে কুলে-বয়ড়া। সেখানে তামাকের ব্যবসা করি।

—এখানে ক'দিন থাকবেন তো?

—থাকলে তো চলে না। এখন তাগাদা-পত্তরের সময়, নিজে না দেখলে কাজ হয় না। পরশু যাব ভাবছি।

জামাইয়ের সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হইল। আজ এবেলা রান্নার হাঙ্গামা নাই বলিয়াই বিপিন নিশ্চিন্ত মনে গল্প করিবার অবকাশ পাইয়াছে। দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে অন্যদিন যে গল্প হয় তাহা বিপিনের তেমন ভাল লাগে না, দত্ত মহাশয় শুধু রামায়ণ-মহাভারতের কথা বলেন।আজ সমবয়সী একজন লোককে পাইয়া অনেকদিন পরে সে গল্প করিয়া বাঁচিল।

তামাক খাইবার উপায় নাই, দত্ত মহাশয় বসিয়া আছেন। অনেকক্ষণ পরে বোধ হয় তার খেয়াল হইল, তিনি উপস্থিত থাকাতে ইহাদের ধূমপানের অসুবিধা হইতেছে। বলিলেন, তাহলেবসুন ডাক্তারবাবু, আমি দেখি খাওয়া-দাওয়ার কতদূর হল, এদিকে রাতও হয়েছে।

৫

কিছুক্ষণ পর বাড়ির ভিতর হইতে আহারের ডাক পড়িল।

পাশাপাশি খাইবার আসন পাকা হইয়াছে দত্ত মহাশয় ও জামাইয়ের। বিপিন ব্রাহ্মণ, সুতরাং তাহার আসন একটু দূরে পৃথকভাবে পাতা।

একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের তরুণী লুচি লইয়া ঘরে ঢুকিয়া সলজ্জভাবে বিপিনের দিকেচাহিল।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, এইটি আমার মেয়ে। শান্তি, ডাক্তারবাবুকে প্রণাম করো মা।

তরুণী লুচির চুপড়ি নামাইয়া রাখিয়া বিপিনের পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। তারপর সকলের পাতে লুচি দিয়া চলিয়া গেল।

বিপিনের হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল আর এক দিনের কথা। মানীদের বাড়ি, সেও এই রকমজামাই আসিয়াছিল, রান্নাঘরে এই রকম জামাইবাবু, অনাদিবাবু ও সে খাইতে বসিয়াছিল।সেদিন আড়ালে ছিল মানী—দেড় বৎসর আগের কথা।

আর কি তাহার সঙ্গে দেখা হইবে? সম্ভব নয়। দেখাসাক্ষাতের সূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে।আর সে সম্ভাবনা নাই।

ভাবিতেই বিপিনের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়া উঠিল। লুচির ড্যালা গলায় আটকাইয়া গেল, কান্না ঠেলিয়া আসে। মন হু হু করিয়া উঠিল। ইহারা কে? ওই যে শ্যামা মেয়েটি আধঘোমটা দিয়া পরিবেশন করিতেছে, কে ও? বিপিন ইহাদের চেনে না। অতি সুপরিচিত পরিবেশের মধ্যে ইহারা সবাই অপরিচিত। কোনো দিক দিয়াই বিপিনের সঙ্গে ইহাদের কোনো যোগাযোগ নাই।

শান্তি আসিয়া পায়েসের বাটি প্রত্যেকের পাতের কাছে রাখিয়া সেই ঘরের মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। দত্ত মহাশয় বিপিনের ডাক্তারির প্রশংসা করিতেছিলেন, শান্তি কেমনে যেন তাহাই শুনিতেছিল।

বিপিন একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেই শান্তির সঙ্গে চোখাচোখি হইয়া গেল। শান্তি তাহারই দিকে চাহিয়া ছিল এতক্ষণ নাকি? বিপিন কেমন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

দত্ত মহাশয় তাহার মেয়েকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন, তিনি লুচি খাইতে ভালবাসেননা, তবে কেন তাঁহাকে লুচি দেওয়া হইয়াছে? দত্ত মহাশয়ের আহারাদির বিশেষত্ব আছে, পূর্বে অবস্থা ভাল থাকার দরুনই হউক বা যে জন্যই হউক, তাহার খাওয়া-দাওয়া একটু শৌখিন ধরনের। তাহার জমিতে সাধারণত মোটা নাগরা ধান হয়, কিন্তু সে ধানের চাল তিনি খাইতেপারেন না বলিয়া সেই ধানের বদলে উৎকৃষ্ট সরু চামরমণি ধান সংগ্রহ করিয়া আনেনসোনাতনপুরের বিশ্বাসদের গোলাবাড়ি হইতে। বারোমাস তিনি এই চামরমণি ধানের চাল ছাড়াখান না। বাড়ির আর কেহ নয়, শুধু তিনি। অন্য সকলের জন্য ক্ষেতের মোটা চালের ব্যবস্থা।তবে অতিথিসজ্জন আসিলে অবশ্য অন্য কথা।

বড় বগী থালায় চূড়ার আকারে ভাত বাড়িয়া চূড়ার মাথায় ক্ষুদ্র কাঁসার বাটিতে গাওয়াঘি দিতে হইবে। ঢাকনিওয়ালা ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে তাঁহাকে জল দিতে হইবে। খুব বড় কাঁঠাল কাঠের সেকেলে পিঁড়ি পাতিয়া থালায় সুগোছালো করিয়া ভাত সাজাইয়া না দিলে তাহার খাওয়া হয় না।

অনেকদিন পরে মেয়ে আসিয়াছে, দত্ত মহাশয় একটু বেশি সেবা পাইতেছেন। পুত্রবধূরাশ্বশুরের সেবা যথেষ্ট করিলেও বিপত্নীক দত্ত মহাশয়ের তাহা মনে ধরে না। মেয়ে কেন ভাতসাজাইয়া না দিয়া লুচি খাওয়াইতেছে, ইহাই হইল দত্ত মহাশয়ের অনুযোগের কারণ।

খাওয়ার পর বিপিন বাহিরে যাইতেই দালানের পাশে জানালার দিকে চাহিল—মানী দাঁড়াইয়া আছে! কেহ নাই। রোজ তাহার খাওয়ার পরে বাহিরে যাইবার পথে এইরূপ জানালারধারে সে দাঁড়াইয়া থাকিত। কি ছাইভস্ম সে ভাবিতেছে? এটা কি মানীদের বাড়ি যে মানীদাঁড়াইয়া থাকিবে জানালায়? বাহিরে সে একাই আসিয়া তামাক খাইতে বসিল।

বেশ অন্ধকার রাত্রি। উঠানের নারিকেল গাছের মাথায় জটপাকানো অন্ধকার, কিন্তু ক্রমশস্বচ্ছ তরল হইয়া উঠিতেছে, পূর্ব দিগন্তে চাঁদ উঠিবার সময় হইল বোধ হয়। গোলার পাশেহাস্নুহানার ঝাড় হইতে অতি উগ্র সুগন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে। এমন রাত্রে ঘুম হয়?

শুধুই বসিয়া ভাবিতে ইচ্ছা করে।

আর কি কখনও তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না?

আজ যে ডাক্তার হিসাবে তাহার এত খাতিরযত্ন, লোকমুখে এত সুখ্যাতি, এ সব কাহারদৌলতে?

যে তাহাকে এ পথ দেখাইয়া গিয়াছিল সে আজ কোথায় ?

আজ বিশেষ করিয়া ইহাদের বাড়ির এই জামাই আসার ব্যাপারে মানীদের বাড়ির তিন বৎসর পূর্বের সে ঘটনা তাহার বিশেষ করিয়া মনে পড়িয়াছে। এমন এক দিনেই মানীর সঙ্গেতাহার আলাপ হয় আবার নূতন করিয়া, বাল্যের দিনগুলির অনেক, অনেক পরে। মানীর জন্যএত মন-কেমন করে কেন?

বিপিন কত রাত্রি পর্যন্ত জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে আরও বড় হইবে। ভাল করিয়া ডাক্তারি শিখিবে। মানীর যে দেওর বীজপুরে থাকিয়া ডাক্তারি করে, তাহার কাছে গেলে কেমন হয়? বিপিন নিজের মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তি অনুভব করে। সে ডাক্তারি খুব ভাল বোঝে, এ কাজে তাহার ঈশ্বরদত্ত স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে, কিন্তু আরও ভাল করিয়া শেখা চাই জিনিসটা।

৬

ভাবিতে ভাবিতে কখন সে ঘুমাইয়া পড়িল।

শেষরাত্রে বিপিন স্বপ্ন দেখিল মানী আসিয়াছে। হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়া বলিতেছে, পোলাও কেমন খেলে বিপিনদা? তোমার জন্যে আমি নিজের হাতে—ভাল লাগল?

ঠিক তেমনি হাসি, সেই সুপরিচিত অতি প্রিয় মুখ!

বিপিন বলিল, আমি মরে যাচ্ছি মানী, তোকে দেখতে না পেয়ে। তুই আমায় বাঁচা, আমায়ডাক্তারি শেখাবিনে বীজপুরে তোর দেওরের কাছে?

খুব ভোরে বিপিন হাত মুখ ধুইয়া সবে চণ্ডীমণ্ডপে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া বসিয়াছে, এমন সময় দত্ত মহাশয়ের মেয়ে শান্তি এক কাপ চা আনিয়া রোয়াকের ধারে রাখিয়াই বিন্দুমাত্র নাদাঁড়াইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন একটু অবাক হইয়া গেল। ইহাদের বাড়ির আবরু বড় কড়া, এতদিন এখানে আছেসে, বাড়ির কোনো মেয়ে, অবশ্য মেয়ে বলিতে দত্ত মহাশয়ের দুই পুত্রবধূ, কখনও তাহারসামনে বাহির হয় নাই। শান্তি যে বড় বাহিরে আসিয়া চা দিয়া গেল! তবে হ্যাঁ, শান্তি তো আরঘরের বউ নয়, বাড়ির মেয়ে। তাহার আসিতে বাধা কি? সেদিন সারাদিনের মধ্যে শান্তি আরও অনেকবার বিপিনের সামনে বাহির হইল। শান্তি মেয়েটি বেশ সেবাপরায়ণা ও শান্ত। চেহারারমধ্যে একটা মিষ্টত্ব আছে, যদিও দেখিতে এমন কিছু সুশ্রী নয়।

এক জায়গায় ভালবাসা পড়িলে আর দু জায়গায় কিছু হয় না।

ভালবাসা এমন জিনিস, যাহা কখনও দুই নৌকায় পা দেয় না। হয় এ নৌকা, নয় ওনৌকা। কত মেয়ে তো আছে জগতে, কত মেয়ে তো সে নিজেই দেখিল, কিন্তু মানীর মতোমেয়ে সে কোথাও দেখে নাই। আর কাহারও দিকে মন যায় না কেন?

পরবর্তী দুই তিন দিনের মধ্যে বিপিন অনেকগুলি রোগী হাতে পাইল। রোজ সকালবেলা ডাক্তারখানা খুলিতে গিয়া দেখে যে ডাক্তারখানার সামনে হাটচালায় রীতিমতো রোগীর ভিড়জমিয়া গিয়াছে, সকলে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। ম্যালেরিয়ার সিজন্ পড়িয়া গিয়াছে। দুই তিন দিনের মধ্যে সে ভিজিটই পাইল সাত-আট টাকা।

বিপিনের ডাক্তারখানা এই সপ্তাহ হইতেই বেশ জমিয়া উঠিল। গোগা, মল্লিকপুর, সরুলেপ্রভৃতি দূর গ্রাম হইতেও তাহার ডাক আসিতে লাগিল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল, যদু ডাক্তারের পসার একেবারে মাটি হইয়া গেল নূতন ডাক্তারবাবু আসাতে।

দত্ত মহাশয় একদিন বলিলেন, আপনার চেহারাখানার গুণে আপনার পসার হবেডাক্তারবাবু। ডাক্তারের এমন চেহারা হওয়া চাই যে তাকে দেখলেই রোগিণীর রোগ আদ্ধেকসেরে যাবে। আপনার সম্বন্ধেও সকলেই সেই কথা বলে। যদু ডাক্তার আর আপনি! হাজার হোক আপনি হলেন ব্রাহ্মণ! কিসে আর কিসে!

বিপিন হিসাব করিয়া দেখিল সে পাঁচ মাস আদৌ বাড়ি যায় নাই। অবশ্য এই পাঁচ মাসের মধ্যে প্রথম তিন মাস কিছুই হয় নাই, শেষ দুই মাসে প্রায় দেড়শত টাকা আয় হইয়াছে।ম্যালেরিয়ার সিজন্ এখনও পুরোদমে চলিবে আরও অন্তত এক মাস। এইসময়ে একবার বাড়িঘুরিয়া আসা দরকার।

দশম পরিচ্ছেদ

১

যেদিন বিপিন বাড়ি যাইবার ঠিক করিয়াছে, সেদিন সকালে দত্ত মহাশয়ের মেয়ে শান্তি তাহাকেচণ্ডীমণ্ডপে জলখাবার দিতে আসিল। একখানা কাঁসিতে চালভাজা ও নারিকেলকোরা, ইহাইজলখাবার। চা ইহারা বাঁধা নিয়মে খায় না, ক্বচিৎ কখনও সর্দি-কাশি হইলে ঔষধ হিসাবে খাইয়া থাকে। সুতরাং মেয়েটি যখন জলখাবারের কাঁসি নামাইয়া সলজ্জ কুণ্ঠার সহিত বলিল, সে চাখাইবে কিনা, বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—চা হচ্চে?

মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে বলিল, যদি খান তো করে নিয়ে আসি।

—না। শুধু আমার খাওয়ার জন্যে দরকার নেই।

—কেন দরকার নেই, নিয়ে আসছি।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে চলিয়া গেল এবং কিছুক্ষণ পরে এক পেয়ালা ধূমায়িত গরম চা আনিয়া দিল। দত্ত মহাশয়ের মেয়ে তাহার সহিত এত কথা ইহার পূর্বে কখনও বলেনাই, যদিও আর দু-একবার তাহাকে জলখাবার দিতে আসিয়াছিল। বিপিন ইহাদের বাড়িরআবরু কড়া বলিয়াই জানে।

মেয়েটি চা দিয়া তখনও দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বিপিন ভাবিল পেয়ালা লইয়া যাইবারজন্যই সে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ব্যগ্রভাবে গরম চায়ের পেয়ালায় প্রাণপণে চুমুকের পরচুমুক দিতে দেখিয়া মেয়েটি হঠাৎ হাসিয়া বলিল, অমন করে তাড়াতাড়ি অত গরম খাওয়ার দরকার কি? আস্তে আস্তে খান—

বিপিন কথা বলিবার জন্যই বলিল, তুমি আর কত দিন আছ?

—এ মাসটা আছি।

—ও!

—আপনি নাকি আজ বাড়ি যাবেন ?

—হ্যাঁ।

—ক'দিন থাকবেন?

—দিন পনেরো হবে।

মেয়েটি হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—অত দিন?

পরক্ষণেই যেন কথাটা ও তাহার সুরটা ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য বলিল—রুগীপত্তরওতো আছে আবার এদিকে—

—যদু ডাক্তার দেখবে আমার রুগী—একটা মোটে আছে।

—বাড়িতে কে কে আছেন?

—মা আছেন, আমার একটি বোন আর আমার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে।

—আপনার এখানে থাকতে খুব কষ্ট হয়, না ?

—নাঃ, কি কষ্ট! বেশ আছি, তোমার বাবা যথেষ্ট স্নেহ করেন, বড় ভাল লোক।

—তবে আমাদের এখানেই থাকুন।

—আছিই তো। কোথায় আর যাব, ধরো—

—যদি আমাদের গাঁয়ে বাস করেন, আমি বাবাকে বলে আপনাকে জমি দেওয়াব। আসবেন?

বিপিন বিস্মিত হইল। কখনও এ মেয়েটি তাহার সম্মুখে এত দিন ভাল করিয়া কথাই কয় নাই—আজ এত কথায় তাহাকে পাইয়া বসিল কোথা হইতে ? বলিল—তা কি করে হয়, পৈতৃক বাড়ি রয়েছে সেখানে—

—কিন্তু ডাক্তারি তো এখানেই করতে হবে—

—সে তো বটেই।

—আপনি আজ বাড়ি যাবেন কখন?

—খেয়েদেয়ে যাব দুপুরে।

—আমি চলে যাবার আগে আসবেন কিন্তু—

—ঠিক আসব—নিশ্চয়ই আসব—

মেয়েটি চায়ের পেয়ালা ও কাঁসি লইয়া চলিয়া গেল।

বিপিন ভাবিল কেমন চমৎকার মেয়েটি। মনে বেশ মায়া আছে। হবে না কেন, কি রকমবাপের মেয়ে! দত্তমশায়ও চমৎকার মানুষ।

২

চা খাইয়া ডিসপেন্‌সারিতে গিয়াই বিপিন যদু ডাক্তারের কাছে একখানি পত্র দিয়া একজন লোকপাঠাইয়া দিল—তাহার হাতের রোগীটি দেখবার জন্য, যত দিন সে না ফেরে। তাহার পর দোরবন্ধ করিয়া বাহির হইবে, এমন সময়ে দরজার এক পাশে মেঝের উপর একখানা খামের চিঠিপড়িয়া আছে দেখিয়া সেখানা তুলিয়া লইল। ইতিমধ্যে কখন পিয়ন আসিয়া চিঠিখানা বোধ হয় দরজার ফাঁক দিয়া ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। খামখানার উপরকার হস্তাক্ষর দেখিয়া তাহার বুকের রক্ত যেন দুলিয়া উঠিল। এ লেখা মানীর হাতের লেখার মতো বলিয়া মনে হয় যেন! বাড়িরঠিকানা ছিল, গ্রামের পোস্টমাস্টার সে ঠিকানা কাটিয়া এখানে পাঠাইয়াছে। নিশ্চয়ই মানীর চিঠিনয়—সে অসম্ভব ব্যাপার।

চিঠি খুলিয়া প্রথম দুই চার ছত্র পড়িয়াও সে কিছু বুঝিতে পারিল না, নিচের নামটাএকবার পড়িয়া লইতে গিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। মানীরই চিঠি। মানী লিখিয়াছেঃ—

আলিপুর

সোমবার

শ্রীচরণকমলেষু,

বিপিনদা, কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কাল শেষরাত্রে তোমাকে স্বপ্ন দেখেছি, যেন আমাদের বাড়ির মাঝের ঘরের জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলচো। মন ভারি খারাপ হয়ে গেল, তাই চিঠি লিখছি তোমার বাড়ির ঠিকানায়। পাবে কিনা জানিনে।

বিপিনদা, কতদিন সারারাত জেগেছি তোমার কথা ভেবে। সর্বদা ভাবি, একটা কি যেন হারিয়েচি, আর কখনও পাব না। যদি পলাশপুরের চাকুরি না ছাড়তে, তবে দেখা হওয়ারসম্ভাবনা থাকত। আমি শ্বশুরবাড়ি

এসে বাবার চিঠিতে জানলাম তুমিআর আমাদের ওখানেনেই। আমার কথা তুমি রাখলে না, আমি বলেছিলাম আমাকে না জানিয়ে চাকুরি ছেড়ে দিয়োনা। কেনই বা রাখবে? আমার সত্যিই জানতে ইচ্ছে করে, তুমি আমার জন্যে কখনও কোনো দিন এতটুকু ভাব কি না। হয়তো ভুলে গিয়েচ এতদিনে। হয়তো আমার এ চিঠি পাবেই না, যদিপাও, আমার কথা একটু মনে কোরো বিপিনদা। তুমি আজকাল কি করো, জানতে বড় ইচ্ছেহয়।

আমার ঠিকানা দিলাম না, এ পত্রের উত্তর চাই না। কত বাধা জানো তো সবই। তুমি যদি আমায় একটুও মনে করো চিঠিখানা পেয়ে, তাতেই আমার সুখ। আমার প্রণাম নিয়ো। আশীর্বাদকরো, আর বেশি দিন না বাঁচি। ইতি—

মানী।

বিপিন চিঠিখানা পকেটে রাখিয়া ডিসপেনসারির ভাঙ্গা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, এ কিঅসম্ভব কাণ্ড হইয়া গেল! মানী তাহাকে চিঠি লিখিবে, একথা কখনও কি সে ভাবিয়াছিল ? এতখানি মনে রাখিয়াছে তাহাকে সে?

অনেক দিন পরেই বটে। মানীর সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নাই। আজ এই চিঠিখানার ভিতর দিয়া এতকাল পরে বহুদূরের মানীর সহিত আবার দেখা হইল। এতদিন কিনিঃসঙ্গ মনে করিয়াছে নিজেকে—সে নিঃসঙ্গতা যেন হঠাৎ এক মুহূর্তে দূর হইয়া গেল। মানী তাহার জন্য ভাবে, আর কি চাই সংসারে?

মানী লিখিয়াছে, সে কি করিতেছে জানিবার তাহার বড়ই আগ্রহ। যদি বলিবার সুবিধাথাকিত, তবে সে বলিত, মানী, কি করচি জানতে চেয়েচ, তুমি যে পথের সন্ধান আমায় দয়াকরে দিয়েছিলে, সেই পথই ধরেছি। তোমার মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়েছিল, তাকে সার্থক করে তুলব আমি প্রাণপণে। তুমি যদি এসে দেখতে, এখানে ডাক্তারিতে আমি কেমন নাম করেছি, তা হলে কত আনন্দ পেতাম আজ। কিন্তু তা যে হবার নয়। কোনো রকমে যদি সে কথাটা জানাতেপারতাম!

বাড়ি ফিরিতেই দত্ত মহাশয়ের মেয়েটি তখনি আসিল। বলিল, উঃ, কত বেলা হয়েগেল! আপনি কখন আর রান্না করবেন, কখনই বা খাবেন আর কখনই বা বেরুবেন?

—এই এখুনি তাড়াতাড়ি নিচ্ছি।

—তার চেয়ে এক কাজ করি না কেন? আমি দুধ জ্বাল দিয়ে এনে দিচ্ছি, আর বাবার জন্যে সরু চিঁড়ে তোলা থাকে তাই এনে দিচ্চি। রান্নার হাঙ্গামা এখন আর করবেন না।

—তাই হবে এখন তবে।

—নেয়ে আসুন, তেল দিয়ে যাই।

মেয়েটির এই নতুন ধরনের যত্ন বিপিনের ভাল লাগিতেছিল। বিদেশেবিভুঁয়ে এমন যত্নকে করে?

স্নান করিতে গেল নদীতে—ক্ষীণকায়া নদী, স্থানীয় মান মালা... কচুরিপানার দামে বুজিয়া আছে। ওপারে বাঁশবন আর ফাঁকা মাঠ, এপারে নদীর ঘাটে যাইবার সুঁড়িপথের দুধারেকেলেকোঁড়া ও শাম্‌লা লতার ঝোপ। শাম্‌লা লতায় এ সময় ফুল ফোটে, ভারি সুগন্ধ বাতাসে।ওপারে বাঁশবনে কুকো পাখি ডাকিতেছে। ধোপাখালি কাছারি থাকিতে একজন প্রজা একজোড়াকুকো পাখি তাহাকে দিয়া গিয়াছিল, বেশ সুস্বাদু মাংস।

মাৎলা নদীর যতখানি কচুরিপানায় বুজিয়া গিয়াছে, ততখানি জুড়িয়া সবুজ দামের উপরনীলাভ বেগুনি রঙের ফুল ফুটিয়াছে বড় বড় ডাঁটায়—যতদূর দেখা যায়, ততদূর ফুল, কিচমৎকার দেখাইতেছে!

আজ যেন সবই সুন্দর লাগিতেছে চোখে। যে মানীর সঙ্গে জীবনে আর দেখা হইবে না, তারই হাতের লেখা চিঠিখানা। কি অপূর্ব আনন্দ আর সান্ত্বনা বহন করিয়াই আনিয়াছে সেখানাআজ! সুপ্রভাত—কি অপূর্ব সুপ্রভাত!

দত্ত মহাশয়ের মেয়ে একবার বাহিরের উঠানে আসিয়া বলিল—জায়গা করি?

—করো, আমি যাচ্চি।

মেয়েটি যত্ন করিয়া আসন পাতিয়া জায়গা করিয়াছে, শুধু একখানা আসন দেখিয়া বিপিনবলিল, দত্ত মশায় খাবেন না?

—বাবা বাড়ি নেই, ওপাড়ায় বেরুলেন। তা ছাড়া এখনও রান্না হয়নি, শুধু আপনার চিঁড়েদুধের ফলার—তাই আপনাকে খাইয়ে দিই। এতটা পথ আবার যাবেন—

সে একটি বড় কাঁসিতে ভিজানো চিঁড়ে লইয়া আসিল। বলিল, আপনি নাইতে গেলেনদেখে আমি চিঁড়েতে দুধ দিইচি—সরু ধানের চিঁড়ে, বেশি ভিজলে একেবারে ভাতের মতো হয়ে যায়—দাঁড়ান, কলা নিয়ে আসি।

কত যত্নের সহিত সে কলা ছাড়াইয়া দিল, গুড়ের বাটি হইতে গুড় ঢালিয়া দিল।

বিপিন খাইতে আরম্ভ করিলে বলিল, তেঁতুলের ছড়া-আচার খাবেন? বেশ লাগবেচিঁড়ের ফলারে। বলিয়াই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে চলিয়া গেল, আসিতে কিছু বিলম্বহইতে লাগিল দেখিয়া বিপিন ভাবিল, বোধ হয় আচার ফুরাইয়া গিয়াছে—মেয়েটি জানিত না, লজ্জায় পড়িয়া গিয়াছে বেচারি।

কিন্তু প্রায় দশমিনিট পরে সে একটা ছোট্ট পাথরের বাটিতে দু'তিন রকমের আচারআনিয়া সামনে রাখিয়া সলজ্জ কৈফিয়তের সুরে বলিল, আচারের হাঁড়ি, যে সে কাপড়ে তো ছোঁবার জো নেই, দেরি হয়ে গেল। এই যে করম্‌চার আচার, এ আমি আর বছর করে রেখে গিয়েছিলাম, বাবা খেতে বড় ভালবাসেন। দেখুন তো চেখে, ভাল আছে?

—বাঃ, বেশ আছে। তুমি আচার করতে জানো বড় চমৎকার দেখছি যে—

মেয়েটি লাজুক হাসি হাসিয়া বলিল, এমন আর কি করতে জানি, মা থাকতেশিখিয়েছিলেন। শ্বশুরবাড়িতে আমার শাশুড়িও অনেক রকম আচার করতে জানেন। এঁচড়েরআচার পর্যন্ত।

—আর কি কি আচার জানো?

—আমের জানি, নেবুর জানি, নংকার জানি—

—নংকার আচার বড় চমৎকার হয়, একবার খেয়েছিলাম—

—চিঁড়ে আর দুটো নেবেন?

—পাগল! পেট ভরে গিয়েছে, দুধ জ্বাল দেওয়া হয়েছে একবারে ঘন ক্ষীর করে—

খাওয়া শেষ করিয়া বিপিন বাহিরে আসিল। ভাবিল, বেশ মেয়েটি। এমন দয়া শরীরে, এমন মমতা, যেন নিজের বোনটির মতো বসে বসে খাওয়ালে।

মানীর কথা মনে পড়িল। মানী ও এই মেয়েটি যেন এক ছাঁচে ঢালাই, তবে প্রভেদওআছে, মানী মনে প্রেম জাগায় আর এ জাগায় স্নেহ ও শ্রদ্ধা।

কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি একটা নেকড়ায় জড়ানো গোটাকতক পান আনিয়া বিপিনের হাতে দিয়া বলিল, পান ক'টা নিয়ে যান, রোদ্দুরে জলতেষ্টা পাবে, পথের জল খাবেন না কোথাও।কবে ফিরবেন ?

বিপিন উঠানেই দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, আজ আর বাড়ি যাব না ভাবছি।

মেয়েটি অবাক হইয়া বলিল, যাবেন না?

—না, তাই বেলা দেখছিলাম এখানে দাঁড়িয়ে। এত দেরিতে বেরুলে পথেই রাত হবে। —তবে যাবেন না আজ। মিছিমিছি চিড়ে খেলেন কেন, কষ্ট পাবেন সারাদিন।

—ফাঁকি দিয়ে চিঁড়ের ফলার করে নিলাম। রোজ তো অদৃষ্টে এমন ফলার জোটে না—মেয়েটি সলজ্জ হাসিয়া বলিল, তা কেন, ভালবাসেন চিঁড়ের ফলার? কালই আবার খাবেন।

বিপিনের ভারি ভাল লাগিল মেয়েটির এই কথাটা। এই অল্পক্ষণের মধ্যে মেয়েটি তার সরল মন ও কথাবার্তার গুণে বিপিনকে আকৃষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

মেয়েটি বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলেও বিপিনের মনে হইতে লাগিল, আবার যদি সেআসে, তবে বেশ ভাল হয়। বিপিনের এ ধরনের মনের ভাব হয় নাই অনেক দিন।

কিন্তু বহুক্ষণ সে আসিল না। না আসুক, বিপিন আর জালে জড়াইবে না। কেহই শেষ পর্যন্ত টেঁকে না ওরা। কেবল নাড়া দিয়া যায় এই মাত্র। কষ্টও দিয়া যায় খুব। মানী যেমন গিয়াছে, এও তেমনি চলিয়া যাইবে। দরকার কি এই সব আলেয়ার পিছনে ছুটিয়া ?

মানী আলেয়া বটে—কিন্তু তার আলো তাহার মতো পথভ্রান্ত পথিককে পথ দেখাইয়াছে।খুবই কষ্ট হয় মানীর জন্য, কিন্তু সেই কষ্টের মধ্যে কি ব্যথাভরা অপূর্ব আনন্দ আসে তাহারমুখখানি, তাহার সেই সপ্রেম দৃষ্টি মনে করিলে। সর্বদা তাহাকে দেখিতে পাইলে এ মনের ভাবথাকিত না, এ কথা এখন সে বোঝে।

৩

দত্ত মহাশয় দিবানিদ্রা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, শান্তি বলছিল, আপনিবাড়ি যাবেন বলে শুধু দুটি চিঁড়ে খেয়ে কষ্ট পাচ্ছেন সারাদিন—

—বলেছে বুঝি? কষ্টটা কি? না না—বেলা বেশি হল বলে আর যেতে পারলাম না।আপনার মেয়ে বড় যত্ন করেছে ওবেলা। বড় ভাল মেয়েটি—

—যত্ন আর কি করবে? আপনারা ব্রাহ্মণ, আমরা আপনাদের সেবাযত্ন করব সে তো আমাদের ভাগ্যি। সে আর এমন বেশি কথা কি—

দত্ত মহাশয় সেকেলে ধরনের গোঁড়া হিন্দু, ব্রাহ্মণের উপর তাহার অসাধারণ ভক্তি, কাজেই কথাটা তিনি অন্যভাবে লইলেন। কিছুক্ষণ বসিয়া জমিজমাসংক্রান্ত গল্প করিবার পরবলিলেন, এখানে কিছু ধানের জমি করে দিই আপনাকে। জমি সস্তা এখানে। বছরের ভাতেরভাবনা দূর হবে। ডাক্তারির ব্যাপার হচ্ছে, যেখানে পসার সেখানে বাস।

দত্ত মহাশয় উঠিয়া চলিয়া গেলেন বাড়ির মধ্যেই। কিছুক্ষণ পরে দত্ত মহাশয়ের মেয়েআসিয়া বলিল, বাবা বললেন, আপনি কিছু খেয়ে যান—

—কি খাব এখন?

—পরোটা ভেজেচি খানকতক, আপনি আর বাবা খাবেন—ভাত খাননি ওবেলা, খিদেপেয়েচে—

বিপিন স্বাস্থ্যবান যুবক, সত্যই তাহার ক্ষুধা পাইয়াছিল। এ সব ধরনের মেয়েমানুষে মনের কথা জানিতে পারে—মানীকে দিয়া সে দেখিয়াছে। অগত্যা সে বাড়ির ভিতর উঠিয়া গেল। মেয়েটি ওবেলার মতো যত্ন করিয়া খাওয়াইল—কিন্তু খুব বেশি কথা বলিল না, বোধহয় দত্ত মহাশয় আছেন বলিয়াই।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, আপনার ওবেলা খাওয়া হয়নি বলে আমি ঘুম থেকে উঠেই দেখিআমার মেয়ে ময়দা মাখতে বসেছে। আমি তো বিকেলে কিছু খাইনে। বললাম, কি হবে রেময়দা এখন? তাই বললে, ডাক্তারবাবু ওবেলা ভাত খাননি, ওঁর জন্যে খানকতক পরোটাভাজব। আমি তো তাতেই জানলাম।

ইতিমধ্যে গ্লাসে করিয়া একবার জল দিতে দত্ত মহাশয়ের মেয়ে কাছে আসিল। তাহার দিকে একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বিপিনের মন শ্রদ্ধায় ও স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল।মেয়েটি দেখিতে ভালই, মুখশ্রীও বেশ। এই নিঃসঙ্গ প্রবাস-জীবনে এমন একটি স্নেহপরায়ণা নারীর সান্নিধ্য পাওয়া সত্যই ভাগ্যের কথা।

বৈকালে সে নদীর ধার হইতে বেড়াইয়া আসিয়া চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়াছে। মেয়েটি আসিয়া বলিল, চা খাবেন?

বারবার তাহাকে খাটাইতে বিপিনের কুণ্ঠা হইল। সে বলিল, না থাক। একটা পানবরং—

পান তো আনবই, চা-ও আনি। আপনি লজ্জা করেন কেন? চা তো আপনি খান—বললেই তৈরি করে দিই।

মিনিট কুড়ি পরে বিপিন চা খাইতে খাইতে মেয়েটির সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিল। অত্যন্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল, ইহার কাছে মানীর কথা বলিবার জন্য। এর মন সহানুভূতিতে ভরা, এতাহার মনের কষ্ট বুঝিবে। বলিয়াও সুখ।

ইচ্ছা হইল বলে—শোনো শান্তি, তোমার মতো একটি মেয়ের সঙ্গে আমার খুব আলাপ।সে আমাকে খুব ভালবাসে, তোমার মতোই করুণাময়ী, মমতাময়ী সে। আজ তোমার সেবাযত্ন দেখে তার কথা কত মনে হচ্ছে জানো শান্তি ?

শান্তি বলিবে, বলুন না তার কথা, বড় শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে—

তারপর চোখে আগ্রহভরা দৃষ্টি লইয়া শান্তি তাহার সামনে বসিয়া পড়িবে, আর সে মানীর সহিত তাহার বাল্যের পরিচয়ের কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার সহিত শেষসাক্ষাতের দিনপর্যন্ত সব কথা বলিয়া যাইবে। বৈকাল উত্তীর্ণ হইয়া সন্ধ্যা নামিবে, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া নামিবে জ্যোৎস্নারাত্রি, বাঁশবনের মাথায় জ্যোৎস্নালোকিত আকাশে দু'দশটা নক্ষত্র উঠিবে, গাছপালা হইতে টপটপ করিয়া শিশির ঝরিয়া পড়িবে, গ্রাম নিষুতি নিস্তব্ধ হইয়া যাইবে, ডোবার ধারের জগডুমুর গাছের খোড়লে রোজকার মতো লক্ষ্মীপেঁচাটা ডাকিবে, তখনও শান্তিগালে হাত দিয়া তন্ময় হইয়া এই অপূর্ব কাহিনী শুনিয়া যাইতেছে ও মাঝে মাঝে আর্দ্র চক্ষু আঁচল দিয়া মুছিতেছে, আর সে অনবরত বলিয়াই চলিয়াছে—তবুও হয়তো বলা শেষ হইবে না, হয়তো বা বলিতে বলিতে পুবে ফরসা হইয়া যাইবে, কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিবে, ভোরের কুয়াশায় মালার ধারের আম-শিমুলের বাগান অস্পষ্ট দেখাইবে, অথচ শান্তি উঠিবেনা, শেষ পর্যন্ত ঠায় বসিয়া শুনিবে।

একথা বলা যায় কার কাছে? যে মন দিয়া শোনে, যে ভালবাসে, সহানুভূতি দেখায়—যার মনে স্নেহ আছে, দয়া আছে, মায়া আছে, সে বুঝিবে, অন্যে কি বুঝিবে?

তেমনি মেয়ে এই শান্তি।

কোন্ দূর নক্ষত্রের দেবলোক হইতে শান্তির মতো মেয়েরা, মানীর মতো মেয়েরাপৃথিবীতে জন্ম নেয়!

চা খাওয়া হইলে শান্তি পান আনিল।

বিপিন বলিল, তুমি এখানে আর কতদিন থাকবে শান্তি?

—এ মাসটা আছি।

—তুমি চলে গেলে আমার বড় খারাপ লাগবে—

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু বিপিনের মনে হইল, মেয়েটিকে এরূপ বলা উচিত হয়নাই। এসব ধরনের কথা বলা হয়, যখন পুরুষ নারীমনের মুকুলিত প্রেমকে ফুটাইতে চায়। বিবাহিতা মেয়ে, কাল শ্বশুরবাড়ি চলিয়া যাইবে—প্রেম জাগিলে মেয়েটিই কষ্ট পাইবে। বিপিন আর ও-পথে পা দিবে না। মেয়েটি বোধহয় সহজ ভাবেই কথাটা গ্রহণ করিল, নতুবা তাহারচোখে লজ্জা ঘনাইয়া আসিত। মানীকে দিয়া বিপিন ইহা অনেকবার দেখিয়াছে।

সে সরল ভাবেই বলিল, কেন?

বিপিন ততক্ষণে সামলাইয়া লইয়াছে। হাসিয়া বলিল—দুধচিঁড়ের ফলার ঘনঘন যোগাড়হবে না!

বলিয়াই যেন পূর্ব কথাটা পেটুক লোকের খেদোক্তি ছাড়া আর কিছুই নহে, প্রমাণকরিবার জন্য সে নিজেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অনেক সময় প্রেম আসে করুণা ও সহানুভূতির ছদ্মবেশে। দত্ত মহাশয়ের মেয়ে সরলাপল্লীবালা, লোককে খাওয়াইয়া মাখাইয়া সে হয়তো খুশি—একটা লোক কোনো একটা বিশেষ জিনিস খাইতে ভালবাসে, অথচ সে চলিয়া গেলে লোকটা তাহার প্রিয় সুখাদ্য হইতে বঞ্চিত হইবে ইহা তাহার মনে সত্যকার করুণা জাগাইল!

সে মনে মনে ভাবিল, আহা, ডাক্তারবাবু সরু ধানের চিঁড়ে খেতে এত ভালবাসেন! আমি চলে গেলে কে দেবে? উনি যে মুখচোরা, কাউকে বলতেও পারবেন না!

মুখে বলিল, আমার শ্বশুরবাড়িতে কনকশাল ধানের চিঁড়ে হয়, খুব ভাল সরু চিঁড়ে আর কি সুগন্ধ! চিঁড়ে ভেজালে গন্ধ ভুরভুর করে ঘরে। আমাদের বাড়ির চেয়েও ভাল। আমি গিয়ে আপনার জন্যে পাঠিয়ে দেব।

বিপিন ভাবিল, তা দেবে তা জানি। তোমাদের আমি চিনি।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল দেখিয়া শান্তি দ্রুতপথে সন্ধ্যাপ্রদীপ দিতে গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১

সেই দিনের ব্যাপারের পর হইতে বছরখানেক কাটিয়া গিয়াছে, পটল আর বীণার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করে নাই। ইহাতে প্রথম প্রথম বীণা খুব স্বস্তি অনুভব করিল। কিন্তু সপ্তাহ যখনপক্ষে এবং পক্ষ যখন মাসে, এমন কি বৎসরে পরিবর্তিত হইতে চলিল— পটলের টিকিকোনোদিকে দেখা গেল না, তখন বীণার মনে হইল তাহার মনের এই যে নিরঙ্কুশ স্বস্তি, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সহজলভ্য জিনিস—বিধবা হইয়া পর্যন্ত এই বৈচিত্র্যহীন স্বস্তি সে বরাবর ইস্তকনাগাৎ পাইয়া আসিয়াছে—ইহার মধ্যে কিছু নূতনত্ব নাই। নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য যাহার মধ্যে ছিল, তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

খুব অল্পদিনের জন্য—কতদিন? বছর দুই? হাঁ, প্রায় দুই বছরের জন্য তাহার জীবনে এই অনাস্বাদিতপূর্ব বৈচিত্র্য দেখা দিয়াছিল। পটলদা তাহাদের বাড়িতে আসে—আসিত, মায়ের সঙ্গেকি বলাইয়ের সঙ্গে গল্প করিয়া হয়তো বা একটা পান কিংবা একগ্লাস জল, কখনো বা দুই-ই, চাহিয়া খাইয়া চলিয়া যাইত।

মায়ের ডাকে বীণাই পান-জল আনিয়া দিত—কেননা মনোরমা ঘরের বউ, স্বামীরবন্ধুস্থানীয় লোকের সম্মুখে বাহির হইবার নিয়ম তাহাদের সংসারে নাই।

হয়তো পান দিতে আসিয়া পটল দুই-একটা কথা বলিত, বীণা জবাব দিত। হয়তো পটলএক আধটা ছোটখাটো গল্প করিল, বীণা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিত—ভাল লাগিত শুনিতে। হয়তো মা উঠিয়া যাইতেন সন্ধ্যাহ্নিক করিতে—বীণা ও পটল রোয়াকে পরস্পরের সঙ্গেকথাবার্তা বলিত।

ক্রমে পটলদা যেন একটু ঘনঘন আসিতে আরম্ভ করিল। পটলের সাড়া পাইলে বীণারও যেন কি হয়। তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে, রান্নাঘরে বউদিদির কাছে বসিয়া কুটনা কুটিতে, কি তেঁতুল কাটিতে, কি বাটনা বাটিতে আর ভাল লাগে না। ছুটিয়া গেলে কে কি মনে করিবে, ধীরে ধীরেই যাইত—অন্য ছুতায় যাইত।

—মা, আজ কি বেগুন পোড়াতে আছে? বউদিদি বলছিল, আমি বললাম, আজ বুধবার, দাঁড়াও, জিগ্যেস করে আসি।

—আচ্ছা মা, পাকানো সলতেগুলো কুলুঙ্গিতে রেখে দিইচি, তার কি একটাও নেই—তুমি নাওনি?

—তোমার কলসিতে জল আনতে হবে না মা? বলো তো এখুনি আনি, আবার সন্ধেহয়ে গেলে তখন—

ইত্যাদি, ইত্যাদি।

তারপর কে জানে আধঘণ্টা, কে জানে একঘণ্টা, সে আর পটলদা গল্পই করিতেছে, গল্পই করিতেছে। যতক্ষণ পটলদা বাড়িতে থাকিবে বীণা নড়িতে পারিত না সেখান হইতে।

ক্রমে পটলদা চাহিত একটু আড়ালে দেখা করিতে, বীণা তাহা বুঝিত।

বীণার কৌতূহল তখন বেশ বাড়িয়াছে, পুরুষমানুষ একা থাকিলে কি রকম কথাবার্তা বলে। পটলদা মজার মজার কথা বলে বটে। বীণার হাসি পায়, আনন্দও হয়। মা উপস্থিতথাকিলে পটলদা এ ধরনের কথা বলে না। হয়তো বীণার শোনা উচিত নয় এসব কথা, কিন্তু লাগে মন্দ নয়।

তারপর গ্রামে কথা উঠিল, দাদা বাড়ি আসিয়া তাহাকে ডাকিয়া বুঝাইলেন, বউদিদিইদাদার কানে উঠাইল এসব কথা, বলাই মারা গেল, পটলদা সন্ধ্যার সময় ছাদের পাশে বাগানেঅন্ধকারে লুকাইয়া দেখা করিতে শুরু

করিল, তাহাও একদিন বউদিদির চোখে গেল পড়িয়া—বীণার জীবনে সুখ নাই, আনন্দ নাই কোনোদিক হইতে। একটুকু আলো আসিতে সবে আরম্ভ করিয়াছে—যাই—অমনি সবাই মিলিয়া হৈ-হৈ করিয়া জানালা সশব্দে বন্ধ করিয়া দিল।

২

সেদিন একাদশী।

বীণা সারাদিন মায়ের সঙ্গে নির্জলা একাদশী করিয়া সন্ধ্যাবেলা মায়ের অনুরোধে একটুদুধ ও দুই-একটা ফল খায়। একদিন ঘরে ফলের যোগাড় ছিল না—পাড়াগাঁয়ে থাকেনা—মনোরমা বৈকালে বলিল, ও ঠাকুরঝি, মনুর মার কাছ থেকে এক পয়সার পাকা কলা নিয়েএসো তো? আমি ঘাটে বলেছি ওকে। গিয়ে নিয়ে এসো।

বীণা এ-পাড়ার সকলের বাড়িতেই একা যাতায়াত করে—ও-পাড়ায় কখনও একা যায় না।মনুর মা থাকে এই পাড়ারই সর্বশেষ প্রান্তে, মধ্যে পড়ে ছোট একটা আমবাগান, সেটা পূর্বেছিল বীণার বাবা বিনোদ চাটুজ্জের নীলাম-খরিদা সম্পত্তি, আবার ওপাড়ার শ্রীশ বাঁড়ুজ্জে বিপিনের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইয়াছেন। একটি আমগাছের নাম 'সোনাতলী, বীণা ছেলেবেলায় এখানে আম কুড়াইতে আসিত—যখন তাহাদের নিজেদের বাগান ছিল। যাইতে যাইতে সে ভাবিল—কি চমৎকার আম ছিল সোনাতলীর! কত বছর এ গাছের আম খাইনি—এবারে খুড়িমাদের কাছ থেকে দুটো চেয়ে আনব আমের সময়।

হঠাৎ সে দেখিল পটলদা বাগানের পথ দিয়া বাগানে ঢুকিতেছে। বীণার বুকের রক্ত যেন টল্ খাইয়া উঠিল। এখন সে কি করে? বাড়ি ফিরিয়া যাইবে? পটলদা তাহাকে দেখিতে পায়নাই—কারণ সে বাগানের কোনাকুনি পথটা বাহিয়া বোধ হয় মুচিপাড়ার দিকে যাইতেছে।

পটলদার সঙ্গে কতকাল দেখা হয় নাই!

হঠাৎ বীণা নিজের অজ্ঞাতসারে ডাক দিল, ও পটলদা?

পটল চমকিয়া উঠিয়া চারিদিকে কেমন করিয়া চাহিতেছে দেখিয়া বীণার হাসি পাইল।

—এই যে, ও পটলদা!

পটল বিস্মিত ও আনন্দিত মুখে কাছে আসিল।

—তুমি? কোথায় যাচ্ছ?

—যেখানেই যাই, তুমি ভাল আছ?

—তাতে তোমার কি? আমি মরে গেলেই বা তোমার কি?

—বাজে বোকো না পটলদা। ওসব কথা বলতে নেই।

—কতদিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা হল!

বীণা চুপ করিয়া রহিল।

—আমার কথা একটুও ভাবতে বীণা, সত্যি বল!

—বলে লাভ কি পটলদা? যা হবার হয়েগিয়েছে।

—আমিও তো সেইজন্যে আর যাই না। তোমার নামে কেউ কিছু বললে আমার ভাল লাগে না। তাই ভেবে দেখলাম, দেখা না করাই ভাল, কিন্তু তা বলে ভেবো না যে তোমায় ভুলেগিয়েছি।

বীণা কোনো কথা বলিল না।

পটল বলিল, আচ্ছা বীণা, তুমি যেখানে যাচ্ছ যাও—আমবাগানের মধ্যে কথা কইতেদেখলে কে কি ভাববে—যে আমাদের গাঁয়ের লোক—এসো তুমি—

—তুমি আজকাল সেই কোথায় চাকরি করতে সেখানে করো না? —সে চাকরি গিয়েছে। এখন বসে আছি।

—কতদিন চাকরি নেই?

—প্রায় তিন মাস। সংসারে বড় টানাটানি চলেছে—তাই যাচ্ছি মুচিপাড়ায় রঘু মুচির কাছে কিছু খাজনা পাব—গিয়ে বলি, খাজনা না দিস তো দুখানা গুড়ই দে।

—আচ্ছা, এসো পটলদা।

৩

বীণা বাড়ি ফিরিয়া সারাদিন কেমন অন্যমনস্ক রহিল। পটলদার চাকুরি গিয়াছে। তাহার সংসারেবড় কষ্ট। ইচ্ছা হয়—কিন্তু সে ইচ্ছায় কি কাজ হইবে? ইচ্ছা থাকিলেও বীণার এক পয়সাদিয়াও সাহায্য করিবার সামর্থ্য নাই।

তাহাকে কি পটলদা কিছু দিয়াছিল?

প্রথমে বীণা লইতে রাজী হয় নাই। বিধবা মানুষে সাবান কি করিবে? একশিশি গন্ধ তেলশেষ পর্যন্ত লইয়াছিল, লুকাইয়া লুকাইয়া নারিকেল তৈলের সঙ্গে মিশাইয়া একশিশি গন্ধতেল দুই তিন মাস চালাইয়াছিল।

এক-আধটা সহানুভূতির কথা বলা উচিত ছিল। ভুল হইয়া গিয়াছে, অত তাড়াতাড়িআমবাগানের মধ্যে কি সব কথা মনে আসে? পটলদার সংসারটি নিতান্ত ছোট নয়, বেচারিচালাইতেছে কি করিয়া? আহা!

সন্ধ্যাবেলার দিকে মনোরমা নদীর ঘাট হইতে আসিল। ছেলেমেয়ে খাইখাই করিয়াজ্বালাতন করিতেছে, মনোরমা বলিল, ঠাকুরঝি, ওদের জন্যে একখোলা চাল ভেজে দাও না? ভাত হতে এখন অনেক দেরি। খাক ততক্ষণ গুড় দিয়ে। মরছে খিদে খিদে করে।

বীণা বলিল, কোন্ চাল ভাজব বউদি? সেদিনকের সেই মোটা নাগরা আছে, দিব্যিফোটে—তাই ভাজি, হ্যাঁ?

বীণার মা বলিলেন, আগে সন্ধেটা দেখা না তোরা, অন্ধকার তো হয়ে গেল মা—আরকখন—

মনোরমা ভিজা কাপড় ছাড়িয়া ফর্সা কাপড় পরিয়া উঠানের তুলসীতলায় প্রদীপ দিতেগিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল, ও ঠাকুরঝি, আমায় কিসে কামড়াল, শীগ্‌গির এসো—

বীণা রান্নাঘর হইতে ছুটিয়া গেল, কি হল বউদি?

সে রোয়াক হইতে উঠানে পা দিবার পূর্বেই মনোরমা আবার চিৎকার করিয়া উঠিল, সাপ! সাপ! অজগর গোখরো—গোলার পিঁড়ির মধ্যে, ও মা, ও ঠাকুরঝি—

বীণা ততক্ষণ ছুটিয়া মনোরমার কাছে গিয়া পৌঁছিয়াছে, কিন্তু সে কিছু দেখিতে পাইলনা। মনোরমা উঠানে বসিয়া পড়িয়াছে, তাহার হাতের সন্ধ্যাপ্রদীপ ছিটকাইয়া উঠানে পড়িয়াতেল সলিতা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

মনোরমা বলিল, আমার গা ঝিম্‌ঝিম্ করছে ঠাকুরঝি—আমায় ধরো।

বীণার মা বলিলেন, শীগ্‌গির কেষ্ট ঠাকুরপোকে ডাক, জীবনের মাকে ডাক, ওমা, আমারকি হল গো, যা যা শীগ্‌গির যা, হে ঠাকুর হে হরি, রক্ষে করো বাবা—

বীণা বলিল, চেঁচিও না মা, আমি ডেকে আনছি, এখানে তার আগে দুটো বাঁধন দিই, গামছাখানা দাও—

মিনিট পনেরোর মধ্যে গাঁয়ে রাষ্ট্র হইয়া গেল বিপিনের বউকে সাপে কামড়াইয়াছে এবংসঙ্গে সঙ্গে এপাড়া ওপাড়ার লোক ভাঙিয়া পড়িল বিপিনদের উঠানে। ভীম জেলে ভাল ওঝা, সে আসিয়া গাঁটুলি করিল, মন্ত্র পড়িল, ঝাড়ফুঁক চালাইল, মনোরমা অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার মাথায় ঘড়া করিয়া জল ঢালা হইয়াছে, তাহার মাথার দীর্ঘ কেশরাশি জলে কাদায়লুটাইতেছে, সেদিকে তখন কাহারও লক্ষ্য করিবার অবকাশ ছিল না। রোগিণীর অবস্থা লইয়াসকলে ব্যস্ত।

কৃষ্ণলাল মুখুজ্জে বলিলেন, সতীশ ডাক্তারের কাছে কে গেল? ও হরিপদ, তুমি একবারসাইকেলখানা নিয়ে ছোট!

পটলও আসিয়াছিল, সে ভাল সাইকেল চড়িতে জানে, বলিল, আমি যাচ্ছি কাকা। হরিপদভাই, তোমার সাইকেলখানা—

বীণা দেখা গেল খুব শক্ত মেয়ে। সে অমন বিপদে হাত-পা হারায় নাই, ছুটাছুটি করিয়া কখনও জল, কখনও নুন, কখনও দড়ি আনিতেছে, সম্প্রতি বউদিদির মাথাটা উঠানেলুটাইতেছে দেখিয়া সে মাথা কোলে লইয়া শিয়রের কাছে আসিয়া বসিল।

বিপিন দুপুরের পূর্বেই সোনাতনপুর হইতে রওনা হইয়া হাঁটিয়া আসিতেছিল, বেলা ছোট, আমতলীর বাঁওড়ের কাছে আসিতেই অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল।

বিড়ি নাই পকেটে, ফুরাইয়া গিয়াছে, পথের পাশেই শরৎ ঘোষের মুদির দোকান। এখনওপ্রায় আধক্রোশ পথ বাকি তাহাদের গ্রামে পৌঁছিতে, বিড়ি কিনিতে সে দোকানে ঢুকিল। শরৎবলিল, দাদাঠাকুর এলেন নাকি আজ? তামাক ইচ্ছে করুন—বসুন, বসুন।

—না আর তামাক খাব না, সন্ধে হয়ে গিয়েছে, এক পয়সার বিড়ি দাও আমায়।

—তা দিচ্ছি, দাদাঠাকুর বসুন না। তামাকটা খেয়ে যান, এতটা হেঁটে এলেন।

বিপিন তামাক খাইতে খাইতে বলিল, আখের গুড়ে এবার কেমন হল শরৎ?

—কিচ্ছু না, কিছু না দাদাঠাকুর। পুঁজিপাটা সব খেয়ে গেল—স' ন' আনা মণ কিনলামবেচলাম সাড়ে সাত, আট। সেদিন আর নেই দাদাঠাকুর, ডাহা লোকসান। তবে কি করি, লেখাপড়া তো শিখিনি আপনাদের মতো, খাই কি করে বলুন?

—আইনদ্দি চাচার খবর জানো? ভাল আছে?

—বেশ আছে, পরশু বেলতলার মাঠে বিচুলি তুলতে গিয়ে দেখি বুড়ো দিব্যি খুঁটিরমতো বসে ধানের শাল পাহারা দিচ্ছে।

—আচ্ছা, আসি শরৎ।

—দাঁড়ান দাদাঠাকুর, পাকাটির মশাল আমার করাই আছে, একটা জ্বেলে নিয়ে যান—ওরে, নিয়ে আয় তত গোলার তলা থেকে একটা মশাল! ক'দিন থাকবেন বাড়ি?

—থাকব আর কই? তিন চার দিনের বেশিরুগীপত্তর ফেলে—

সদর রাস্তা দিয়া গেলে খুব ঘুর হয় বলিয়া সে গ্রামে ঢুকিয়াই নদীর ধারের রাস্তাটা ধরিল।এ দিকটা জনহীন, শুধু বৈঁচিবন, নিবিড় বাঁশবন ও আমবাগান। সন্ধ্যার পর বাঘের ভয়ে এপথে বড় কেহ একটা হাঁটে না,

যদিও বাঘ নাই, কিংবা কালেভদ্রে এক-আধটা কেঁদো বাঘবাহির হইবার জনশ্রুতি শোনা যায় মাত্র। সুতরাং বিপিনের সহিত কাহারও দেখা হইল না।

বাড়ির কাছাকাছি তাহাদের নিজেদের জমির সীমানায় ঘাটের পথের চালতা গাছটার তলায় যখন সে পৌঁছিয়াছে, তখন একটা গোলমাল ও কান্নার রব তাহার কানে গেল। কোনদিক হইতে শব্দটা আসিতেছে ভাল ঠাহর করিতে পারিল না। একটু আশ্চর্য হইয়া চারিদিকে চাহিয়াশুনিল।

এ কি! তাহাদেরই বাড়ির দিক হইতে শব্দটা আসিতেছে না? তাহার বুকের ভিতরটা এক মুহূর্তে যেন ভয়ে অসাড় হইয়া গেল। কি হইয়াছে তাহাদের বাড়িতে? না—তাহাদের বাড়ি নয়, এ যেন কেষ্ট কাকাদের কিংবা পরাণ নাপিতের বাড়ির দিক হইতে—তাই হইবে, তাহাদের বাড়ি নয়। পরক্ষণেই সে দ্রুতপদে দুরুদুরু-বক্ষে বাড়ির দিকে প্রায় ছুটিতে ছুটিতে চলিল।

আর কিছু দূর গিয়া বিপিনের আর কোনো সন্দেহ রহিল না। এ কান্নার রব যে তাহারমায়ের গলার! পাগলের মতো ছুটিতে ছুটিতে সে বাড়ির পিছনের পথে আসিতেই তাহাদেরউঠানে ভিড় দেখিতে পাইল। তাহাকেও দুই-চারজন দেখিয়াছিল, তাহারা ছুটিয়া আসিল তাহার দিকে। সর্বাগ্রে ছুটিয়া আসিলেন কৃষ্ণলালমুখুজ্জে।

—এসো এসো বিপিন, বড় বিপদ—এসো—

বিপিনের গলা দিয়া যেন কথা বাহির হইতেছে না, ভয়ে ও বিস্ময়ে সে কেমন হইয়াগিয়াছে। বলিল, কি—কি কেষ্ট কাকা, ব্যাপার কি?

ভিড়ের ভিতর হইতে বীণা কাঁদিয়া উঠিল, ও দাদা, শীগ্‌গির এসো, বউদিদি যে আমাদের ছেড়ে চলে গেল গো!

মনোরমা! মনোরমার কি হইয়াছে? বিপিন ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা না করিয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া ইহার উহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল। দুই-তিনজন হাত ধরিয়া তাহাকেলইয়া গেল।

কে একজন বলিয়া উঠিল, আহা, সতীলক্ষ্মী বউ বটে, স্বামীও একেবারে ঠিক সময়ে এসে হাজির—এদেরই বলে সতীলক্ষ্মী।

বিপিন গিয়া দেখিল উঠানে তুলসীতলার কাছেই মনোরমা মাটিতে শুইয়া। মাথার চুল মাটিতে লুটাইতেছে। সারাদেহ অসাড়, নিস্পন্দ।

বিপিন আর যেন দাঁড়াইতে পারিল না। বলিল, কি হয়েছে কেষ্টকাকা?

—সাপে কামড়েছিল। যাচ্ছিলেন বউমা পিদিম দিতে নাকি তুলসীতলায়—

চার-পাঁচজন লোক একসঙ্গে ঘটনাটা বলিতে গিয়া পরস্পরকে বাধা দিতে লাগিল। বিপিনের মা তাহাকে দেখিয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বীণা কাঁদিতে লাগিল।

বিপিন নাড়ী দেখিয়া বলিল, নাড়ী নেই বটে—কিন্তু কেষ্ট কাকা, এ মরেনি এখনও।বীণা, শীগ্‌গির জল গরম করে নিয়ে আয়—সতীশ ডাক্তারের কাছে একজন যা তো কেউ—

বলিতে বলিতে সতীশ ডাক্তারকে লইয়া পটল আসিয়া উপস্থিত হইল।

সতীশ ডাক্তার ও বিপিন দুইজনে কিছুক্ষণ দেখিল। বিপিন বলিল, আশা আছে বলে মনে হচ্ছে না কি? ইথার ইন ক্লোরোফর্ম দিয়ে দেখা যাক নাড়ী আসে কিনা—এ রকম রোগী আমিএকটা দেখেছিলাম, অবিকল এই লক্ষণ—এ মরেনি এখনও।

—ইথার ইন ক্লোরোফর্ম দিয়ে কি হবে? দ্যাখো দিয়ে—

—এ মরেনি সতীশবাবু। কতকটা ভয়ে, কতকটা বিষের ক্রিয়ায় এমন হয়েছে—আমারমনে হয় গোখরো সাপ নয়—এ ঠিক শেকড়চাঁদা সাপ—এই রকম লক্ষণ সব প্রকাশ পায়। কেউদেখেছিল সাপটা?

বীণা বলিল, বউদিদি বলেছিল অজগর গোখরো সাপ—গোলার পিঁড়িতে ছিল— আমিকিছু দেখিনি অন্ধকারে—

সতীশ ডাক্তার বলিলেন, ও কিছু না, ভয়ে অনেক সময় এ রকম হয়। উনি ভয়ে তখনচারিদিকে গোখরো সাপ তো দেখবেনই। অন্ধকারে কি দেখতে কি দেখেছেন—

মনোরমাকে ধরাধরি করিয়া রোয়াকে লইয়া যাওয়া হইল।

অনেক রাত পর্যন্ত সতীশ ডাক্তার রহিল। পটল যথেষ্ট উপকার করিল, ছোটাছুটি করা, ইহাকে উহাকে ডাকাডাকি করা। রাত দুপুর পর্যন্ত সে বিপিনদের বাড়িতেই রহিল। বিপদের সময় অন্য কথা মনে থাকে না—গরম জল আনিতে পটল কতবার রান্নাঘরে গেল—বীণাসেখানে একাই ছিল, ছেলেমেয়েদের ও দাদার জন্য রান্না না করিলে তাহারা খাইবে কি? বীণারমা বউয়ের শিয়রে সন্ধ্যা হইতে বসিয়া আছেন আর হাপুস নয়নে কাঁদিতেছেন।

৪

চারদিন পরে বিপিন মনোরমাকে বলিল—কাল যাব গো, এসেছিলাম দুটো দিন থাকববলে—তুমি যে ভয় দেখিয়ে দিলে, তাতে দেরি হয়েই গেল এমনি—

মনোরমা হাসিয়া বলিল, ম'লেই বেশ হোত, না?

—না, না, ওসব কথা বলতে নেই। ঘরের লক্ষ্মী মরতে যাবে কেন? ছিঃ !

মনোরমা একটু অবাক হইয়া স্বামীর দিকে চাহিল। এত আদরের কথা সে স্বামীর মুখেকতকাল শোনে নাই! ভাগ্যিস সাপে কামড়াইয়াছিল! উঃ—

মুখে বলিল, ছেলেমেয়ে দুটো ছোট ছোট—নয়তো আর কি! তোমায় রেখে যেতে পারাতো ভাগ্যির কথা গো!

বিপিন বলিল, আর আমার জন্যে বুঝি কিছু না ?

মনোরমা হাসিল। সে গুছাইয়া কথা বলিতে পারে না কোনো কালেই, মনের মধ্যে কি আছে বুঝাইতে পারে না। সে বোঝে কাজকর্ম, খাওয়ানো মাখানো, নিখুঁতভাবে সংসারচালানো। স্বামীকে সে ভালবাসে কি না বাসে, তা কি মুখে বলা যায় ? ছেলেমেয়ের মা, এখনসে গিন্নিবান্নি মানুষ, অমন ইনাইয়া বিনাইয়া কথা বলা তাহার আসে না।

বলিল, না গো তা নয়। আমি মরে গেলে তুমি আর একটা বিয়ে করে সুখী হতেপারো—কিন্তু ওরা আর মা পাবে না।

বিপিন দুঃখিত হইল। সত্যই আজ যদি মনোরমা মারা যাইত! কখনও সে মনোরমাকে একটা মিষ্টি কথা কি ভালবাসার কথা বলিয়াছে? না পাইয়া না পাইয়া মনোরমার সহিয়াগিয়াছে। ওসব আর সে প্রত্যাশা করে না, পাইলে অবাক হইয়া যায়। মনে ভাবিল—আমারহাতে পড়ে ওর দুর্দশার একশেষ হয়েছে। ভাল খাওয়া কি ভাল কাপড় একখানা কোনোদিন—বা কখনও কিছু দেখলেও না। সংসারের হাঁড়ি ঠেলে আর বাসন মেজে জীবনটাকাটল ওর।

সে বলিল, হ্যাঁ ভাল কথা, কাল দুটো ভাত সকালে সকালে যেন হয়। পিপলিপাড়া যাবকাল।

মনোরমা বলিল, তা কেন? কাল যেও না। বিদেশে থাকো, একদিন একটু পিঠে-নাটা করি, সেখানে কে করে দিচ্ছে, খেয়ে যেও।

বিপিন জানে মনোরমা মিষ্টি কথা কহিতে জানে না বটে, কিন্তু এ সব দিকে তাহার খুবলক্ষ্য। কিন্তু তাহার থাকিবার উপায় নাই। মনোরমাকে বুঝাইয়া বলিল, হাতে রোগী আছে, পিঠে খাইবার জন্য বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

হাসিয়া বলিল, যাবে আমার সঙ্গে সেখানে? চলো পিঠে খাওয়ানোর লোক নিয়ে যাই—

মনোরমা বলিল, ওমা, আমি আবার বুড়োমাগী সংসার ফেলে, গরুবাছুর ফেলে, মা বীণাএদের রেখে তোমার সঙ্গে বাসায় যাব কি করে?

যেন এ প্রস্তাবটা নিতান্তই আজগুবি।

মনোরমা বলিতে পারিত, চলো তোমার সঙ্গেই যাই, তুমি যেখানে নিয়ে যাবে সেখানেইযাব। তোমার কাছে আমার কেউ নয়!

বিপিনের খুব ভাল লাগিত তাহা হইলে।

বিপিন ভাবিল—মনোরমার শুধু সংসার আর সংসার! ওই এক ধরনের মেয়েমানুষ—

৫

পিপলিপাড়ায় পৌঁছিল প্রায় সন্ধ্যাবেলা। দত্ত মশায় বাড়ি নাই, আজ দিন দুই হইল বড় ছেলের শ্বশুরবাড়ি কুমারপুরে গিয়াছেন কি কাজে। দত্ত মহাশয়ের ছেলে অবনী তাহাকে দেখিয়া বলিল, এই যে ডাক্তারবাবু! দুটো রুগী এসে ফিরে গিয়েছে কাল। এত দেরি হল যে? হাত-পা ধুয়েবিশ্রাম করুন।

অন্ধকার হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ পরে শান্তি এক হাতে একটি হ্যারিকেন লণ্ঠন ও অন্য হাতে একটা বাটিতে মুড়ি ও নারিকেলকোরা লইয়া আসিল। বাটিটা বিপিনের হাতে দিয়া হাসিমুখে বলিল, এত দেরি করলেন যে?

—উঃ, সে আর বোলো না শান্তি! কি বিপদেই পড়ে গিয়েছিলাম।

শান্তি উদ্বিগ্ন মুখে বলিল, কি? কি?

—আমার স্ত্রীকে সাপে কামড়েছিল।

—সাপে! কি সাপ?

—রক্ষে যে জাতসাপ নয়, শেকড়চাঁদা বলেই আমার ধারণা। সে কি ঘটনা হলশোনো—সেদিন তো এখান থেকে গেলাম সেই—

বলিয়া বিপিন সেদিনকার তাহার বাড়ি যাওয়ার পথে কান্নাকাটির রব শোনা হইতে আরম্ভকরিয়া সমস্ত ব্যাপারটা আনুপূর্বিক বলিয়া গেল, শান্তি অবাক হইয়া বসিয়া শুনিতে লাগিল।

বর্ণনা শেষ হইয়া গেলে শান্তি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, উঃ, ভগবান রক্ষে করেছেন।নইলে কি হোত আজ বলুন দিকি ? মুড়ি খান, আমি চা নিয়ে আসি—কি বিপদেই পড়েগিয়েছিলেন!

শান্তি চা আনিয়া দিল। বলিল, আজ আর রাঁধতে হবে না আপনাকে—আমাদের তোরান্না হবেই—ওই সঙ্গে আপনাকে দু'খানা পরোটা ভেজে দিতে এমন কিছু ঝঞ্ঝাট হবে না।

—রোজ রোজ তোমাদের ওপর—

—ওসব কথা বলবেন না ডাক্তারবাবু। আপনি পর ভাবেন, কিন্তু আমি—

—না না, সে কথা না—পর ভাবব কেন শান্তি ? তা হবে এখন—দিয়ো এখন—

শান্তি খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প করিল। কথা বলিয়া আনন্দ পাওয়া যায় ইহার সঙ্গে। বেশির ভাগ কথা মনোরমাকে লইয়াই। মনোরমার কথা আজ আসিবার সময় বিপিন সারাপথ ভাবিয়াছে। তাহার আকস্মিক মৃত্যুর সম্ভাবনাটা যতই মনে হইতেছে, বিপিনের মনততই মনোরমার প্রতি স্নেহে ও সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠিতেছে।

শান্তি বলিল, দেখাবেন একদিন বউদিদিকে?

—কি করে দেখাব শান্তি! সে তো এখানে আসছে না!

—আমায় একদিন নিয়ে চলুন সেখানে।

—তুমি যাবে কি করে?

—আপনার সঙ্গে যাব। গরুরগাড়ি একখানা না হয় দু'টাকা ভাড়া নেবে।

—আমার সঙ্গে একা যাবে?

—কেন যাব না?

বিপিন আশ্চর্য হইল শান্তির নিঃসঙ্কোচ ভাব দেখিয়া। মেয়েটি শুধু সরলা নয়, ইহার মনেসাহস আছে। অবশ্য সে শান্তিকে সত্যই লইয়া যাইতেছে না, বহু বাধা তাহাতে, সে জানে।তবুও শান্তি যে নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত যাইতে চাহিল—ইহাতেই উহার মনের পরিচয়পাওয়া যায়।

হঠাৎ শান্তি একটি ভারি ছেলেমানুষি প্রশ্ন করিল।

—আচ্ছা, পটলের ক্ষেতে মেয়েমানুষ যাওয়া বারণ কেন জানেন?

—তা তো জানি না শান্তি। তবে শুনেছি বটে—

বিপিন কারণটা খুব ভাল রকমই জানে সে পাড়াগাঁয়েরই ছেলে। কিন্তু শান্তির সামনে সেকথা বলিতে তাহার বাধিল।

শান্তি দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া বলিল, আমি জানি। বলব? মেয়েমানুষ অযাত্রা, পটলেরক্ষেতে ঢুকলে পটল ফলবে না—তাই নয় ? আচ্ছা, মেয়েমানুষ কি সত্যিই অযাত্রা?

বিপিন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। বলিল, কে বলেছে ওসব কথা? এ কথা তোমার মাথায় উঠল কেন হঠাৎ?

—না, কিছু না, এমনি মনে পড়ে গেল। আপনাদের গাঁয়ের দিকে এ নিয়ম আছে, না?

—শুনেছি বটে, বললাম তো। বলে বটে, তবে মেয়েরা অযাত্রা এ কথা যে কেউ বলুক, আমি বিশ্বাস করি না। মেয়েরা অনেক উপকার করেছে আমার জীবনে। এই ধরো, আমিতোমায় দিয়েই বলি—কেমন চিঁড়ের ফলার খাওয়ালে সেদিন—খেয়েদেয়ে নিন্দে করব এমনমহাপাতকী আমি নই।

বলিয়া বিপিন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শান্তি সলজ্জ হাসিমুখে বলিল, আপনার ওই এক কথা! যান!

—না, যাব কেন, আমি অনেয্য কথা কি বলেছি বলো। তোমার যত্নের কথা যখন ভাবিশান্তি, তখন—সত্যিই বলচি—অমন খাওয়ানো অন্ততঃ—

—আচ্ছা, আচ্ছা, থাক। আর আপনার ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমি যাই, বউদিদি একারান্নাঘরে—গিয়ে ময়দা মাখব—

—একটা পান পাঠিয়ে দিয়ো গিয়ে। পেয়ালাটা নিয়ে যাও।

—না থাকুক। আপনার পান নিয়ে আসি, পেয়ালা নিয়ে যাব। বিপিনের মনে একটি অদ্ভুত তৃপ্তি। এ ধরনের সেবা সে চায়—মানীই কেবল সে যামিটাইয়াছিল কিছু দিন—আবার এই শান্তি কোথা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে!

বেচারি মনোরমা এ ধরনটা জানে না। সেও সেবা করে, কিন্তু সে অন্যরকমের। তাহাপাইয়া এমন আনন্দ হয় না কেন?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

সেদিন সকালে বিপিন রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া ঔষধ বিক্রির হিসাবের খাতা দেখিতেছে, এমন সময় শান্তি পিছন হইতে একপ্রকার চুপিচুপিআসিল—উদ্দেশ্য বোধ হয় বিপিনকে চমকাইয়া দেওয়া বা অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার সাহচর্যের আনন্দ দান করা। উদ্দেশ্য খুব সুস্পষ্ট নাহইলেও সে এমনি প্রায়ই করে আজকাল। বিপিনও শান্তির সঙ্গে মিলিতে মিশিতে পূর্বের মতোসঙ্কোচ বা জড়তা অনুভব করে না।

সামনে ছায়া পড়িতেই বিপিন পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল শান্তি হাসিমুখে দাঁড়াইয়া। বিপিন কিছু বলিবার পূর্বে শান্তি বলিল—কি করচেন?

বিপিন বলিল—এসো শান্তি, হিসেব দেখচি—

—একটা কথা বলতে এলাম, কাল চলে যাচ্চি এখান থেকে—

বিপিন আশ্চর্য হইয়া বলিল কোথায়? কোথায় যাবে?

শান্তি হাসিতে হাসিতে বলিল—বাঃ, কোথায় কি! আমার যাবার জায়গা নেই! এখানে কি চিরকাল থাকব? বলেচি তো সেদিন আপনাকে!

—ও, শ্বশুরবাড়ি যাবে?

—হুঁ, উনি আসবেন কাল সকালে।

বিপিন চুপ করিয়া রহিল। দু-একটা কথা যাহা সে ঝোঁকের মুখে বলিতে যাইতেছিল চাপিয়া গেল। মেয়েদের ভালবাসা লইয়া সে আর নাড়াচাড়া করিবে না। যাহা হইয়াছে যথেষ্ট।শান্তি বিবাহিতা মেয়ে, তাহাকে সে কিছুই বলিবে না ওসব কথা। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষই কষ্টপায়। না, উহার মধ্যে আর নয়।

শান্তি যেন একটু দুঃখিত হইল। সে যাহা বিপিনের মুখে শুনিবার আশা করিয়াছিল তাহা না শুনিতে পাইয়া যেন নিরাশ হইয়াছে। বলিল—এখন আর অনেক দিন আসব না—

বিপিন বলিল—কবে আসবে?

—তার কিছু কি ঠিক আছে? তা বেশ, যখনই আসি, আসি আর নাই আসি, আপনারআর কি!

শান্তি এ ধরনের কথা কেন বলিতে আরম্ভ করিল হঠাৎ? কি জবাব দিবে এ কথার সে?

তবুও বিপিন বলিল—না, আমার কিছু নয়, আমার কিছু নয়, তোমায় বলেচে। আমারখাওয়ার মজাটা তো সকলের আগে নষ্ট হল!

—বউদিদিদের বলে যাচ্চি, সে-সবের জন্য কিছু কষ্ট হবে না আপনার। তা হলে আরকোনো কষ্ট রইল না তো?

বলা চলিত এবং বলিতেও ইচ্ছা হইতেছিল, শান্তি তুমি চলে গেলে আমার এ জায়গাআর ভাল লাগবে না। দিনের মধ্যে সব সময় তোমার কথা মনে হবে। কখন আমায় আবার এভাবে জড়ালে শান্তি ?

বিপিন সে ধরনের কথার ধার দিয়াও গেল না! বলিল—তা তোমাদের বাড়ি যত্নযথেষ্টই পেয়ে আসছি, তোমাদের বাড়িতে আশ্রয় না পেলে আমার এখানে ডাক্তারি করাই হোত না—

শান্তি মুখ ভার করিয়া বলিল—আপনার কেবল ওই সব কথা! কি করছি আমরা? আপনি ব্রাহ্মণ, আমরা আপনাকে আশ্রয় দিইচি—অমন কথা বুঝি লোকে বলে? সত্যি, বলবেনআর ও কথা, বলতে নেই।

পরদিন শান্তির স্বামী আসিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল। বিপিন ডিসপেন্‌সারি হইতে ফিরিয়া দুপুরে নিজের ছোট্ট চালায় রাঁধিতে বসিয়াছে, শান্তি সেখানে আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া দুই পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—যাচ্চি।

—যাচ্চি বলতে নেই, বলতে হয় আসচি।

—যদি আর না-ই আসি?

—বলতে নেই ও কথা। এসো, আসবে বৈ কি—

—বলচেন আসতে তো! তা হলে আসব, ঠিক আসব। শান্তি কথা শেষ করিয়া চলিয়াযাইতেছিল, বিপিনের মনে হঠাৎ বড় করুণা ও সহানুভূতি জাগিল ইহার উপর। যাইবার সময় একটা কথা শুনিয়া যদি সে খুশি হয়, আনন্দ পায়! মুখের কথা তো, কেন এত কৃপণতা!

সে বলিল—তুমি চলে যাচ্চ, সত্যি, মনটা খারাপ হয়ে গেল বড্ড।

শান্তি বিদ্যুৎবেগে ফিরিয়া দাঁড়াইল, বিপিনের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া এক ধরনের অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলিল—আপনার মন খারাপ হবে? ছাই!

বিপিন অবাক হইয়া গেল শান্তির চমৎকার ফিরিবার ভঙ্গিটি দেখিয়া।

সে উত্তর দিল—ছাই না, সত্য সত্য বলছি।

শান্তি হাসিমুখে বলিল—আচ্ছা আসি।

কথা শেষ করিয়া সে আর দাঁড়াইল না।

পলকে প্রলয় ঘটাইয়া দিয়া গেল শান্তি। ইহাও ওই শান্ত মেয়েটির মধ্যে ছিল! বিপিনভাবেও নাই কোন দিন। ওর এ অদ্ভুত নায়িকামূর্তি এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল কেমন করিয়া? মেয়েরাপারে—ওদের ক্ষমতার সীমা নাই। অবস্থাবিশেষে দশমহাবিদ্যার মতো এক রূপ হইতে কটাক্ষেঅন্য রূপ ধরিতে উহারাই পারে।

শান্তি চলিয়া গেলে গোটা বাড়িটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতে লাগিল। রোজ সন্ধ্যার সময় শান্তিচা করিয়া আনিত সে ডাক্তারখানা হইতে ফিরিলেই। আজ সন্ধ্যায় আর কেহ আসিল না। দত্তমহাশয়ের পুত্রবধূদের অত দায় পড়ে নাই। বিপিন নিজেই একটু চা করিয়া লইল। সংসারেরব্যাপারই এই, চিরদিন কেহ থাকে না। মানীকে দিয়াই সে জানে। জালে জড়াইব না বলিলেই কি না জড়াইয়া থাকা যায়? কোথা হইতে আসিয়া যে জোটে!

সন্ধ্যায় উনুনে হাঁড়ি চড়াইয়া বিপিন রান্নাঘরের বাহিরে আসিয়া খানিক বসিল। বেশজ্যোৎস্না উঠিয়াছে—তিন চার দিন আগেও শান্তি এ সময়টা তাহাকে চা দিতে আসিয়া গল্প করিয়াছে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, রোজই করিত। আজ সত্যই ফাঁকা ঠেকিতেছে, কিছু ভাল লাগিতেছে না। নিজের মনের অবস্থা দেখিয়া সে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেল। শান্তি তাহারকে? কেউ নয়, দু'দিনের আলাপ—এই তো কিছুদিন আগেও সে ভাবিত, মানীর মতোভালবাসা জীবনে আর কাহারও সঙ্গে কখনও হইবার নয়—হইবেও না। মানী ছাড়া আরকাহারও জন্য মন খারাপ হইতে পারে—এ কথা কিছুদিন পূর্বেও কেহ বলিলে সে কি বিশ্বাসকরিত? এখন সে দেখিয়া বুঝিতেছে মনের ব্যাপার বড়ই বিচিত্র, কেহই বলিতে পারে না কোন পথে কখন তাহার গতি!

বৃদ্ধ দত্ত মহাশয় ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে আজকাল সন্ধ্যার পর বাহিরে আসেন না। আজ কি মনে করিয়া তিনি বিপিনের রান্নাঘরে আসিয়া পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া খানিক গল্পগুজব করিলেন। শান্তির কথাও একবার তুলিলেন, মেয়েটি আজ চলিয়া গেল। কন্যা-সন্তানের মতো সেবা-যত্নকে করে, পুত্রবধূরাও তো আছে, তেমনটি আর কাহারও নিকট পাওয়া যায় না, ইত্যাদি।

বিপিন বলিল—শান্তি বড় ভাল মেয়েটি।

—অমন চমৎকার সেবা আর কারও কাছে পাইনে ডাক্তারবাবু। আমার এই বুড়ো বয়সে এক এক সময় সত্যই কষ্ট পাই সেবার অভাবে। কিন্তু ও এখানে থাকলে—আর ব্রাহ্মণের ওপরবড় ভক্তি। আপনার চাটুকু,

জলখাবারটুকুঠিক সময়ে সব দেওয়া, সেদিকে খুব নজর। বাড়িতেযদি কোনোদিন ভাল কিছু খাবার তৈরি হয়েছে, তবে আগে আপনার জন্যে তুলে রেখে দিত।

দত্ত মহাশয় উঠিয়া গেলে বিপিন খাইতে বসিবার উদ্যোগ করিল। এ সময়টা দু-একদিন শান্তি দালানের জানালায় দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিয়া বলিত, ও ডাক্তারবাবু, একটু দুধ আজ বেশিহয়েছে আমাদের, আপনার খাওয়া হয়েছে—না হয়নি? নিয়ে আসব?

মানী গেল, শান্তি গেল। এই রকমই হয়। কেহ টিকিয়া থাকে না শেষ পর্যন্ত।

২

পরদিন সকালে ডাক্তারখানায় আসিল ভাসানপোতা মাইনর স্কুলের সেই বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী। বিপিন তাহাকে দেখিয়া আশ্চর্য হইল। শেষবার যখন তাহার সঙ্গে দেখা, তখন মানীদের বাড়িসে চাকুরি করে, মানীর গল্প করিয়াছিল ইহার কাছে। বিশ্বেশ্বর আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল, তাহার অদৃষ্টে এ পর্যন্ত কোনো নারীর প্রেম জোটে নাই। বিশ্বেশ্বর কি করিয়া জানিল সেপিপলিপাড়ার হাটতলায় ডাক্তারখানা খুলিয়াছে!

বিশ্বেশ্বর বলিল—আপনি খবর রাখেন না বিপিনবাবু, আমি আপনার সব খবর রাখি। আপনাদের গাঁয়ের কৃষ্ণ চক্কোত্তির সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়—ভাসানপোতায় ওঁর বড়মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন না? তাঁর মুখেই আপনার সব কথা শুনেছি। তা আপনার কাছে এসেচি একটা বড়দরকারি কাজে। আপনাকে একটি রুগী দেখতে এক জায়গায় যেতে হবে!

বিপিন বলিল—কোথায়?

—এখান থেকে ক্রোশ দুই হবে—জেয়ালা-বল্লভপুর।

—জেয়ালা-বল্লভপুর ? সে তো চাষা-গাঁ? সেখানকার লোককে আপনি জানলেন কিকরে? রুগী আপনার চেনা?

বিশ্বেশ্বর কেমন যেন ইতস্তত করিয়া বলিল—হ্যাঁ, তা জানা বই কি। চলুন একটুশীগ্‌গির করে তা হলে।

দুপুরের কিছু পূর্বে দুজনে হাঁটিয়া উক্ত গ্রামে পৌঁছিল। বিপিন পূর্বে এ গ্রামে কখনওআসে নাই তবে জানিত জেয়ালার বিল এ অঞ্চলের খুব বড় বিল এবং গ্রামখানি বিলের পূর্বপাড়ে। বিলের মাছ ধরিয়া জীবিকানির্বাহ করে এরূপ ছেলে ও বাগ্‌দী এবং কয়েক ঘর মুসলমানছাড়া এ গ্রামে কোনো উচ্চবর্ণের বাস নাই।

বিশ্বেশ্বর কিন্তু গ্রামের মধ্যে গেল না। বিলের উত্তর পাড়ে গ্রাম হইতে কিছু দূরে একটা বড় অশ্বত্থ গাছ। তাহার তলায় ছোট একটি চালাঘরের সামনে বিশ্বেশ্বর তাহাকে লইয়া গেল।

বিপিন বলিল, রুগী এখানে নাকি?

—হ্যাঁ, আসুন ঘরের মধ্যে। সোজা চলুন, অন্য কেউ নেই।

ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিপিন দেখিল একটি স্ত্রীলোক, জাতিতে বাগ্‌দী কিংবা দুলে, ঘরেরমেঝেতে পুরু বিচালির উপর ছেঁড়া কাঁথার বিছানায় শুইয়া আছে। স্ত্রীলোকটির বয়স চব্বিশ পঁচিশ হইবে, রং কালো, চুল রুক্ষ, হাতে কাচের চুড়ি, পরনে ময়লা শাড়ি। জ্বরের ঘোরে রোগিণী বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতেছে।

বিপিন ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল—এর নিমোনিয়া হয়েচে—দু'দিকই ধরেচে। খুবশক্ত রোগ। খুব সেবা-যত্ন দরকার। বড্ড দেরীতে ডেকেচেন আমাকে—তবুও সারাতে পারি হয়তো, কিন্তু এর লোক কই? খুব ভাল নার্সিং চাই—নইলে—

বিশ্বেশ্বর হঠাৎ বিপিনের দুই হাত ধরিয়া কাঁদো কাঁদো সুরে বলিল—বিপিনবাবু, আপনাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে রুগীকে—যে করেই হোক, আপনার হাতেই সব, আপনি দয়াকরে—

বিপিন দস্তুরমতো বিস্মিত হইল। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর এত মাথাব্যথা কিসের তাহা ভালবুঝিতে পারিল না। এ বাগ্‌দী মাগী মরে বাঁচে তা বিশ্বেশ্বরের কি? ইহার আপন আত্মীয়স্বজনকোথায় গেল?

বিশ্বেশ্বর বলিল—চলুন গাছতলাটার ধারে মাদুরটা পেতে দি, ওখানটিতে বসুন—তামাক সাজব?

বিপিন গাছতলায় গিয়া বসিল। বিশ্বেশ্বর তামাক সাজিয়া আনিয়া হুঁকাটি বিপিনকে দিবার পূর্বে মলিন জামার পকেট হইতে একটা টাকা বাহির করিয়া বিপিনের হাতে দিতে গেল। বিপিন বলিল,—আগে বলুন মেয়েটা কে—আপনি এর টাকা দেবেন কেন, এর লোকজন কোথায় ?

বিশ্বেশ্বর বলিল—কেন, আপনি শোনেননি কোনো কথা?

—না, কি কথা শুনব?

বিশ্বেশ্বর মাদুরের একপ্রান্তে বসিয়া পড়িল। বলিল—ওর নাম মতি। বাগ্‌দীদের মেয়েবটে, কিন্তু অমন মানুষ আপনি আর দেখবেন না। ভাসানপোতায় ওর বাপের বাড়ি, অল্প বয়সেবিধবা হয়। আপনি তো জানেন, আপনাকে বলেছিলাম মেয়েমানুষের ভালবাসা কি জীবনেকখনও জানিনি। কিন্তু এখন আর সে কথা বলতে পারিনে ডাক্তারবাবু। ও বাগ্‌দী হোক, দুলেহোক, ওই আমায় সে জিনিস দিয়েছে—যা আমি কারো কাছে পাইনি কোনো দিন। তারপর সেঅনেক কথা। ভাসানপোতা ইস্কুলের চাকুরিটি সেই জন্যে গেল। ওকে নিয়ে আমি এইজেয়ালা-বল্লভপুরে এলাম। সামান্য কিছু টাকা পেয়েছিলাম ইস্কুলের প্রভিডেন্ট ফান্ডের, তাতেইচলছিল। আর ও মাছ বেচে, কাঠ ভেঙে শাক তুলে আর কিছু রোজগার করতো। তারপরপুজোর আগে আমি পড়লাম অসুখে। টাকাগুলো ব্যয় হয়ে গেল। ও কি করে আমায় বাঁচিয়েতুলেছে সে অসুখ থেকে! তারপর এই রোজ সকালে ঠাণ্ডা বিলের জলে শাক তুলে তুলে এইঅসুখটা বাধিয়েছে! এখন ওকে আপনি বাঁচান—এ সব কথা নিয়ে ভাসানপোতায় তো খুব রটনা—আমায় গালাগাল আর কুচ্ছো না করে তারা জল খায় না। তাই বলছি আপনি শোনেননি কিছু?

বিপিন অবাক হইয়া বিশ্বেশ্বরের কথা শুনিতেছিল। এমন ঘটনা সে কখনও শোনে নাই। শুনিয়া তাহার সারা মন বিশ্বেশ্বরের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। ছি ছি, ব্রাহ্মণসন্তান হইয়া শেষকালে কি না বাগ্‌দী মাগীর সঙ্গে—নাঃ, আজ কি পাপই করিয়াছিল সে, কাহার মুখ দেখিয়া না জানি উঠিয়াছিল।

সে বলিল—টাকা রাখুন, টাকা দিতে হবে না। কিন্তু দামী ওষুধ কিছু লাগবে।অ্যান্টিফ্রজিস্টিন একটা কিনে আনুন, আমার কাছে নেই, লিখে দিচ্ছি আনিয়ে নিন। প্রেসক্রিপশনএকটা ধরে দিই—শক্ত রোগ—

বিশ্বেশ্বর ব্যাকুলভাবে বলিল—বাঁচবে তো ডাক্তারবাবু?

—নার্সিং চাই ভাল। আর পথ্যি—

বিশ্বেশ্বর বিপিনের হাত ধরিয়া বলিল, ওষুধগুলো আপনি লিখে দিয়ে গেলে হবে না, আনিয়ে দিন। এ গাঁয়ের কোনো লোক আমার কথা শুনবে না। এই ঘটনার জন্যে সবাইবুঝলেন না, কেউ উঁকি মেরে দেখে যায় না। আপনিই ভরসা, ডাক্তারবাবু।

বিপিন বিরক্ত হইল। ভাল বিপদে পড়িয়াছে সে! সে নিজে এখন সেই রাণাঘাট হইতেঅ্যান্টিফ্লজিস্টিন আনিতে যাইবে? টাকাই বা দিতেছে কে?

সে বলিল—আমার ডাক্তারখানায় যদি থাকত তবে আলাদা কথা ছিল। আমার কাছে এ সব থাকে না। আপনি এক কাজ করুন, গরম খোলের পুলটিশ দিন। রাই সর্ষের খোল হলে খুবভাল হয়। তাও যদি না পান, গরম ভাতের পুলটিশ দিন। আর আমার ডাক্তারখানায় আসুন, ওষুধ দিচ্ছি।

বিশ্বেশ্বর বিপিনের সঙ্গে আবার ডাক্তারখানায় আসিল। ডাক্তার হিসাবে বিপিন এ কথাওভাবিল যে, ওই কঠিন রোগীর মুখে জল দিবার কেহই রহিল না কাছে, বিশ্বেশ্বরের যাতায়াতে চারক্রোশ হাঁটিয়া ঔষধ লইয়া যাইতে দুই ঘণ্টা তো নিশ্চয় লাগাইবে, এ সময়টা একা পড়িয়াথাকিবে ওই মেয়েটা?

পরক্ষণেই ভাবিল—তুমিও যেমন! দুলে বাগ্‌দী জাত, ওদের কঠিন জান—ওদের এইঅভ্যেস।

বিশ্বেশ্বর কিন্তু সারাপথ মতি বাগ্‌দিনীর নানা গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে চলিল। অমনমেয়ে হয় না, যেমন রূপ, তেমনি গুণ। বিশ্বেশ্বরের গত অসুখের সময় বুক দিয়া সেবাকরিয়াছে—প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা খরচ করিতে দেয় না, নিজে শাকপাতা তুলিয়া, ঘুনিতে মাছ ধরিয়া বেচিয়া যাহা আয় করে, তাহাতেই সংসার চালাইতে বলে। অমন ভালবাসা বিশ্বেশ্বরকখনো কাহারও কাছে পায় নাই।

হঠাৎ বিপিন বলিল—রাঁধে কে?

—ওই রাঁধে। আমি ওর হাতেই খাই—ঢাকব কেন? এ আমায় অত ভালবাসে, তারহাতে খেতে আমার আপত্তি কি? ও আমার জন্যে কম ছেড়েচে? ওর বাবা ভাসানপোতা বাগ্‌দীপাড়ার মধ্যে মাতব্বর লোক, গোলায় ধান আছে, চাষি গেরস্ত। খাওয়া-পরার অভাব ছিলনা, সে সব ছেড়ে আমার সঙ্গে এক কাপড়ে চলে এসেছে। আর এই কষ্ট এখানে—হিম জলে নেমে শাক তুলে রোজ চিংড়িঘাটার বাজারে বিক্রি করে আসে, কাঠ ভাঙে, মাছ ধরে, ধানভানে। এত কষ্ট ওর বাপের বাড়ি ওকে করতে হোত না—তাও কি পেট পুরে খেতে পায় ? আর ওই তো ঘরের ছিরি দেখলেন—ইস্কুলের প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে পঞ্চান্নটি টাকা পেয়েছিলাম—তা আর আছে মোট বাইশটি টাকা—আর ঘরখানা করেছিলাম দশ টাকা খরচকরে, আমার অসুখের সময় ব্যয় হয়েছে বারো তেরো টাকা— আর বাকি টাকায় বসে বসেখাচ্ছি আজ চার মাস—তাহলেবুঝুন পেট ভরে খাওয়া জুটবে কোথা থেকে!

লোকটার জাত নাই। বাগ্‌দিনীর হাতের রান্নাও খায়। স্ত্রীলোকের ভালবাসার দায়ে কিনা শেষে জাতিকুল বিসর্জন দিল!

ঔষধ লইয়া বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী চলিয়া গেল। যাইবার সময় বার বার বলিয়া গেল, কাল একবার বিপিন যেন অবশ্য করিয়া গিয়া রোগী দেখিয়া আসে।

৩

বিপিন পরদিন একাই রোগী দেখিতে গেল। জেয়ালা পৌঁছিতে প্রায় বৈকাল হইয়া আসিল, সম্মুখে জ্যোৎস্না রাত—এই ভরসাতেই দুপুরে আহারাদি করিয়া রওনা হইয়াছে। ঘরখানার সামনে গিয়া বিশ্বেশ্বরের নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিয়া উত্তর পাইল না। অগত্যা সে ঘরে ঢুকিয়াদেখিল, ঘরের মধ্যে রোগিণী কাল যেমন ছিল, আজও তেমনি অঘোর অবস্থায় বিচালি ও ছেঁড়াকাঁথার বিছানায় শুইয়া আছে। বিশ্বেশ্বরের চিহ্ন নাই কোথাও। ব্যাপার কি, মেয়েটিকে এঅবস্থায় ফেলিয়া গেল কোথায়?

বিপিন বিছানার পাশে বসিয়া রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ?

মেয়েটি চোখ মেলিয়া চাহিল। চোখ দুটি জবাফুলের মতো লাল। অস্ফুট স্বরে বলিল, ভাল আছি।

বিপিন থার্মোমিটার দিয়া দেখিল জ্বর প্রায় ১০৪-এর কাছাকাছি। সে জানে, রোগীরা প্রায়ই এ অবস্থায় বলে যে সে ভাল আছে। মাথায় জল দেওয়া দরকার, তাই বা কে দেয় ?

সে জিজ্ঞাসা করিল—বিশ্বেশ্বর কোথায়?

মেয়েটি বিপিনের মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর টানিয়া টানিয়াবলিল—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

—বিশ্বেশ্বরবাবু কোথায়—বিশ্বেশ্বর?

রোগিণী এবার বোধহয় বুঝিতে পারিল। বলিল—কনে গিয়েছেন।

ইহাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করা নিরর্থক বুঝিয়া বিপিন একটা জলপাত্রের সন্ধানে ঘরেরমধ্যে ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। এখনি ইহার মাথায় জল দেওয়া দরকার। এককোণে একটা মেটে কলসিতে সম্ভবত খাবার জল আছে, বিপিন সন্ধান করিয়া একখানা মানকচুর পাতাআনিয়া রোগিণীর মাথার কাছে পাতিয়া কলসির জলটুকু সব উহার মাথায় ঢালিল। পরে বিল হইতে আরও জল আনিয়া আবার ঢালিল। বারকয়েক এরূপ করিবার পর রোগীণীর আচ্ছন্নভাব যেন খানিকটা কাটিল। বিপিন থার্মোমিটার দিয়া দেখিল, জ্বর কমিয়াছে। ডাক্তারি করিতে আসিয়া এ কি বিপদ! এমন হাঙ্গামাতে তো সে কখনও পড়ে নাই!

হঠাৎ তাহার মনে পড়িল মানীর মুখখানা। এই সব দুঃখী, অসহায়, রোগার্ত লোকদের ভাল করিবার জন্যই তো মানী তাহাকে ডাক্তারি পড়িতে বলিয়াছিল। মেয়েদের সেবা পাইয়া আসিয়াছে সে চিরকাল। ইহাকে ফেলিয়া গেলে মানীর, শান্তির, মনোরমার অপমান করাহইবে—কে যেন তাহার মনের মধ্যে বলিল। বিশ্বেশ্বর যদি ইহাকে ফেলিয়া পলাইয়া থাকে, তবে এখন উপায়?

সে আবার রোগিণীকে জিজ্ঞাসা করিল—বিশ্বেশ্বরবাবু কোথায় গিয়েছে জানো? কতক্ষণগিয়েছে ?

মেয়েটি বলিল—জানিনে।

বিপিন আর এক কলসি জল আনিতে গেল। জেয়ালার বিস্তৃত বিলের উপর সূর্যাস্তের ঘনছায়া নামিয়া আসিয়াছে। দক্ষিণ পাড়ের তালগাছের মাথায় এখনও রাঙা রোদ। দূর জলের পদ্মফুলের বনে পদ্মপাতা উলটিয়া আছে, যদিও এখন পদ্মফুল চোখে পড়ে না। বল্লভপুরেরদিকে জেলেরা ডিঙি বাহিয়া মাছ ধরিতেছে। একদল জলপিপি ও পানকৌড়ি জলের ধারে শোলাগাছের বনে গুগলি খুঁজিতেছে। বিপিনের মনে কেমন এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হইল। যদি বিশ্বেশ্বর ইহাকে ফেলিয়া পলাইয়াই থাকে, তবে তাহাকে থাকিতে হইবে এখানেসারারাত। অর্থ উপার্জন করিলেই কি হয়? তাহার বাবা বিনোদ চাটুজ্জে কম উপার্জন করেননাই—অসৎ উপায়ে উপার্জিত পয়সা বলিয়াই টেকে নাই। কাহারও কোনো উপকার হয় নাইতাহা দিয়া।

ঘরে রোগীর পথ্য কিছু নাই। ডাব ও ছানার জল খাওয়ানো দরকার এরকম রোগীকে।কিছুই ব্যবস্থা নাই। বিপিন নিকটবর্তী দুলেপাড়া হইতে একটি লোক ডাকিয়া আনিল।বলিল—গোটাকতক ডাব নিয়ে আসতে পারবে? দাম দেব।

লোকটা বলিল—বাবু, আপনাকে আমি চিনি। আপনি পিপলিপাড়ার ডাক্তারবাবু, দামআপনাকে দিতে হবে না। তবে বাবু ডাব রাত্তিরে পাড়া যাবে না তো? তা আপনি কেন— সেবামুনঠাকুর কোথায় গেল? দেখুন তো বাবু, মেয়েডারে টুঁইয়ে ঘরের বার করে নিয়ে এসে তিনি এখন পালালেন নাকি? এইডে কি ভদ্দরনোকের কাজ?

একপ্রহর রাত্রে বিশ্বেশ্বর আসিয়া হাজির হইল। সে ফেলিয়া পালায় নাই— চিংড়িঘাটার বাজার হইতে কিছু ফল, খৈল ও সাবু মিছরী কিনিতে গিয়াছিল। বিপিনকে দেখিয়া বলিল—আপনি এসেছেন? বড় কষ্ট দিলাম আপনাকে। আপনি বলে গেলেন খোলের পুলটিশদিতে, এখানে পেলাম না—তাই বাজারে গিয়েছিলাম এই সব জিনিসপত্র আনতে। কতক্ষণএসেছেন ?

দুজনে মিলিয়া সারারাত রোগীর সেবা করিল। সকালের দিকে বিপিন বলিল—আমি ডাক্তারখানা খুলব গিয়ে—বসুন আপনি—এক একা ফেলে কোথাও যাবেন না। আমি ওবেলাআবার আসব।

একটা অদ্ভুত আনন্দ লইয়া সে ফিরিল। এই সব পল্লী-অঞ্চলের যত অসহায় দুঃস্থলোকদের সাহায্য করিবার জন্যই যেন সে জীবন উৎসর্গ করিয়াছে—এই ধরনের একটামনোভাব সারাপথ তাহাকে নিজের চোখে মহৎ ও উদার করিয়া চিত্রিত করিল।

আবার ওবেলা যাইতে হইবে। বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর নীচ-জাতীয় প্রণয়িনীকে বাঁচাইয়াতুলিতে হইবে—দুজনেই ওরা নিতান্ত দুঃস্থ অসহায়। যদি কখনও মানীর সঙ্গে দেখা হয়, তবে সে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কৃতজ্ঞতার সহিত বলিতে পারিবে—আমায় মানুষ করে দিয়েচমানী। সেই গরিব, অসহায় মেয়েটির রোগশয্যার পাশে তুমিই আমার মনের মধ্যে ছিলে।

সেই দিনই রাত্রে বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তীর ক্ষুদ্র খড়ের ঘরে বসিয়া সে বিশ্বেশ্বরকে জিজ্ঞাসাকরিল—আচ্ছা বিশ্বেশ্বরবাবু, আত্মীয়-স্বজন ছাড়লেন এর জন্যে, চাকরিটা গেল, জেয়ালারবিলের ধারে এইভাবে রয়েছেন, এতে কষ্ট হয় না?

—কি আর কষ্ট! বেশ আছি, এখন যদি ও বেঁচে ওঠে তবে। ও আমায় যা দিয়েছে, আমার নিজের সমাজে বসে আমাকে তা কেউ দিয়েছে?

—দেয়নি মানে কি? বিয়ে করলেই তো পারতেন!

—আমার সাহস হয়নি ডাক্তারবাবু, সামান্য পণ্ডিতি করি—ভাবতাম সংসার চালাতেপারব না। এ নিজের দিক মোটেই ভাবেনি বলেই আমার সঙ্গে চলে আসতে পেরেছে।

—শুধু তাই নয়, আপনি ব্রাহ্মণ, ও বাগদী। আপনাকে অন্য চোখেই দেখত, কারণআপনি উচ্চবর্ণের। কি করে আপনি আলাপ করলেন এর সঙ্গে?

—আমাদের ইস্কুলের কাঁটাল গাছ ওর বাবা জমা রেখেছিল। তাই ও আসতো কাঁটালপাড়তে। এই সূত্রেআলাপ। এখন ওর অসুখ—ওর চেহারা বেশ ভাল দেখতে, যদি বেঁচে ওঠেতবে দেখবেন এর মুখের এমন একটা শ্রী আছে—

বিপিন অন্য কথা পাড়িল—সে নিজের অভিজ্ঞতা হইতেই জানে, প্রণয়ীদের মুখেপ্রণয়িনীদের রূপগুণের বর্ণনার আদি-অন্ত নাই। হলিই বা বাগ্‌দী বা দুলে! প্রেম মানুষকে কিঅন্ধই করে!

বিশ্বেশ্বরের উপরে বিপিনের করুণা হইল। তাহার সারাজীবনের তৃষ্ণা—এ অবস্থায়পানাপুকুরের জলও লোকে পান করে তৃষ্ণার ঘোরে।

বিপিন বলিল—এর বাড়িতে আপনার লোকজনের কাছে খবর পাঠান। যদি ভালমন্দ কিছুহয়, তারা আপনাকে দোষ দেবে। এরও তো ইচ্ছে হয় আপনার লোকের সঙ্গে দেখা করতে।

—তারা কেউ আসবে না। ওর বাবা অবস্থাপন্ন চাষি গেরস্থ। তারা বলেচে ওর মুখদেখবে না আর।

অনেক রাত্রে বিপিন একবার জল তুলিতে গেল বিলে। ধপধপে জ্যোৎস্না চারিদিকে, অদ্ভুত শোভা স্তব্ধ গভীর নিশীথিনীর। পদ্মবনে রাত-জাগা সরাল পাখি ডাকিতেছে। দূরেবিলের ধারে জেলেদের মাছ চৌকি দেওয়ার কুঁড়ের কাছে কাঠকুটো জ্বালিয়া আগুন করিয়াছিল, এখন প্রায় নিভিয়া আসিতেছে। বিশ্বেশ্বরের দুর্ভাগ্য, হয়তো মেয়েটি আজ শেষ-রাত্রে কাবারহইবে। বিশ্বেশ্বরের বিপিন সে কথা বলে নাই, জ্বর অতি দ্রুত নামিতেছে, ক্রাইসিস আসিয়াপড়িল, নাড়ীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। বিপিন যাহা করিবার করিয়াছে, আর করিবার উপযুক্ততোড়জোড় নাই তাহার। বাঁচানো যাইবে না।

এই স্তব্ধ রাত্রির সীমাহীন রহস্য তাহার মনকে অভিভূত করিল। বিপিন কখনও ও সবভাবে না, তবুও মনে হইল, মেয়েটি আজ কোথায় কতদূরে চলিল, তখনও কি সে জাতেবাগ্‌দীই থাকিয়া যাইবে? উচ্চবর্ণের প্রতি প্রেমের দায়ে তাহার এই যে স্বার্থত্যাগ, ইহা কি সম্পূর্ণ বৃথা যাবে? কোথাও কোনো পুষ্পমালা অপেক্ষা করিয়া নাই কি তাহার সাদর অভিনন্দনের জন্য?

মানী যদি থাকিত, এসব কথা তাহার সঙ্গে বলা চলিত। মানী সব বোঝে, সে বুদ্ধিমতী মেয়ে। শান্তি সেবাপরায়ণা বটে, কিন্তু তাহার শিক্ষা নাই, সে খাওয়াইতে জানে বটে, কিন্তু তাহার সঙ্গে কথা বলিয়া সে

আনন্দ পাওয়া যায় না। মানী আজ কোথায়, কি ভাবে আছে? আর কখনও তাহার সঙ্গে দেখা হইবে না? যাক সে যেখানেই থাক, সে বাঁচিয়া আছে। নিমোনিয়ার ক্রাইসিস খড়্গ লইয়া বলি দিতে উদ্যত হয়নাই তাহাকে। সে বাঁচিয়া থাকুক। দেখিবার দরকার নাই। পৃথিবীর মাটি মানীর পায়ের স্পর্শ পায় যেন, মাটিতে-মাটিতেও যেনযোগটা বজায় থাকে।

শেষরাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারের মধ্যে এক দিকে বিপিন, অন্য দিকে বিশ্বেশ্বর ধরিয়ামৃতদেহকে কুটিরের বাহির করিল। বিলের চারিধারে ঘনীভূত কুয়াশা। শ্মশান বিলের ওপারে, প্রায় এক মাইল ঘুরিয়া যাইতে হয়। বিপিনের খাতিরে বল্লভপুরের বাগ্‌দীপাড়া হইতে দুজনলোক আসিল। বিপিন এবং বিশ্বেশ্বরও ধরিল। সৎকারের কোনো ত্রুটি না হয়, প্রেমের মানরাখা চাই, বিপিনের দৃষ্টি সেদিকে।

৪

স্নান করিয়া যখন বিপিন ফিরিল, তখন বেলা প্রায় এগারোটা।

দত্ত মহাশয় বলিলেন, ও ডাক্তারবাবু, কোথায় ছিলেন কাল রাত্রে ? রুগী ছিল? শান্তি যে আপনার জন্যে শ্বশুরবাড়ি থেকে ক'রকমের আচার পাঠিয়ে দিয়েছে! যে গাড়োয়ান গাড়ি নিয়ে গিয়েছিল, সে কাল রাত্রে ফিরে এসেছে কিনা—সেই গাড়িতেই আপনার জন্যে এক হাঁড়িআচার আলাদা করে—ব্রাহ্মণের ওপর বড্ড ভক্তি আমার মেয়ের—

বিপিন যেন শক্ত মাটি পাইল অনেকক্ষণ পরে। শান্তি আছে, সে স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, সেদেহমুক্ত জীবাত্মা নয়—শান্তি তাহাকে আচার পাঠাইয়াছে। আবার হয়তো একদিন আসিয়া হাজির হইবে, আবার চা করিয়া আনিয়া দিবে তাহার সে হাতে।

হতভাগ্য বিশ্বেশ্বর!

সন্ধ্যার পূর্বে সে আবার বল্লভপুর গেল। বিশ্বেশ্বর কি অবস্থায় আছে একবার দেখা দরকার। গিয়া দেখিল, ঘরের দোর খোলা; বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, ঘরের মধ্যে বিশ্বেশ্বর ভাত চড়াইয়াছে।

বিশ্বেশ্বর বলিল, কে?

বিপিন ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আমি। এখন অবেলায় রাঁধছেন যে?

বিশ্বেশ্বরকে দেখিয়া মনে হয় না, সে কোনো শোক পাইয়াছে। বলিল, আসুন ডাক্তারবাবু। সারাদিন খাওয়া হয়নি। ঘরদোর গোবর দিয়ে নিকিয়ে নিলাম—রুগীর ঘর, বুঝলেন না? আবার নেয়ে এলাম এইসব করে, তখন বেলা তিনটে। তারপর এই ভাত চড়িয়েচি, এইবার দুটো খাব, বড় খিদে পেয়েছে।

বিপিন চাহিয়া দেখিল ঘরের কোথাও কোনো বিছানা নেই। যে ছেঁড়া কাঁথা ও বিচালির শয্যায় রোগিণী শুইয়া থাকিত, তাহা শবের সঙ্গে গিয়াছে, এখন এই ঠাণ্ডা রাত্রে বিশ্বেশ্বর শুইবে কিসে? ওই একটিমাত্র বিছানাই সম্বল ছিল নাকি?

বিশ্বেশ্বর ভাত নামাইয়া বড় একখানা কলার পাতায় ঢালিল। শুধু দুটি বড় বড় করলা সিদ্ধ ছাড়া খাইবার অন্য কোনো উপকরণ নাই। তাহা দিয়াই সে যেমন গোগ্রাসে ভাত গিলিতে লাগিল, বিপিন বুঝিল, লোকটার সত্যই অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল বটে। বেচারি চাকুরিটা হারাইয়া বসিল প্রেমের দায়ে পড়িয়া, এখন খাইবেই বা কি, আর করিবেই বা কি! তাও এমন অদৃষ্ট, একূল ওকূল দুকূলই গেল।

প্রথম যখন খাইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন বিশ্বেশ্বর তত কথা বলে নাই, দুটি করলাসিদ্ধের মধ্যে একটা করলা সিদ্ধ দিয়া আন্দাজ অর্ধেক পরিমাণ ভাত খাওয়ার পরে বোধ হয় তাহার কিঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি হইল।

বিপিনের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, আজ দিনটা কি বিপদেরমধ্যে দিয়েই কেটে গেল! এক একদিন অমন হয়। বড্ড খিদে পেয়েছিল, কিছু মনে করবেন না।

বিপিন বলিল—তা তো হল, কিন্তু আপনি এখন শোবেন কিসে? বিছানা তো নেই দেখচি!

—ও কিছু না, গায়ের কাপড়খানা আছে, বেশ মোটা, শীত ভাঙে খুব। আর দু আঁটিবিচালি চেয়ে আনব এখন পাড়া থেকে।

—না চলুন, আমার ওখানে রাত্রে শুয়ে থাকবেন। এমন কষ্টে কি কেউ শুতে পারে ?

—না না, কোনো দরকার নেই ডাক্তারবাবু। ও আবার কষ্ট কিসের? ওসব কষ্টকে কষ্টবলে ভাবিনে। দিব্যি শোবো এখন, একটু আগুন করব ঘরে। তবে প্রথম দিনটা, হয়তো একটুভয়-ভয় করবে।

—আমি আপনার ঘরে থাকবো আজ আপনার সঙ্গে?

—কোনো দরকার নেই। আপনি না হয় একদিন শুয়ে রইলেন, কিন্তু আমাকে সইয়ে নিতে হবে তো? সে তো ভালবাসতো আমায়, তার ভূত এসে আর আমার গলা টিপবে না।আচ্ছা, সত্যি ডাক্তারবাবু, কোথায় সে গেল, বলুন তো?

—নিন, আপনি খেয়ে নিন। ওসব কথা পরে হবে এখন।

বিশ্বেশ্বর খাওয়া শেষ করিয়া তামাক সাজিল। নিজে দু চার বার টানিয়া বিপিনের হাতেহুঁকাটি দিল। বিপিন প্রথম দিন ইতস্তত করিয়াছিল, লোকটা বাগ্‌দিনীর হাতের রান্না খায়, ইহারজাত নাই, এ হুঁকায় তামাক খাইবে কিনা। কিন্তু কেমন একটা করুণা ও সহানুভূতি তাহার মনেআশ্রয় লইয়াছে, সে যেমন ইহার প্রতি, তেমনি ছিল ইহার মৃতা প্রণয়িনীর প্রতি। সুতরাং এখনও-কথা তাহার আর মনেই ওঠে না।

বিপিন বলিল, এখন কি করবেন ভেবেচেন?

—একটা পাঠশালা করব ভাবচি, এই জেয়ালা-বল্লভপুরে অনেক নিকিরি আরজেলেমালোর বাস। ওদের ছেলেপিলে নিয়ে একটা পাঠশালা খুললে, চলবে না?

—ওদের সঙ্গে কথা হয়েছে কিছু?

—কথা এখনও তুলিনি কিছু। কাল একবার পাড়ার মধ্যে গিয়ে দু-একজনের কাছে পাড়িকথাটা।

বিপিন বুঝিল, ইহা নিতান্তই অস্থির-পঞ্চকের ব্যাপার। কিছুই ঠিক নাই। কোথায় বা পাঠশালা, কোথায় বা ছাত্রদল! ইহার মস্তিষ্কে ছাড়া তাহাদের অস্তিত্ব নাই কোথাও।

—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনি ভূত মানেন?

—না, যা কখনও দেখিনি তা কি করে মানব? ওসব আর ভেবে কি করবেন বলুন?

বিশ্বেশ্বর হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল। বিপিন অবাক হইয়া গেল পুরুষমানুষ এভাবে কাঁদিতেপারে, তাহা সে নিজেকে দিয়া অন্তত ধারণাই করিতে পারিল না। ভাল বিপদে ফেলিয়াছে।তাহাকে বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত!

দুঃখও হইল। লোকটার লাগিয়াছে খুব! লাগিবারই কথা বটে। কে জানে, হয়তো মনের দিক দিয়া মানীর সঙ্গে তাহার যে সম্বন্ধ, মৃতার সহিত ইহারও সেই সম্বন্ধ ছিল। হতভাগ্য বিশ্বেশ্বরের প্রতি সে অবিচার করিতে চায় না।

ইহাকে একা এই শোকের মধ্যে ফেলিয়া যাইতে তাহার মন সরিল না। রাত্রিটা বিপিনরহিয়া গেল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১

বিপিনের ডাক্তারখানায় সম্প্রতি মাসখানেক একটিও রোগী আসে নাই।

রোজই সকালে বিকালে নিয়মিত ডাক্তারখানায় গিয়া তীর্থের কাকের মতো বসিয়াথাকে। হাতের পয়সাকড়ি ফুরাইয়া গেল। কোনো দিকে রোগবালাই নাই, দেশটা হঠাৎ যেন মধুপুর কি শিমুলতলা হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

জীবনটাও যেন বড় ফাঁকা-ফাঁকা। সকাল-সন্ধ্যা একেবারে কাটে না। দত্ত মশায় অবশ্যআছেন, কিন্তু তাহার মুখে ধর্মতত্ত্ব শুনিয়া শুনিয়া একঘেয়ে হইয়া পড়িয়াছে, আর ভাল লাগেনা।

মনোরমার জন্য মন-কেমন করে আজকাল। মনোরমাকে সাপে কামড়ানোর পর হইতেবিপিন লক্ষকরিতেছে স্ত্রীর উপর তাহার মনোভাব অদ্ভুত ভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। মনে হয়মনোরমা তো চলিয়া যাইতেছিল, একদিনও সে মনোরমাকে মুখের একটি মিষ্ট কথা বলে নাই, এ অবস্থায় যদি সেদিন সে সত্যই মারা পড়িত—বিপিনকে চিরজীবন অনুতাপ করিতে হইতসে সব ভাবিয়া। সুখের মুখ কখনও সে দেখে নাই, বিপিন তাহাকে এবার সুখী করিবে। মানুষের মনের এই বোধ হয় গতি, বড় বড় অবলম্বন যখন চলিয়া যায়, তখন সে আশ্রয়কে অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র বলিয়া মনে হইত, তাহাই তখন হইয়া দাঁড়ায় অতি প্রিয়, অতি প্রয়োজনীয়। মনোরমার চিন্তা কখনও আনন্দ দেয় নাই, আজকাল দেয়। তাহার প্রতি একটাঅনুকম্পা জাগে, স্নেহ হয়, তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হয়। কি আশ্চর্য ব্যাপার এ সব!

বিপিন মাস দুই বাড়ি যায় নাই, কিছু টাকা হাতে আসিলে একবার বাড়ি যাইত, কিন্তু এইসময়ই হাত একেবারে খালি।

দত্ত মহাশয় একদিন বলিলেন, ডাক্তারবাবু, শান্তি কাল পত্র লিখেচে, আপনার কথা জিগ্যেস করেচে, আপনি কেমন আছেন, ডাক্তারি কেমন চলচে। আর একটা কথা লিখেচে, ওরশ্বশুরের চোখ অস্ত্র হবে কলকাতা বা রাণাঘাটের হাসপাতালে। আপনি সে-সময়ে সময় করেদু'দিনের জন্যে ওদের ওখানে থেকে শ্বশুরের সঙ্গে রাণাঘাট বা কলকাতা যেতে পারবেন কি না লিখেচে। শান্তি থাকবে, আমার জামাই থাকবে। অবিশ্যি আপনার ফি এবং যাতায়াতের খরচাওরা দেবে। একটা দিন কিংবা দুটো দিন লাগবে। আপনি থাকলে ওদের একটা বলভরসা। ওরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ হাসপাতালের সুলুকসন্ধান কিছুই জানে না। আপনার কত বড় বড় ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ, আপনি পড়েচেন সেখানে, তাই আপনাকে নিয়ে যেতে চায়।

বিপিন বলিল, বেশ লিখে দেবেন আমি যাব তবে ফি দিতে চাইলে যাব না। যাতায়াতের খরচ দিতে চান দেবেন তারা, কিন্তু ফি'র কথা যেন না ওঠান।

দত্ত মশায় আর কিছু বলিলেন না।

দিন পাঁচ ছয় পরে দত্ত মশায় একদিন সকালে বিপিনকে ডাকিয়া ঘুম ভাঙাইলেন।পূর্বরাত্রে শান্তির শ্বশুরবাড়ি হইতে লোক আসিয়াছে, রাণাঘাট হাসপাতালে শান্তির শ্বশুরকে লইয়া যাওয়া হইবে, বিপিনকে আজ এখুনি রওনা হইতে হইবে, বেশি রাত হইয়া গিয়াছিলবলিয়া দত্ত মশায় বিপিনকে গত রাত্রে কিছু বলেন নাই।

সাত ক্রোশ পথ গরুরগাড়িতে অতিক্রম করিয়া প্রায় বেলা দুইটার সময় বিপিন শান্তির শ্বশুরবাড়ি গিয়া পৌঁছিল। শান্তির স্বামী গোপাল প্রথমেই ছুটিয়া আসিল। বলিল, ওঃ, এত বেলাহয়ে গেল ডাক্তারবাবু! বড় কষ্ট হয়েছে এই রোদ্দুরে! ও কতক্ষণ থেকে আপনার জন্যেনাইবার জল চায়ের যোগাড় করে নিয়ে বসে আছে। আমরা তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম।

বিপিন গিয়া বাহিরের ঘরে বসিল। তাহার বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপ করিতেছে, এখনি আজ শান্তির সঙ্গে দেখা হইবে। বিপিন ভাবিয়া অবাক হইল, শান্তির সঙ্গে দেখা হইবার আগ্রহে মনের এই রকম অবস্থা—এ কি কল্পনা করা সম্ভব ছিল এক বছর পূর্বেও? মানী নয়, শান্তি! কে শান্তি? ক'দিন তাহার সহিত পরিচয়? উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যে কেমন এক প্রকার অস্বস্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

শান্তি একটু পরেই আধঘোমটা দিয়া ঘরে ঢুকিল এবং বিপিনের পায়ের ধুলা লইয়া প্রণামকরিল। হাসিমুখে বলিল—আমি বেলা দশটা থেকে কেবল ঘরবার করচি—এত বেলা হবে তা ভাবিনি। একটু জিরিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে ডাব খান।

—তোমার শ্বশুর মহাশয়কে একবার দেখব।

—এখন না। বাবা খেয়ে ঘুমুচ্চেন একটু, বুড়োমানুষ—আপনি নেয়ে নিয়ে রান্না চড়িয়ে দিন, তারপর—

বিপিন বিস্ময়ের সুরে বলিল—সে কি শান্তি! রান্না চড়িয়ে দেব কি? এত বেলায়—

শান্তি হাসিয়া বলিল—ও সব চলবে না এখানে। ব্রাহ্মণ মানুষকে আমরা কিছু রেঁধে দিতেপারিনে। আমি সব যোগাড় করে দেব, আপনি শুধু নামিয়ে নেবেন। আকাশ-পাতাল ভাবতেহবে না আপনার সেজন্যে!

শান্তির আশ্বাস দেওয়ার মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে, যাহাতে বিপিনের মনএকেবারে লঘু ও নিশ্চিন্ত হইয়া উঠিল। শান্তি সেবাপরায়ণা মেয়ে বটে, কাজের মেয়েও বটে, তাহার উপর নির্ভরশীলতা কেমন যেন আপনিই আসে।

গোপাল আসিয়া বলিল—চলুন, নদীতে নাইয়ে নিয়ে আসি।

বিপিন বলিল—নদী পর্যন্ত আপনার কষ্ট করে যাওয়ার কি দরকার? আমায় দেখিয়েদিলেই তো...গোপাল তাহাতে রাজি নয়, বিপিন বুঝিল, শান্তিই বলিয়া দিয়াছে তাহাকে নদীরঘাটে লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া আনিতে। শান্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তি এখানে খুব বেশি, এমন কিমনে হইল বাপেরবাড়ি অপেক্ষা বেশি।

স্নানাহারের পর শান্তি বাহিরের ঘরে নিজে বিপিনের বিছানা করিয়া দিল। বিপিনবলিল—শান্তি, আমি দুপুরে ঘুমুইনে তুমি জানো, বিছানা কিসের—তার চেয়ে বোসো এখানে, দুটো কথাবার্তা বলি।

শান্তি হাসিয়া বলিল—না, তা হবে না, একটু বিশ্রাম করে নিতেই হবে। কাল আবার এখান থেকে আট ক্রোশ রাস্তা গরুরগাড়িতে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

—ও কষ্ট কিছু না, তোমার শ্বশুর উঠেছেন কিনা দেখ। একবার তার চোখটা দেখি।বিপিন চোখের সম্বন্ধে কিছুই জানে না, তবুও তাহাকে ভান করিতে হইল যে সে অনেক কিছুবুঝিতেছে। শান্তির শ্বশুরের দুই-চারিটি চক্ষুপীড়া-সংক্রান্ত অস্বস্তির প্রশ্নের উত্তরও তাহাকে দিতে হইল।

গ্রামখানি বিকালে ঘুরিয়া দেখিল, পিপলিপাড়া বা সোনাতনপুরের মতোই জঙ্গলে ভরা, এ অঞ্চলের অধিকাংশ গ্রামই তাই। শান্তিদের বাড়ির পিছনেই তো প্রকাণ্ড বাগান, চারিধার বাঁশবনে ঘেরা, দিনমানেও রোদ ওঠে না সেদিকটাতে বলিয়া মনে হয়।

সন্ধ্যাবেলা বেড়াইয়া ফিরিল। বাড়ির পিছনে ঘন বন-বাগানের ধারে একটি বাতাবীলেবুতলায় ঢেঁকি পাতা। সেখানে শান্তি ও আর একটি প্রৌঢ়া বিধবা মেয়েমানুষ চিঁড়েকুটিতেছে—শান্তি তাহাকে সেখানে ডাকিল। বিপিন সেখানে গিয়া দাঁড়াইল, প্রৌঢ়া বিধবামেয়েমানুষটি ঢেঁকিতে পাড় দিতেছিল, শান্তি ঢেঁকির গড়ে ধান দিয়া যাইতেছে, তাহাকে বসিতে একখানা পিঁড়ি দিয়া হাসিয়া বলিল—বসুন। এখানে বসে গল্প করুন, আমি সরু ধান দুটো ভেনে চাল করে নিচ্চি, কাল সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। বাবা অন্য চাল খেতে পারেন না।

বিপিন চাহিয়া দেখিল বন-বাগানের আড়াল হইতে চাঁদ উঠিতেছে। কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া, প্রায় পূর্ণচন্দ্রের মতোই বড় চাঁদখানা। বাঁশবন নিস্তব্ধ, ঝিঁঝিপোকা ডাকিতেছে সন্ধ্যায়, খুব নির্জনগ্রামখানা, লোকজন বেশি নাই, পিপলিপাড়ার হাটতলার চেয়েও নির্জন।

কিন্তু বেশ লাগিল এই বন-বাগানের মধ্যে ঢেঁকিশালের জায়গা, চাঁদ-ওঠা এই সুন্দরসন্ধ্যা, শান্তির সুমিষ্ট অভ্যর্থনাটি, বাতাবীলেবু ফুলের সুগন্ধ। সে বলিল, তুমি ভারি কাজেরমেয়ে কিন্তু শান্তি। আবার দিব্যি ধান ভানতেও পারো দেখচি।

শান্তি হাসিয়া ফেলিল। বিধবা মেয়েমানুষটি মুখে কাপড় দিয়া হাসিল। শান্তি বলিল, এ না করলে গেরস্তঘরে চলে কি, বলুন আপনি? এখন ধরুন আমার শ্বশুরের তিন গোলা ধান হয়বছরে, রোজ ধান ভানা, চিঁড়েকোটার জন্যে কাকে আবার খোশামোদ করে বেড়াব? ওই মতিরমা আছে আর আমি আছি—

—বেশ গাঁখানি তোমাদের, বেড়িয়ে এলাম।

—চড়কতলার দিকে গিয়েছিলেন?

—চিনি তো নে, কোন তলা! এমনি খানিকটা ঘুরলাম—

শান্তি উঠিয়া বলিল, দাঁড়ান, আপনার চা করে আনি, এখানে বসে খাবেন আর গল্পকরবেন, মতির মা রাখো—আমি আসি আগে, যাব আর আসব—

চা ও খাবার লইয়া সে খুব শীঘ্রই ফিরিল বটে।

বিপিন বলিল, হালুয়া গরম রয়েচে, এখন করে আনলে নাকি?

—আমি না, মা করেচেন। আমি শুধু চা করে আনলাম। সেকেলে বুড়ি, চা করতে জানে না।ভারি আমোদ হচ্ছে আমার, আপনি এসেচেন বলে।

—সত্যি ?

—সত্যি না তো মিথ্যে! রাত্রে আপনাকে আর রাঁধতে হবে না, অমি লুচি ভেজে দেব।

—কেন, আমি ভাত রেঁধেই নিতাম, আবার লুচির হাঙ্গামা—

—হাঙ্গামা কিছু না। আমার শ্বশুরবাড়িরা বড়লোক, এদের এককাঁড়ি টাকা আছে, খাইয়ে দিলাম বা কিছু টাকা বাপের বাড়ির লোককে?

শান্তির কথার ভঙ্গি শুনিয়া বিপিন হাসিয়া উঠিল, প্রৌঢ়া মতির মাও অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া (কারণ বিপিনের সামনে হাসা তাহার পক্ষে অশোভন) হাসিয়া বলিল—কি যে বলেনবড় খুড়িমা আমাদের! শুনতেই এক মজা!

শান্তি যে এমন হাসাইতে পারে, বিপিন তাহা জানিত না। রসিকা মেয়ে সে খুব পছন্দ করে—পছন্দ করে বলিয়াই এটুকুজানে, ভাল হাসাইতে পারে এমন মেয়ের সংখ্যা বেশি নয়। শান্তির একটা নূতন দিক যেন সে দেখিল।

শান্তি ছেলেমানুষের মতো আবদারের সুরে বলিল, একটা ভূতের গল্প বলুন না ?

—ভূতের গল্প! নাও ধান ভেনে, আর এখন রাত্রি দুপুরে ভূতের গল্প করে না!

—না বলুন।

বিপিন একটা গল্প বানাইয়া বলিল। অনেকদিন আগে কাহার মুখে একটা গল্প শুনিয়াছিল, সেটিও বলিল। চাঁদ এবার অনেকদূর উঠিয়াছে, বিপিন শান্তির সহিত গল্পের ফাঁকে ফাঁকেভাবিতেছিল মানীর কথা, মৃতা বাগ্‌দী মেয়েটির কথা, মনোরমার কথা, কামিনী মাসির কথা।

মানীর সঙ্গে এই রকম ভাবে গল্প করিতে পারিত এই রকম সন্ধ্যায়! না, তাহা হইবারনয়। মানীর শ্বশুরবাড়ি এরকম পাড়াগাঁয়েও নয়, মানী এরকম বসিয়া বসিয়া ধানও ভানিবে না।

ইতিমধ্যে মতির মা কি কাজে একটু বাড়ির মধ্যে ঢুকিতেই বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা শান্তি—মতির মা বলে ডাকচো, ওর মতি বলে মেয়ে ছিল?

শান্তি বিস্মিত হইয়া বলিল—আপনি ওকে চেনেন?

—ও কি জাত ?

—বাগ্‌দী কিংবা দুলে। আপনি ওর কথা জানলেন কি করে?

—বলচি। ওর বাড়ি কি ভাসানপোতা ছিল?

শান্তি আরও অবাক হইয়া বলিল—ভাসানপোতা ওর শ্বশুরবাড়ি। এ গাঁয়ে ওর বাপের বাড়ি। ওর স্বামী ওকে নেয় না অনেকদিন থেকে। ওর মেয়ে মতি ওর বাপের কাছেই ছিল, তার বিয়ে হয়েচে এই দিকে যেন কোথায়। আমি তাকে কখনও দেখিনি, সে এখানে আসে না।

—আচ্ছা, তুমি জানো মতির সঙ্গে ওর মার দেখা হয়েছিল কতদিন আগে?

—না। কেন বলুন তো? এত কথা জিজ্ঞেস করচেন কেন?

—ওকে কথাটা জিজ্ঞেস করবে। নয়তো থাক, আজ জিগ্যেস কোরো না—পরে বলবএখন। ইতিমধ্যে মতির মা আসিয়া পড়াতে বিপিন কথা বন্ধ করিল। প্রৌঢ়া আবার ঢেঁকিতে পাড়দিতে আরম্ভ করিল। বিপিন ভাবিল, হয়তো এ জানে না, তাহার মেয়ে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল এবং তাহার সম্প্রতি মৃত্যু হইয়াছে, আজ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, ঠিক এই পূর্ণিমার আগের পূর্ণিমার রাত্রে। বল্লভপুরের বিলের ধারে সে ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাত, বিপিন ভুলে নাই।সে রাতটিতে বাগ্‌দীর মেয়ে মতি তাহার মনে একটা খুব বড় দাগ রাখিয়া গিয়াছে, অন্য একজগতের সহিত পরিচয় করাইয়া গিয়াছে।

অভাগিনী বৃদ্ধা জানেও না তাহার মেয়ের কি ঘটিয়াছে।

পরদিন শান্তি যখন চা দিতে আসিল, তখন নির্জনে পাইয়া বিপিন মতির কাহিনীশান্তিকে শুনাইয়া দিল। শান্তি যেমন বিস্মিত হইল, তেমনি দুঃখিত হইল। বলিল—আমার মনেহয় মেয়ে যে ঘর থেকে চলে গিয়েছে একথা ও জানে, কারও কাছে প্রকাশ করে না সেকথা—তবে সে যে মরে গিয়েছে একথা জানে না। জানবার কথাও নয়, বল্লভপুরে ওরা লুকিয়ে এসে ঘর বেঁধে থাকত, কাউকে পরিচয় তো দেয়নি—কি করে জানবে কোথাকার কারমেয়ে? ভাসানপোতা থেকে জেয়ালা-বল্লভপুর কতদূর?

—তা আট ন' ক্রোশ খুব হবে।

—তা হলে ও কিছুই জানে না, মেয়ে ঘর ছেড়ে বের হয়ে গিয়েছে, একথাও শোনেনি।এত দূর থেকে কে খবর দেবে! ওকে আর কোনো কথা জিগ্যেস করার দরকার নেই।

২

পরদিন বিকালে দুইখানি গরুরগাড়িতে শান্তি, শান্তির স্বামী গোপাল, বিপিন ও শান্তির শ্বশুর স্টেশনে আসিল এবং সন্ধ্যার পরে রাণাঘাটে পৌঁছিয়া সিদ্ধান্তপাড়ার বাসায় গিয়া উঠিল। শান্তির এক মামাশ্বশুর বাসা পূর্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। দু'খানি মাত্র ঘর, একখানা ছোট রান্নাঘর, ছোট একটু উঠান। ভাড়া পাঁচ টাকা।

শান্তি অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, দরাজজায়গায় হাত-পা ছড়াইয়া খেলাইয়া বাস করা অভ্যাস। সে তো বাসা দেখিয়া স্বামীকে বলিল—এখানে কেমন করে থাকব হ্যাঁগা-ওমা, একি উঠোন—আর এইটুকু রান্নাঘরে কি রাঁধা যায় ? আর ওই পাতকুয়োর জলে নাইব?

রাণাঘাটে বিপিন আসিল অনেকদিন পরে। মানীদের বাড়িতে কাজ করিবার সময় কোর্টে তখন আসিতেই হইত। এই জন্যই রাণাঘাটের অনেক জিনিসের সঙ্গে মানীর কথা যেনজড়ানো। গোপালের সহিত বাজার করিতে বাহির হইয়া বিপিন দেখিল পূর্বপরিচিত কত দৃশ্য তাহার মনে কষ্ট দিতেছে—মানীর কথা অনেকটা চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, আবার অত্যন্ত নূতনরূপে সে সব দিনের স্মৃতি মনের দ্বারে ভিড় করিতে লাগিল। কষ্ট হয়, সত্যই কষ্ট হয়।

সকালে গোপাল এবং শান্তির শ্বশুরকে লইয়া বিপিন রাণাঘাট হাসপাতালে ডাক্তার আর্চারের কাছে গেল। বলাই যখন হাসপাতালে ছিল, তখন আর্চার সাহেবের সঙ্গে বিপিনেরআলাপ হয়। আর্চার সাহেব বিপিনকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন। বলিলেন— আপনার ভাই কোথা? মারাগিয়েচে? তা যাবে, বাঁচবার কোনো আশা ছিল না।

শান্তির শ্বশুরের চোখ দেখিয়া বলিলেন—এখন এঁকে দশ-বারোদিন এখানে থাকতে হবে। চোখে একটা ওষুধ দিচ্চি—চোখ কেমন থাকে, কাল আমায় এসে জানাবেন। কাটাবারএখন দরকার নেই। বলাই যে জায়গাটাতে শুইয়া থাকিত খাটে—বিপিন সেখানটা গিয়াদেখিয়া আসিল। এখন অন্য রোগী রহিয়াছে।

বলাই, মানী...কামিনী মাসি...স্বপ্ন...

হাসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিপিন দেখিল শান্তি বাসা বেশ চমৎকার গুছাইয়া লইয়াছে। দুটি ঘরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ছোট ঘরটিতে বিপিনের একা থাকিবার এবং বড় ঘরটিতে উহারা তিনজনের একত্রে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। দু'টি ঘরই ইতিমধ্যে ঝাড়িয়াপরিষ্কার করিয়াছে, মেঝে জল দিয়া ধুইয়া ফেলিয়া শুকনো নেকড়া দিয়া বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে। বিছানাপত্র পাতিয়াছে দুটি ঘরেই, বাহিরে বসিবার জন্য একটি সতরঞ্চি পাতিয়া রাখিয়াছে। উহাদের দেখিয়া বলিল—কি হল বাবার চোখের?

বিপিন বলিল—চোখ কাটতে হবে না—তবে এখানে দশ-বারো দিন এখন থাকতে হবে। ওষুধ দিয়ে ছানি নষ্ট করে দেবে বল্লে। ওঃ, তুমি যে শান্তি! বেশ গুছিয়ে ফেলেছ ঘরদোর।

শান্তি হাসিয়া বলিল—এখন নেয়ে ধুয়ে নিন্ সব। আমি বাবাকে নাইয়ে নি।

শান্তির শ্বশুর চোখে ভাল দেখিতে পান না, শান্তি তাহাকে কি করিয়াই সেবা করিতেছে, দেখিয়া বিপিন মুগ্ধ হইল। মা যেমন অসহায় ছোট ছেলের সব কাজ নিজে করিয়া দেয়, সকল অভাব-অভিযোগের সমাধান নিজে করে, তেমনি করিয়া শান্তি অসহায় বৃদ্ধকে সকল দিক হইতে আগুলিয়া রাখিয়া দিয়াছে।

অথচ সে বালিকার মতো খুশি শহরে আসিয়াছে বলিয়া। সোনাতনপুরের মতো অজ পাড়াগাঁয়ে বাপেরবাড়ি, শ্বশুরবাড়িও ততোধিক অজ পাড়াগাঁয়ে—রাণাঘাট তাহার কাছে বিরাটশহর। এখানকার প্রত্যেক জিনিসটি তাহার কাছে অভিনব ঠেকিতেছে। সে চিরকাল সংসারেখাটিতেই জানে, কিন্তু বাহিরের আনন্দ কখনও পায় নাই—জীবনে বিশেষ কিছু দেখেও নাই, তাহার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে মনসাপূজার সময় মনসার ভাসান হয় প্রতি শ্রাবণ মাসে, বৎসরেরমধ্যে এই দিনটিই তাহার কাছে পরম উৎসবের দিন। সাজিয়াগুজিয়া মনসাতলায় পাড়ার অন্যান্য
বউ-ঝিয়ের সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা ভাসান শুনিতে যাইবে, এই আনন্দে শ্রাবণ মাসের পয়লাহইতে দিন গুনিত। তাহার মতো মেয়ের রাণাঘাট শহরে আসিয়া অত্যন্ত খুশি হইবারই কথা।

শান্তির শ্বশুর বিপিনকে বলিলেন—ডাক্তারবাবু, এখানে টকি বায়োস্কোপ হয় তো ?

বিপিনও পাড়াগাঁয়ের লোক, সেও কখনও ওসব দেখে নাই—কিন্তু ইহাদের কাছে সেকলিকাতার পাশ-করা ডাক্তারবাবু, তাহাকে পাড়াগাঁয়ের ভূত সাজিয়া থাকিলে চলিবে না। সেতখনই জবাব দিল—ও টকি! হয় বৈকি, খুব হয়।

—আপনি বউমাকে নিয়ে গিয়ে একদিন দেখিয়ে আনুন। আমার কখন কি দরকার হয়, গোপাল থাকুক। বউমা কখনও জীবনে ওসব দেখেনি—বেচারি দেখুক একটু—

—কেন, গোপালও তো দেখেনি—সে-ই যাক শান্তিকে নিয়ে!

—গোপাল না থাকলে আমার কাজকর্ম—আপনি ব্রাহ্মণ, আপনাকে দিয়ে তো হবে না ডাক্তারবাবু, তারপর বউমা আমার কাছে থাকলে—গোপাল একদিন যাবে এখন।

শান্তি রান্নাঘরে রান্না করিতেছে—গোপাল বসিয়া তরকারি কুটিতেছে, বিপিন গিয়াবলিল—শান্তি, টকি বায়োস্কোপ দেখতে যাবে? মিত্তির মশায় বললেন তোমাকে নিয়ে দেখিয়ে আনতে!

শান্তি বালিকার মতো উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—কোথায়, কোথায়, কখন হবে? চলুন না, আজই চলুন—কখন হয় সে, আমি কখনও দেখিনি। আমার মেজ ননদের মুখে টকির গল্পশুনেছি, সেই থেকে ভারি ইচ্ছে আছে দেখবার।

বিপিনও টকির খোঁজ বিশেষ কিছু জানে না—দুপুরের পর বাহির হইয়া সন্ধান করিয়াজানিল বড়বাজারে ফেরিফ্যান রোডের ধারে এক কোম্পানি কলিকাতা হইতে আসিয়া মাস দুইটকি দেখাইতেছে—অদ্যকার পালা নরমেধ যজ্ঞ', ছ'টার সময় আরম্ভ।

বেলা চারিটার সময় সে শান্তির শ্বশুরের ঔষধ কিনিতে ডাক্তারখানায় গেল— যাইবার সময় শান্তিকে তৈরি থাকিতে বলিয়া গেল। সাড়ে পাঁচটার সময় ফিরিয়া দেখিল, শান্তিসাজিয়াগুজিয়া অধীর আগ্রহে ঘর-বাহির করিতেছে। বলিল—উঃ বাপরে, বেলা কি আর আছে! টকি শেষ হয়ে গেল এতক্ষণ—চলুন শীগ্‌গির!

বিপিন বলিল—গাড়ি আনব, না হেঁটে যেতে পারবে? মিত্তির মশাই কি বলেন?

শান্তির শ্বশুর বলিলেন—আপনিও যেমন, কে-ই বা ওকে চিনচে এখানে, হেঁটেই যাক।

পথে বাহির হইয়াই শান্তি বলিল—উঃ, পায়ে বড় কাঁকর ফুটচে, খালিপায়ে এ পথেহাঁটা যায় না।

অগত্যা বিপিন একখানা গাড়ি করিল। শান্তি বলিল—বাবাকে বলবেন না গাড়ির কথা, আমি পয়সা দিচ্ছি, আমার কাছে আলাদা পয়সা আছে।

বিপিন হাসিয়া বলিলেন তোমার সব দুষ্টুমি শান্তি, আমি সব বুঝি। তোমার ঘোড়ারগাড়িচড়বার সাধ হয়েছিল কিনা বলো সত্যি করে! কাঁকর ফোটা কিছু না, বাজে ছল। ধরে ফেলেছি, না?

শান্তি হাসিয়া ফেলিল।

—পয়সা তোমায় দিতে হবে—একথা ভাবলে কেন?

—আপনি দিতে যাবেন কেন? আমার সাধ হয়েছিল, আপনার তো হয়নি?

—যদি বলি আমারও হয়েছিল?

—বেশ, তবে দিন আপনি।

টকি দেখিতে বসিয়া শান্তি বলিল—আচ্ছা বলুন তো, আপনার সঙ্গে বসে এমনভাবেটকি দেখব একথা কখনও ভেবেছিলেন ?

—কি করে ভাবব বলো?

—আপনি খুশি হয়েছেন বলুন?

বিপিন প্রথম হইতেই নিজেকে অত্যন্ত সতর্ক করিয়া দিয়াছিল মনে মনে। শান্তিকে একালইয়া বাড়ির বাহির হইয়াছে—তাহার সঙ্গে কোনোপ্রকার ভালবাসার কথা বলা হইবে না। ও পথে আর নয়। বিশেষত তাহার স্বামী

ও শ্বশুর বিশ্বাস করিয়া তাহার সঙ্গে ছাড়িয়া দিয়াছে যখন, তখন শান্তিকে একটিও অন্য ধরনের কথা সে বলিবে না।

বিপিন জবাব দিতে পারিত—কেন, আমি খুশি হই-না-হই তোমার তাতে আসে যায়কিছু নাকি?

কিন্তু সে বলিল—খুশি না হবার কারণ কি? আমিও যে ঘন ঘন টকি দেখি তা তো নয়, থাকি তো সোনাতনপুরে—খুশি হবার কথাই তো। আর এই যে পালাটা হচ্ছে, নতুন পালাএকেবারে।

কথাটা অন্য দিক দিয়া ঘুরিয়া গেল।

বিপিন দেখিল শান্তি খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে। টকি কখনও না দেখিলেও সে গল্পের গতিএবং ঘটনা তাহার অপেক্ষা ভাল বুঝিতেছে। অনেক জায়গায় শান্তি এমন আবিষ্ট ও মুগ্ধ হইয়াপড়িতেছে যে বিপিন কথা বলিলে সে শুনিতে পায় না। একবার দেখিল শান্তি আঁচল দিয়াচোখের জল মুছিয়া কাঁদিতেছে।

বিপিন হাসিয়া বলিল,—ও কি শান্তি, কান্না কিসের?

শান্তি হাসিকান্না মিশাইয়া বলিল,—আপনার যেমন কঠিন মন, আমার তো অমন নয়, ছেলেটার দুঃখ দেখলে কান্না পায় না?

—তা হবে, আমার চোখের জল অত সস্তা নয়।

—তা জানি। আচ্ছা আমি মরে গেলে আপনি কাঁদবেন? —ও কথা কেন? ও সব কথা থাক।

শান্তি খপ করিয়া বিপিনের হাত ধরিয়া অনেকটা আবদার এবং খানিকটা আদরের সুরেবলিল,—না বলুন, বলতেই হবে।

বিপিন হাসিয়া বলিল—নিশ্চয়ই কাঁদব।

—সত্যি ? —মিথ্যে বলছি?

পরক্ষণেই সে শান্তির সঙ্গে কোনো ভালবাসার কথা না বলিবার সঙ্কল্প ভুলিয়া গিয়াবলিয়া ফেলিল,—আমি মরে গেলে তুমি কাঁদবে?

শান্তি গম্ভীর মুখে বলিল,—অমন কথা বলতে নেই।

—না, কেন আমার বেলায় বুঝি বলতে নেই! তা শুনব না, বলতেই হবে।

—না, ও কথার উত্তর নেই। অন্য কথা বলুন।

—এর উত্তর যদি না দাও, তোমার সঙ্গে আর কথা বলব না।

—না বলবেন, না বলবেন।

—বলবে না?

—না, আমি তো বলে দিয়েছি।

অগত্যা বিপিন হাল ছাড়িয়া দিল। মনে মনে ভাবিল—শান্তি বেশ একটু একগুঁয়েওআছে, যা ধরিবে, তাই করিবে।

ইন্টারভ্যালের সময় শান্তি বাহিরে আসিয়া বলিল—সবাই চা খাচ্ছে, আপনি চা খাননি তো বিকেলে, খান না চা, আমি পয়সা দিচ্চি

—তুমি কেন দেবে! আমার কাছে নেই নাকি—চলো দুজনে খাব।

শান্তির একগুঁয়েমি আরও ভাল করিয়া প্রকাশ পাইল। সে বলিল,—সে হবে না, আপনারচা খাওয়ার পয়সা আমি দেব, নয়তো আমি চা খাব না।

বিপিন দেখিল ইহার সহিত তর্ক করা বৃথা, অগত্যা তাহাতেই রাজি হইয়া দুজনে চায়ের স্টলে একখানা বেঞ্চের উপর বসিল। শান্তি বলিল, আপনি ওই যে বোতলের মধ্যে কি রয়েছে, ওই দু'খানা নিন—শুধু চা আপনাকে খেতে দেব না।

—তুমিও নাও, আমি একা খাব বুঝি?

বিপিনের এই সময়ে মনে হইল মনোরমার কথা। বেচারি কখনও টকি বায়োস্কোপ দেখে নাই—সংসারে শুধু খাটিয়াই মরে। একদিন তাহাকে রাণাঘাটে আনিয়া টকি দেখাইতেহইবে—বীণাকেও। সে বেচারিই বা সংসারের কি দেখিল! মা বুড়োমানুষ, তিনি এসব পছন্দ করিবেন না, বুঝিবেনও না, তিনি চান ঠাকুরদেবতা, তীর্থধর্ম।

৩

পুনরায় ছবি আরম্ভ হইবার ঘণ্টা পড়িল। দুজনে আবার গিয়া ভিতরে বসিল। শেষের দিকে ছবি আরও করুণ হইয়া আসিল। এক জায়গায় শান্তি ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে দেখিয়া বিপিনবলিল—ও কি শান্তি, তুমি এমন ছেলেমানুষ! কাঁদে না অমন করে—ছিঃ—চলো বাইরে যাবে?

শান্তি ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু—

—উঁহু তো কেঁদো না, লোকে কি ভাববে?

ছবি শেষ হইতে বাহিরে আসিয়া শান্তি চুপচাপ থাকিয়া পথ চলিতে লাগিল। স্টেশনের কাছে আসিয়া বিপিন বলিল, চলো—ইস্টিশান দেখবে।

—চলুন।

আলোকোজ্জ্বল প্ল্যাটফর্ম দেখিয়া শান্তি ছেলেমানুষের মতো খুশি। শান্তিকে সুন্দরী মেয়েবলা যায় না, কিন্তু তাহার নিজস্ব এমন কতকগুলি চোখের ভঙ্গি, হাসির ধরন প্রভৃতি আছে যাহাতাহাকে সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। বাহির হইতে প্রথমটা তত চোখে পড়ে না এসব। বিপিন এতদিন শান্তিকে দেখিয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু আজ প্রথম তাহার মনে হইল—শান্তি যে এমনসুন্দর দেখতে, এমন চোখের ভঙ্গি ওর—এ এতদিন তো ভাবিনি ?

আসল কথা, কোথা হইতে বিপিন এতদিন শান্তির রূপ দেখিবে? আজ ছাড়া পাইয়া মুক্ত, স্বাধীন অবস্থায় শান্তির নারীত্বের যে দিক ফুটিয়াছে তাহাই তাহাকে সুন্দরী করিয়া তুলিয়াছে। এ শান্তি এতদিন ছিল না। কাল হইতে আবার হয়তো থাকিবেও না। শান্তির মধ্যে যে নায়িকাএতকাল ছিল ঘন ঘুমে অচেতন, আজ সে জাগিয়াছে। অপরূপ তার রূপ, অদ্ভুত তার ঐশ্বর্য। বিপিন ইহা ঠিক বুঝিল না।

সে ভাবিল, আজ তাহার সহিত একা বাহির হইয়া শান্তি নিজের যে রূপ দেখাইতেছে—তাহা এতদিন ইচ্ছা করিয়াই ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এটুকু অভিজ্ঞতা বিপিনের বহুদিন হইয়াছে যে, মেয়েরা সকলকে নিজের রূপ দেখায় না—যখন যাহার কাছে ইচ্ছা করিয়া ধরাদেয়—সে-ই কেবল দেখিতে পায়।

বিপিন কিছু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

শান্তিকে একা লইয়া আর কোনোদিন সে বাহির হইবে না। শান্তি তাহাকে জালেজড়াইতে চায়।

কিন্তু বিপিন আর নিজেকে কোনো বন্ধনের মধ্যে ফেলিতে চায় না। মনের দিক হইতে স্বাধীন না থাকিলে সে নিজের কাজে উন্নতি করিতে পারিবে না। এই তো কাল আর্চার সাহেবকে বলিয়া আসিয়াছে, হাসপাতালে একটা শক্ত অস্ত্রোপচার করা হইবে একটি রোগীর, বিপিন কালদেখিতে যাইবে। তবুও যতটুকু শেখা যায়।

শান্তিকে লইয়া খানিক এদিক ওদিক ঘুরিয়া বলিল,—চলো এবার বাসায় যাই—

—আর একটুখানি থাকুন না, বেশ লাগছে।

একখানা ট্রেন কলিকাতার দিক হইতে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কিছুক্ষণ পরে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বহু যাত্রী উঠিল, বহু যাত্রী নামিল।

শান্তি এসব অবাক চোখে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে এসব ভাল করিয়া কখনও দেখে নাই। দু-তিন বার সে রেলে চড়িয়া এখান ওখান গিয়াছে—একবার গিয়াছিল শিমুরালি গঙ্গাস্নানের যোগে মা-বাবার সঙ্গে, তখন তাহার বয়স মোটে এগারো বছর, আর একবার স্বামীর সঙ্গে পিসতুতো ননদের ছেলের বিবাহে এই লাইনে গিয়াছিল শ্যামনগর মূলাজোড়। সেও আজ দু-তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে বেড়াইয়া কখনও সে এত বড় ইস্টিশানের কাণ্ডকারখানা দেখে নাই।

বিপিনের নিজেরও বেশ লাগিতেছিল। কোথায় পড়িয়া থাকে বারো মাস, কোথা হইতেএসব দেখিবে? রাণাঘাটের মতো শহর বাজার জায়গায় থাকিতে পাইলে সামান্য টাকারোজগার হইলেও সুখ। পাঁচজনের সহিত মিশিয়া পাঁচটা জিনিস দেখিয়া সুখ।

সে কথা শান্তিকে সে বলিল।

শান্তি বলিল,—সত্যি! আচ্ছা আমরা কোথায় পড়ে থাকি ডাক্তারবাবু, গরুর মতো কিংবামোষের মতো দিন কাটাই, কি বা দেখলাম জীবনে, আর কি বা—

—সত্যি, কি দেখতে পাই?

—শুনতেই বা কি! এই যে ধরুন আজ টকি দেখলাম, এ কেউ দেখেছে আমাদের গাঁয়েকি আমাদের শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে? আহা, ও বোধ হয় দেখেনি, ও কাল দেখুক এসে।

—এ গোপাল? গোপাল কখনও টকি দেখেনি?

—কোত্থেকে দেখবে? আপনিও যেমন—ওরা কেউ দেখেনি। কাল পাঠিয়ে দেববিকেলে।

—আমি সত্যি বলচি শান্তি—এই প্রথম দেখলাম টকি। বায়োস্কোপ দেখেছি অনেক দিন আগে—সে তখনকার আমলে। বাবার পয়সা তখনও হাতে ছিল, একবার কলকাতায় গিয়েবায়োস্কোপ দেখি। তখন টকি হয়নি। তারপর বহুকাল হাতে পয়সা ছিল না, নানা গোলমালগেল—

বিপিন নিজের জীবনের কথা এত ঘনিষ্ঠ ভাবে কখনও শান্তির কাছে বলে নাই। শান্তির বোধ হয় খুব ভাল লাগিতেছিল, সে আগ্রহের সহিত শুনিতেছিল এ সব কথা।

খানিকক্ষণ দুজনে চুপচাপ। মিনিট পাঁচ ছয় কাটিয়া গেল।

বিপিন হঠাৎ বলিল,—কি কথা মনে হচ্ছে জানো শান্তি?

শান্তি যেন সলজ্জ আগ্রহের সহিত বলিল,—কি?

—সেই মতি বাগ্‌দিনীর কথা!

শান্তির মুখে নিরাশা ও বিস্ময় একই সঙ্গে ফুটিল। অবাক হইয়া বলিল,—কেন, তারকথা কেন?

বিপিন ভাবিল, যদি মানী আজ থাকিত, এ প্রশ্ন করিত না। মনের খেলা বুঝিতে তারমতো মেয়ে বিপিন আজও কোথাও দেখে নাই।

তবুও বলিল—তুমি দেখোনি শান্তি, কি করে সে মরেছে, সেই শীতের রাত, গায়ে লেপকাঁথা নেই, খড় বিচুলি আর ছেঁড়া কাঁথার বিছানা। অথচ কত অল্প বয়সে...আমি এখানে দাঁড়িয়েচোখ বুজলে সেই জেয়ালা-বল্লভপুরের বিল, সেই চাঁদের আলো, বিলের ধারে চিতা, চিতারএদিকে আমি, ওদিকে বিশ্বেশ্বর, এসব চোখের সামনে দেখতে পাই—

কিন্তু শান্তি বুঝিল না। শান্তি যে উত্তর দিল, বিপিন তাহা আশা করে নাই। বলিল— ডাক্তারবাবু, সে জায়গাটা আমায় একবার দেখিয়ে আনবেন তো, সেদিন আপনার মুখে ওর সব কথা শুনে পর্যন্ত আমিও ভুলতে পারিনি। হোক নীচু জাত, ওই একটা জিনিসে বড্ড উঁচু হয়ে গেছে। চলুন, ওই বেঞ্চিখানায় বসি একটু।

—আবার বসবে কেন? রাত হল, বাসায় ফিরি।

—আমার পা ধরে গিয়েছে। ওখানে কি বিক্রি হচ্ছে—চা? আর একটু চা খান—

—আমি আর নয়। তোমার জন্যে আনব?

—তবে পান কিনে আনুন, আমার জন্যে আমি বলিনি। আপনি চা ভালবাসেন, তাই বলছিলাম।

পানের দোকান নিকটে নাই, কিছু দূরে প্ল্যাটফর্মের ওদিকে। শান্তিকে বেঞ্চে বসাইয়াবিপিন পান আনিতে গিয়া হঠাৎ এক জায়গায় দাঁড়াইয়া গেল। আপ প্ল্যাটফর্ম হইতে কিছু সরিয়া ওভারব্রিজের কাছে একটি মেয়ে তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া একটা ট্র্যাঙ্কের উপর বসিয়া আছে, তাহার আশেপাশে আরও দু-একটা ছোটখাট সুটকেস্, বিছানা, আরও কি কি। এইমাত্র যেট্রেনখানা গেল, সেই ট্রেন হইতেই নামিয়া থাকিবে, বোধ হয় সঙ্গের লোক বাহিরে গাড়ি ঠিককরিতে গিয়াছে, মেয়েটি জিনিস আগুলিয়া বসিয়া আছে। মেয়েটি অবিকল মানীর মতো দেখিতে পিছন হইতে। সেই ভঙ্গি, সেই সব।...কতকাল কাটিয়া গিয়াছে, এখনও তাহার মতোঅন্য মেয়ে দেখিলেও তাহারই কথা মনে পড়ে।...

এই সময় মেয়েটি একবার পেছনের দিকে চাহিল।

বিপিন চমকিয়া উঠিল।

পরম বিস্ময়ে ও কৌতূহলে সে স্থানকালপাত্র সব কিছু ভুলিয়া গেল ওভারব্রিজের তলায়। তাহার বুকের মধ্যে কে যে হাতুড়ি পিটিতেছে!

৪

বিপিন নিজের চক্ষুকে যেন বিশ্বাস করিতে পারিল না, কারণ যে মেয়েটি পিছন ফিরিয়াচাহিয়াছিল, সে মানী!

কয়েক মুহূর্তের জন্যে বিপিনের চলিবার শক্তি যেন রহিত হইল। মানী এদিকে চাহিয়া আছে বটে, কিন্তু তাহার দিকে নয়—তাহাকে সে দেখিতে পায় নাই। বিপিন অগ্রসর হইয়া মানীর সামনে গিয়া বলিল—এই যে মানী! তুমি এখানে?

মানী চমকিয়া উঠিয়া অন্য দিক হইতে মুহূর্তে দৃষ্টি ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিল। তাহারমুখে বিস্ময়—গভীর, অবিমিশ্র বিস্ময়!

বিপিন হাসিয়া বলিল—চিনতে পারছ না? আমি—

মানীর মুখ হইতে বিস্ময়ের ভাব তখনও কাটে নাই। পরক্ষণেই সে ট্রাঙ্কের উপর হইতেউঠিয়া হাসিমুখে বিপিনের দিকে আগাইয়া আসিয়া বলিল—বিপিনদা! তুমি কোথা থেকে?

বিপিন মানীকে 'তুই' বলিতে পারিল না, অনেকদিন পরে দেখা, কেমন সঙ্কোচ বোধহইল। বলিল—আমি, আমি রাণাঘাটে এসেচি কাজে। বলচি—কিন্তু তুমি এমন সময় এখানে?

মানী চোখ নামাইয়া নীচু-দিকে চাহিয়া ধরা গলায় বলিল—তুমি কি করেই বা জানবে। বাবা মারা গিয়েচেন—কাল চতুর্থীর শ্রাদ্ধ, তাই পলাশপুর যাচ্চি আজ। এই ট্রেনে নামলাম।

বিপিন বিস্ময়ের স্বরে বলিল—অনাদিবাবু মারা গিয়েচেন ? কবে? কি হয়েছিল?

—কি হয়েছিল জানিনে। পরশু টেলিগ্রাম করেছে এখানকার নায়েব হরিবাবু। তাই আজ আমার দেওরকে সঙ্গে নিয়ে আসছি, উনি আসতে পারলেন না—কেস আছে হাতে। বোধ হয়কাজের দিন আসবেন। দেওর গাড়ি ডাকতে গিয়েছে—তাই বসে আছি।

বিপিন দুই চক্ষু ভরিয়া যেন মানীকে দেখিতেছিল। এখনও যেন তাহার বিশ্বাস হইতেছিলনা যে এই সেই মানী। সেই রকমই দেখিতে এখনও। একটুকু বদলায় নাই।

—বিপিনদা, ভাল আছ? কোথায় আছ, কি করচ এখন?

এখন যে আমি ডাক্তার, নাম-করা পাড়াগাঁয়ের ডাক্তার। রুগী নিয়ে রাণাঘাটেরহাসপাতালে এসেচি, রুগীর বাসাতেই আছি। আমাদের দেশের ওই দিকে সোনাতনপুর বলে একটা গাঁ, সেখানেই থাকি। মনে আছে মানী, ডাক্তারি করার পরামর্শ তুমিই দিয়েছিলেপ্রথম—তাই আজ দুটো ভাত করে খাচ্চি।

—সত্যি, বিপিনদা? সত্যি বলচো এসব কথা?

—সাক্ষী হাজির করতে রাজি আছি, মানী। বিশ্বাস করো আমার কথা।

—ভারী আনন্দ হল শুনে। কিন্তু বিপিনদা, তোমার সঙ্গে যে একরাশ কথা রয়েছেআমার! একটি রাশ কথা!

বিপিন ঠিকমতো কথাবার্তা বলিতে পারিতেছিল না। আজ কি সুন্দর দিনটা, কার মুখদেখিয়া যে উঠিয়াছিল আজ! এই রাণাঘাট স্টেশনে জীবনের এমন একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতামানীর সঙ্গে দেখা—

সে শুধু বলিল—আমারও একরাশ কথা আছে, মানী!

মানী বলিল—আমার একটি কথা রাখবে বিপিনদা? পলাশপুরে এসো, বাবার কাজেরদিন পড়েচে সামনের বুধবার, তুমি তার দু'দিন আগে এসো। তোমার আসা তো উচিতও, এসময় তোমায় দেখলে মাও যথেষ্ট ভরসা পাবেন।

—যাওয়া আমার খুব উচিতও। বাবার আমলের মনিব, আমার একটা কর্তব্য তো আছে, কিন্তু একটা কথা হচ্ছে—

মানী ছেলেমানুষের মতো মিনতি ও আবদারের সুরে বলিল—ও সব কিন্তু-টিন্তু শুনবনা... আসতেই হবে, তোমার পায়ে পড়ি, এসো বিপিনদা—আসবে না?

এই সময় শান্তি আসিয়া সলজ্জ ভাবে অদূরে দাঁড়াইল।

মানী বলিল—ও কে বিপিনদা?

বিপিন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল। মানী জানে সে কি রকম চরিত্রের লোক ছিল পূর্বে, হয়তো ভাবিতে পারে, পয়সা হাতে পাইয়া বিপিনদা আবার আগের মতো—যাহাই হোক, শান্তি কেন এ সময় এখানে আসিল? আর কিছুক্ষণ বেঞ্চিতে বসিলে কি হইত তাহার?

বলিল—ও গিয়ে আমাদের গাঁয়েরই—মানে ঠিক আমাদের গাঁয়ের নয়, আমি যেখানেডাক্তারি করি সে গাঁয়েরই—ওর বাবা আমার রুগী।

মানী বলিল—ডাকো না এখানে, বেশ মেয়েটি!

বিপিন শান্তিকে ডাকিয়া মানীর সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। মানী তাহার হাত ধরিয়াট্রাঙ্কের উপর বসাইয়া বলিল–বসো না ভাই এখানে, তোমার বাবার কি অসুখ?

—চোখের অসুখ, তাই ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে করে আমরা রাণাঘাটের সায়েব ডাক্তারের কাছে দেখাতে এসেচি পরশু।আপনি বুঝি ডাক্তারবাবুর গাঁয়ের লোক?

—না ভাই, আমার বাপের বাড়ি পলাশপুর, এখান থেকে চার ক্রোশ—

এই সময় মানীর দেওর আসিয়া বলিল—বউদি, গাড়ি এই রাত্তিরবেলা যেতে চায়না—অনেক কষ্টে একখানা ঠিক করেচি, চলুন উঠুন।

মানী দেওরের সহিত বিপিনের পরিচয় করাইয়া দিল। মানীর দেওর বেশ ছেলেটি, কোনকলেজে বি.এ. পড়ে—এইটুকু মাত্র বিপিন শুনিল, তাহার মন তখন সেদিকে ছিল না।

মানী গাড়িতে উঠিবার সময় বার বার বলিল—কবে আসচো পলাশপুরে বিপিনদা? কালই এসো—এরা এখানে দু'দিন থাকবেন তো, তুমি সেই ফাঁকে ঘুরে এসো আমাদের ওখান থেকে আসা চাই; মনে থাকে যেন।

বাড়ি ফিরিবার পথে শান্তি যেন কেমন একটু বিমনা। সে জিজ্ঞাসা করিল—উনি কেডাক্তারবাবু? আপনার সঙ্গে কি করে আলাপ?

বিপিন বলিল—আমি আগে যে জমিদারবাড়ি কাজ করতাম, সেই জমিদারবাবুর মেয়ে।আমার বাবাও ওখানে কাজ করতেন কিনা, ছেলেবেলায় ওদের বাড়ি যেতাম—ওর সঙ্গে একসঙ্গে খেলা করেছি—অনেক দিনের জানাশুনো।

শান্তি বলিল—বেশ লোক কিন্তু। অত বড় মানুষের মেয়ে, মনে কোনো ঠ্যাকার নেই। দেখতেও ভারি চমৎকার।

রাত্রে সেদিন বিপিনের ঘুম হইল না। মনের মধ্যে কি এক প্রকারের উত্তেজনা, কি যেআনন্দ, তাহা প্রকাশ করিয়া বলা যায় না। যত ঘুমাইবার চেষ্টা করে বিছানা যেন গরমআগুন, মানীর সহিত দেখা হইয়াছে—আজ মানীর সহিত দেখা হইয়াছে—মানী তাহাকেপলাশপুর যাইতে বারবার অনুরোধ করিয়াছে—অনেকবার করিয়া বলিয়াছে—সেই মানী, এসব জিনিসও জীবনে সম্ভব হয় ?

শুধু মানীর অনুরোধেই বা কেন—অনাদিবাবু তাহার বাবার আমলের মনিব। তাহারমৃত্যুসংবাদ পাইয়া তাহার সেখানে একবার যাওয়াটা লৌকিক এবং সামাজিক উভয় দিক দিয়াইএকটা কর্তব্য বই কি।

৫

সকালে উঠিয়া সে শান্তির শ্বশুরকে লইয়া যথারীতি হাসপাতালে গেল। সেখান হইতে ফিরিয়া শান্তিকে বলিল—শান্তি, ভাত চড়িয়ে দাও তাড়াতাড়ি, আমি আজই পলাশপুর যাব।

শান্তি নিজে ভাত রাঁধিয়া বিপিনকে দিত না, তবে হাঁড়ি চড়াইয়া দিত, বিপিন নামাইয়ালইত মাত্র। তরকারি রাঁধিবার সময়ে নিজে রান্না করিতে করিতে ছুটিয়া আসিয়া দেখাইয়া দিতকি ভাবে কি রাঁধিতে হইবে।

শান্তি মনমরাভাবে বলিল—আজই?

—হ্যাঁ, আজই যাই। বলে গেল কিনা কাল—যাওয়া উচিত আজ। বাবার অন্নদাতা মনিব, বুঝলে না?

—আমাকে নিয়ে চলুন না সেখানে?

বিপিন অবাক হইয়া গেল। শান্তি বলে কি! সে কোথায় যাইবে?

শান্তি আবার বলিল—যাবেন নিয়ে? চলুন না, ওদের বাড়িঘর দেখে আসি—কখনও তো কিছু দেখিনি—থাকি পাড়াগাঁয়ে পড়ে!

—তা হয় না শান্তি, কে কি মনে করবে, বুঝলে না? আর তুমি চলে গেলে তোমারশ্বশুর কি করবেন?

—একদিনের জন্যে ও চালিয়ে নিতে পারবে এখন। ও সব কাজে মজবুত, আপনার মতো অকেজো নয় তো কেউ!

—তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু কে কি ভাবতে পারে—গেলে গোপালকেও নিয়ে যেতেহয়—তা তো সম্ভব হচ্ছে না, বুঝলে না?

শান্তি নিরুত্তর রহিল—কিন্তু বোঝা গেল সে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়াছে।

বেলা তিনটার সময় শান্তির স্বামী ও শ্বশুরকে বলিয়া-কহিয়া দু'দিনের ছুটি লইয়া সে পলাশপুর রওনা হইল। যাইবার সময় শান্তি পান সাজিয়া একখানা ভিজা নেকড়ায় জড়াইয়া হাতে দিয়া বলিল—বড় রোদ্দুর, জলতেষ্টা পেলে মাঠের মধ্যে পান খাবেন। পরশু ঠিক চলেআসবেন কিন্তু। বাবা কখন কেমন থাকেন, আপনি না এলে মহা ভাবনায় পড়ে যাব আমরা।

স্টেশনের পাশের সেগুনবাগান ছাড়াইয়া সোজা মেটে রাস্তা উত্তরমুখে মাঠের মধ্য দিয়া চলিয়াছে। এখনও রৌদ্রের খুব তেজ, যদিও বেলা চারটা বাজিতে চলিল। এই পথ বাহিয়া আজপাঁচ বছর পূর্বে বিপিন ধোপাখালির কাছারি বা মানীদের বাড়ি হইতে কতবার কাগজপত্র লইয়ারাণাঘাটে উকিলের বাড়ি মোকদ্দমা করিতে আসিয়াছে, এই পথের প্রতিটি বৃক্ষলতা তাহার সুপরিচিত—শুধু সুপরিচিত নয়, সেই সময়কার কত স্মৃতি, মানীর কত হাসির ভঙ্গি, কতআদরের কথা ইহাদের সঙ্গে জড়ানো—কত কথা—সে সব কথা আজ ভাবিয়া লাভ কি?

বেলা পাঁচটার সময় কলাধরপুরের বিশ্বাসদের বাড়ির সামনে আসিতেই পথে হঠাৎ বিশ্বাসদের বড় ছেলে মোহিতের সঙ্গে দেখা। মোহিত আশ্চর্য হইয়া বলিল—একি, নায়েবমশায় যে! এতদিন কোথায় ছিলেন? চলেচেন কোথায়? পলাশপুরেই? ও, তা আবার কি ওদের স্টেটে—অনাদিবাবু তো মারা গিয়েচেন—

বিপিন সংক্ষেপে বলিল, স্টেটে চাকুরি করিবার জন্য নয়, অনাদিবাবুর শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতহইয়াই সে পলাশপুর যাইতেছে—বর্তমানে সে ডাক্তারি করে।

মোহিত ছাড়ে না, বেলা পড়িয়াছে, একটু কিছু খাইয়া তবে যাইতে হইবে, পূর্বে রাণাঘাটহইতে যাতায়াতের পথে তাহাদের বাড়িতে বিপিনের কত পায়ের ধুলা পড়িত ইত্যাদি।

অগত্যা কিছুক্ষণ বসিতে হইল।

কতকাল পরে আবার পলাশপুরের বাড়িতে মানীর সঙ্গে দেখা হইবে! সেই বাহিরেরঘর, সেই দালান, সেই দালানের জানালাটি, যেখানটিতে মানী তাহার সহিত কথা বলিবার জন্য দাঁড়াইয়া থাকিত !

সন্ধ্যার পর সে অনাদিবাবুদের বাড়িতে পৌঁছিয়া গেল। প্রথমেই বীরু হাড়ির সঙ্গে দেখা—সেই বীরু হাড়ি পাইক, যে ইহাদের স্টেটে এক হইয়াও বহু এবং বহু হইয়াও এক। তাহাকে দেখিয়া বীরু ছুটিয়া আসিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিল—নায়েববাবু যে? কনে থেকে।আলেন এখন?

—ভাল আছিস্ রে বীরু?

—আপনার ছিচরণ আশীব্বাদে—তা ঝান, মা-ঠাকরোণের সঙ্গে একবার দেখাডা করেআসুন।

বিপিন বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া প্রথমে অনাদিবাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিল। তিনি বিপিনকেদেখিয়া চোখের জল ফেলিয়া অনেক পুরানো কথা পাড়িলেন। তাহার বাবা বিনোদবাবুর সময় স্টেটের অবস্থা কি ছিল, আর এখন কি দাঁড়াইয়াছে! আয় বড়ই কমিয়া গিয়াছে, বর্তমাননায়েবটিও বিশেষ কাজের লোক নয়, তাহার উপর কর্তা মারা গেলেন— এখন যে জমিদারি কেদেখাশুনা করিবে তাহা ভাবিয়াই তিনি নাকি কাঠ হইয়া যাইতেছেন। পরিশেষে বলিলেন—তাতুমি এখন কি করছ বাবা?

বিপিন এ প্রশ্নের উত্তর দিল। সে চারিদিকে চাহিতেছিল, সেই অতি সুপরিচিত ঘরদোর, আগেকার দিনের কত কথা স্বপ্নের মতো মনে হয়—আবার সেই বাড়িতে আসিয়া সেদাঁড়াইয়াছে—ওই সে জানালাটি—এসব যেন স্বপ্ন—সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা এখনও যেনশক্ত।

অনাদিবাবুর স্ত্রী বলিলেন—তা বাবা, কর্তা নেই, আমি মেয়েমানুষ, আমার হাত-পা আসচেনা। তুমি বাড়ির ছেলে, দেখ শোনো, যাতে যা হয় ব্যবস্থা করো—তোমাকে আর কি বলব?

—মা, ওপরের চাবিটা একবার দাও তো—সিন্দুক খুলে রুপোর বাটিগুলো—

বলিতে বলিতে মানী বারান্দা হইতে বাহিরে আসিয়া রোয়াকে পা দিতেই বিপিনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বিস্মিত মুখে বলিল—ওমা, বিপিনদা কখন এলে? এখন? কিছু তো জানিনে—তা একবার আমাকে খোঁজ করে খবর পাঠাতে হয়—এসো এসো, এসে বসোদালানে।

মানীর মা বলিলেন—হ্যাঁ, বসো বাবা। মানী সেদিন বলছিল রাণাঘাট ইস্টিশানে তোমার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল, তোমাকে আসতে বলেছে—আমি বল্লাম, তা একেবারে সঙ্গে করে নিয়ে এলিনে কেন, কতদিন দেখিনি—

মানী বলিল—বোসো বিপিনদা, আমি একটু চা করে আনি—হেঁটে এলে এতটা পথ। কিছুক্ষণ পরে চা ও খাবার লইয়া মানী ফিরিল। বলিল—বিপিনদা, তোমায় এ বাড়িতে আবার দেখে মনে হচ্চে, তুমি কোথাও যাওনি, আমাদের এখানেই যেন কাজ করো— পুরোনো দিনযেন ফিরে এসেছে, না?

—সত্যি। বোসোনা এখানে মানী—তোর দেওর কোথায়?

মানী হাসিয়া বলিল—তবুও ভাল, পুরোনো দিনের মতো ডাকছো। রাণাঘাট ইস্টিশানে যে 'আপনি' 'আজ্ঞে শুরু করেছিলে! আমার দেওরকে কলকাতায় পাঠিয়েচি চতুর্থীর শ্রাদ্ধের জিনিসপত্র কিনতে। এখানে না এসে এস্টিমেট ঠিক না করে তো আগে থেকে জিনিসপত্র কিনেআনতে পারিনে!

—সে কবে?

—কাল রাত পোয়ালেই। ভালই হয়েছে তুমি এসেচ। আমার কাজের দিন তোমাকেপেয়ে আমার সাহস হচ্চে। দেখার কেউ নেই—তুমি দেখেশুনে যাতে ভালভাবে সব মেটে, নিন্দে না হয় তার ব্যবস্থা করো।

—তুই এখানে এসেছিলি আরও, আমি চলে গেলে?

—হুঁ—কতবার এসেচি গিয়েচি

—আমার কথা মনে হোত?

—বাপরে! প্রথম যখন আসি তখন টিকতে পারিনে বাড়িতে। সেই যে আমি রাগ করেওপরে গেলাম, তার পরেই সকালে উঠে দেখি তুমি রাণাঘাটে চলে গিয়েচ—আর কোনোদিন দেখা হয়নি তারপর—সেই কথাই কেবল মনে পড়তো।

—আচ্ছা, কলকাতায় থাকলে আমার কথা মনে পড়ে?

—পড়ে না যে তা নয়, কিন্তু সত্যি বলতে গেলে কলকাতায় ভুলে থাকি পাঁচ কাজ নিয়ে। সেখানে তুমি কোনোদিন যাওনি, সেখানকার বাড়িঘরের সঙ্গে যাদের যোগ বেশি, তাদের কথাই মনে হয়। কিন্তু এখানে এলে-বাপরে! আচ্ছা চা খেয়ে একটু বাইরে গিয়ে দেখাশুনো করো, আমি এরপর তোমার সঙ্গে কথা বলব আবার। এখন বড় ব্যস্ত—

রাত্রে বিপিন পুরানো দিনের মতো রান্নাঘরে বসিয়া খাইল, পরিবেশন করিল মানী নিজে। আহারান্তে বাহির হইয়া আসিবার সময় বিপিন দেখিল, মানী কখন আসিয়া সেই জানালাটিতে দাঁড়াইয়াছে। হাসিমুখে বলিল—ও বিপিনদা!

সাধে কি বিপিনের মনে হয়, মানীর সঙ্গে তাহার পরিচিত আর কোনো মেয়ের তুলনাহয় না! আর কোন মেয়ে তাহার মন বুঝিয়া এ রকম করিত? মানীর সঙ্গে ইহা লইয়া কোনোকথাই তো হয় নাই এ পর্যন্ত, অথচ সে কি করিয়া বুঝিল, বিপিনের মন কি চায়!

বিপিন হাসিয়া জবাব দিল—ও, মানী!

মনে পড়ে?

—সব পড়ে।

—ঠিক?

—নিশ্চয়। নইলে কি করে বুঝলুম! বাবা, তুমি অন্তর্যামী মেয়েমানুষ।

মানী জিব বাহির করিয়া দুই চোখ বুজিয়া মুখ ভ্যাঙ্গাইল।

—সত্যি মানী, তোর তুলনা নেই!

—সত্যি ?

—নির্ভুল সত্যি।

—কখনও ভেবেছিলে বিপিনদা, এমন হবে আমার?

—স্বপ্নেও না! কিন্তু মানী, তোর সঙ্গে আমার কথা আছে, কখন হবে?

—বাইরের ঘরে গিয়ে বসো। আমি পান নিয়ে যাচ্চি।

একটু পরেই মানী বৈঠকখানায় ঢুকিয়া চৌকির উপর পানের ডিবাটি রাখিয়া কবাট ধরিয়াদাঁড়াইল। বলিল—তুমি এখন কি করচো, কোথায় আচ ভাল করে বলো। সেদিন কিছুই শুনিনি, সেদিন কি আমার ওসব শোনবার মন ছিল বিপিনদা—কতকাল পরে দেখা বলো তো?

বিপিন তাহার ডাক্তারি জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিয়া গেল। সোনাতনপুরের দত্তবাড়ির কথা, শান্তির কথা, মনোরমাকে সাপে কামড়ানোর কথা।

রাত হইয়াছে। ইতিমধ্যে দু'বার মানী বাড়ির মধ্যে গেল মায়ের ডাকে, আবার ফিরিল।সব কথা শুনিয়া বলিল—বিপিনদা, তুমি আমার চিঠি একখানা পেয়েছিলে একবার ?

—নিশ্চয়।

—ওই সময়টা আমার মন বড্ড খারাপ হয়েছিল পুরানো কথা ভেবে। তাই চিঠিখানা লিখেছিলুম। আমার কথা ভাবতে? সত্যি বলো তো—

—সর্বদাই। বেশি করে একদিন মনে পড়েছিল, সে দিনটির কথা বলি। তারপরজেয়ালা-বল্লভপুরের বিলের ধারের সেই রাত্রির ব্যাপার বিপিন বলিল। মতি বাগ্‌দিনীরসর্বত্যাগী প্রেমের কথা, তাহার অতীব দুঃখজনক মৃত্যুর কথা।

সব শুনিয়া মানী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—অদ্ভুত।

—তোকে বলব বলে সেইদিনই ভেবেছি। তোর কথাই মনে হয়েছিল সকলের আগেসেদিন।

—আচ্ছা, কেন এমন হয় বিপিনদা? দুঃখের সময় কেন এমন করে মনে পড়ে? সত্যি বলচি, তবে শোনো—আমার খোকা যখন মারা গেল, এক বছর বয়স হয়েছিল, আজ বাঁচলেতিন বছরেরটি হোত, রাত তিনটের সময় মারা গেল ভবানীপুরের বাড়িতে—একশোকান্নাকাটির মধ্যে তোমার কথা মনে পড়ল কেন আমার ?

—এ রোগের ওষুধ নেই মানী। কেন কি বলব!

—অথচ ভেবে দ্যাখো, সে সময় কি তোমার কথা মনে পড়বার সময়? তবে কেন মনেপড়ল?

তারপর দুজনেই চুপচাপ। নীরবতার ভাষা আরও গভীর হয়, নীরবতার বাণী অনেককথা বলে। কিছুক্ষণ পরে বিপিন বলিল—কাল সকালে আমি চলে যাব মানী। ডাক্তার লোক, রুগী ফেলে এসেচি—

—বেশ, আমি বাধা দেব না।

—তুই আমায় মানুষ করে দিয়েচিস মানী।

—শুনে সুখী হলুম।

—জানিস মানী, ওই যে তোর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি এখান থেকে চলে যাবার পরে, সেই দুঃখটা মনের মধ্যে বড় ছিল। আজ আর তা রইল না। সুতরাং চলে যাই।

—না, যেও না বিপিনদা। বাবার চতুর্থীর শ্রাদ্ধটা আমি করচি, থেকে যাও। একটুদেখাশুনা করতে হবে তোমাকে।

—তবে থাকি, তুই যা বলবি।

—তোমার সঙ্গে সেদিন যে বউটিকে দেখলুম, ও তোমার সঙ্গে বেড়ায় কেন?

—বেড়ায় না মানী। সিনেমা দেখতে এসেছিল সেদিন, শ্বশুর অন্ধ, তার কাছে কে থাকে, তাই ওর স্বামী সেখানে ছিল।

—মেয়েমানুষের চোখ এড়ানো বড় কঠিন বিপিনদা, ও মেয়েটি তোমায় ভালবাসে। —কে বললে?

—নইলে কক্ষনো তোমার সঙ্গে সিনেমা দেখতে আসতে চাইত না পাড়াগাঁয়ের বউ।তোমার বয়েসও বেশি নয় কিছু—আসতে পারতো না !

—ও!

—আমার কথা শোনো, তোমার স্বভাবচরিত্র ভাল না, ওর সঙ্গে আর মিশো না বেশি।

বিপিন হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—বেক্ষধম্মের লেকচার দিচ্ছিস যে! পাদ্রি সাহেব।

মানীও হাসিয়া ফেলিল! পুনরায় গম্ভীর হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—না, সত্যি বলচি, শোনো। ওকে কষ্ট দেবে কেন মিছিমিছি? ওর সঙ্গে মেলামেশা কোরো না—মেয়েমানুষ বড্ড কষ্ট পায়, মতি বাগ্‌দিনীর কথা ভাবো?

বিপিন বলিল—ধোপাখালিতে এক বুড়ি ছিল, সেও তোর সম্বন্ধে আমায় একথা বলেছিল।

—আমার সম্বন্ধে ? কে বুড়ি? ওমা, সে কি—শুনিনি তো কক্ষনো!

বিপিন সংক্ষেপে কামিনীর কাহিনী বলিয়া গেল।

মানী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ঠিক বলেছিল বিপিনদা। এ কষ্ট সাধ করে কেউ যেন বরণ করে না। তবে কামিনী বুড়ি যখন বলেছিল, তখন আর উপায় ছিল কি?

—নাঃ!

—শান্তির সঙ্গে দেখাশুনো করবে না। সোনাতনপুর ওদের বাড়ি যদি ছাড়তে হয়, তাও করবে এজন্যে। বউদিদিকে নিয়ে যাও না, যেখানে থাকো সেখানে ?

—বেশ। তুমি শান্তির বরের একটা চাকরি করে দাও না কলকাতায়। বড় ভাল ছেলেটি। শান্তির একটা উপায় করো অন্তত।

—চেষ্টা করব। ওঁকে বলে দেখি—হয়ে যেতে পারে।

—জানিস মানী, শান্তির তোকে বড্ড ভাল লেগেছে। ও এখানে আসতে চাচ্ছিল।

—সে আমার জন্যে নয় বিপিনদা। সে তোমার জন্যে—তোমার সঙ্গ পাবে এই জন্যে।ওসব আর আমায় শেখাতে হবে না। আমি মনকে বোঝাচ্ছি, তোমার সঙ্গে কাল শ্রাদ্ধেরকথাবার্তা বলতে এসেচি—কিন্তু তাই কি এসেচি? এতক্ষণ বসে তোমার সঙ্গে বক্‌বক্ করচি কিসেই জন্যে?

পরদিন সকাল হইতে কাজকর্মের খুব ভিড়। জমিদারের বড় মেয়ে বড় মানুষের বউ, খুবজাঁক করিয়াই চতুর্থীর শ্রাদ্ধ হইবে। বিপিন খাটিতে লাগিয়া গেল সকাল হইতেই। আশেপাশের অনেকগুলি গ্রামের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত। লোকজনের কোলাহলে বাড়ি সরগরম হইয়া উঠিল।

মানী একবার বলিল—আহা, শান্তিকে আনলে হোত বিপিনদা! নিজে মুখ ফুটেবলেছিলো, আনলে না কেন, সব তোমার দোষ।

—না এনেই অত মুখনাড়া শুনলাম, আনলে কি আর রক্ষে ছিল?

—কীর্তনের দল আনতে রাণাঘাটে গাড়ি যাচ্চে, তুমি গিয়ে ওই গাড়িতে তাকে নিয়েআসবে?

—সে উচিত হয় না, মানী। অন্ধ শ্বশুর দু'দিন পড়ে থাকবে কার কাছে? থাকগে ওসব।

ধোপাখালির অনেক প্রজা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া সকলেই খুবখুশি। নরহরি দাসও আসিয়াছিল, সে বিপিনকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল— লায়েববাবুযে! অনেক দিনের পর আপনার সঙ্গে দ্যাখা—ভাল আছেন? আপনি চলে যাবার পর ধোপাখালি অনুপায় হয়ে গিয়েচে বাবু। সবাই আপনার কথা বলে।

বিপিন তাহার কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিল। বলিল—হ্যাঁরে, তোদের গাঁয়ে ডাক্তারিচলে? আমি আজকাল ডাক্তারি করি কিনা?

নরহরি দাস বলিল—আসুন, এখখুনি আসুন বাবু। ডাক্তারের যে কি কষ্ট, তা তোনিজের চোখে তুমি দেখেই এসেচ। আপনারে পেলি লোকে আর কোথাও যাবে না। ওষুধখেয়েই মরবে।

সারাদিন বিপিন বাহিরের কাজকর্মের ভিড়ে ব্যস্ত রহিল। মানীর সঙ্গে দেখাশুনা হইল না। অনেক রাত্রে যখন কীর্তন বসিয়াছে, তখন মানী আসিয়া বলিল—বিপিনদা, খাবে এসো, রান্নাঘরে জায়গা করেচি।

রান্নাঘরের দাওয়ায় মানী নিজের হাতে তাহার পাতে লুচি তরকারি পরিবেশন করিতেকরিতে বলিল—আমি জানি তুমি সারাদিন খাওনি, পেটভরে খাও এখন।

বিপিন বিস্মিত হইয়া বলিল—তুই কি করে জানলি?

—আমি সব জানি।

সাধে কি বলি, অন্তর্যামী মেয়েরা?

—নাও, এখন ভাল করে খাও দিকি। বাজে কথা রাখো। দই আর ক্ষীর নিয়ে আসি —তুমি ক্ষীর ভালবাসতে খুব।

আরও ঘণ্টা দুই পরে নিমন্ত্রিতদের আহারের পর্ব মিটিল। বাড়ি অনেক নিস্তব্ধ হইল।

বাহিরের উঠানে কীর্তনসভা ভঙ্গ হইল।

বিপিন মানীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া বলিল—মানী, কীর্তনের দল গাড়ি করে রাণাঘাটযাচ্চে, আমি ওই সঙ্গে চলে যাই!

—তাই যাবে? বেশ যাও। যা কিন্তু বলে দিয়েছি, মনে থাকবে?

—নিশ্চয়। তুই যা বলবি, তাই করব।

—শান্তির সঙ্গে আর মিশবে না, ও ছেলেমানুষ,—তার ওপর অজ পাড়াগাঁয়ের মেয়ে।

—মানী, সে কথা আমিও ভেবেছিলুম বহুদিন আগেই। তবে চালাবার লোক না পাওয়াগেলে আমাদের মতো লোকে সব সময় ঠিক পথে চলে না। এবার থেকে সে ভুল আর হবেনা। আমি ভাবছি, ধোপাখালিতে যদি ডাক্তারি করি তবে কেমন হয়?

—সত্যি ভেবেছ বিপিনদা? খুব ভাল হয়। তুমি ওখানে নায়েব ছিলে, সবাই চেনে, বেশ চলবে। ওদিকে ছেড়ে দিয়ে এদিকে এসো।

—তোর সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে মানী?

মানী হাসিয়া বলিল—আর জন্মে! এ জন্মে যাদের ওপর যা কর্তব্য আছে, করে যাই বিপিনদা।

বিপিন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—বেশ, ভুল হবে না?

মানী হাসিতে হাসিতে বলিল,—আবার ভুল? আমি নির্বোধ, এ অপবাদ অন্তত তুমিআমায় দিয়ো না বিপিনদা। দাঁড়াও, প্রণামটা করি।

তারপর মানী গলায় আঁচল দিয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া বলিল—আমার আর একটা কথারেখো। যেখানেই থাকো, বউদিদিকে নিয়ে এসো সেখানে। অমন করে কষ্ট দিয়ো নাসতীলক্ষ্মী মেয়েকে। যদি সাপের কামড়ে মারাই যেতেন, সে কষ্ট জীবনে কখনও দূর হোতভেবেছ?

বিপিন বিদায় লইয়া গরুরগাড়িতে উঠিতে যাইবে, মানী পিছন হইতে ডাকিল—শোনো বিপিনদা!

—কি রে? মানী কথা বলে না। বিপিন দেখিল, তাহার চোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

—মানী! ছিঃ লক্ষ্মীটি—আসি।

মানী তখন কথা বলিল না। বিপিনও আধ-মিনিট চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল মানীরসামনে। তারপরে মানী চোখ মুছিয়া বলিল—আচ্ছা এসো, বিপিনদা।

গরুরগাড়ি ছাড়িল। অনেকখানি রাস্তা—মেঠো নির্জন পথ, কৃষ্ণপক্ষের ভাঙ্গা চাঁদেরজ্যোৎস্নায় মেটে পথের ধারের গ্রাম্য বাঁশবন, ক্বচ্চিৎ কোনো আমবাগান কিংবা বেগুন- পটলেরক্ষেত, আখের ক্ষেত, অস্পষ্ট ও অদ্ভুত দেখাইতেছে। বিপিনের মনে অন্য কোনো জগতের অস্তিত্ব নাই—কোথায় সে চলিয়াছে—এই আনন্দ ও বিষাদের আলোছায়া-ঘেরা পথে কত দূর-দূরান্তের উদ্দেশে তার যাত্রা যেন সীমাহীন লক্ষ্যহীন—সে চলার বিজন পথে না আছেশান্তি, না আছে মনোরমা। কেহ নাই, সেখানে সে একেবারে সম্পূর্ণ নিঃস্ব, সম্পূর্ণ একা। কিংবা যদি কেহ থাকে, মনের গহন গভীর গোপন তলায় যদি কেহ থাকে, ঘুমাইয়া থাকুক সে, গভীরসুষুপ্তির মধ্যে নিজেকে লুকাইয়া রাখুক সে।

৬

রাণাঘাটে যখন গাড়ি পৌঁছিল, তখন বেশ রোদ উঠিয়াছে।

শান্তি তাহাকে দেখিয়া বলিল—একি চেহারা হয়েছে আপনার ডাক্তারবাবু? রাতে ঘুমহয়নি বুঝি? আর হবেই বা কি করে গরুরগাড়িতে—নেয়ে ফেলুন, আমি ঠাণ্ডা জল তুলে দিই।

দুপুরবেলা বিপিন চুপ করিয়া শুইয়া আছে, শান্তি ঘরে ঢুকিয়া বলিল—ওবেলা চলুন আর একবার টকি ছবি দেখে আসি—আর তো চলে যাচ্ছি দু-তিন দিনের মধ্যে। হয়তো আর দেখা হবে না।

—গোপাল ছবি দেখেছিল ?

—উঃ, দু'দিন! আপনি যেদিন যান, আর যেদিন আসেন।

চলো যাই।

শান্তি খুশি হইয়া সকাল সকাল সাজিয়া-গুজিয়া তৈয়ারি হইল। বিপিন বেলা তিনটার সময় তাহাকে লইয়া বাহির হইল, কারণ বিপিনের ইচ্ছা সন্ধ্যার পূর্বেই সে শান্তিকে বাসায় ফিরাইয়া আনিবে, নতুবা শান্তির শ্বশুরের খাওয়া-দাওয়ার বড় অসুবিধা হয়।

ছবি দেখিতে বসিয়া শান্তি অত্যন্ত খুশি। আজকার ছবিতে ভাল গান ছিল, সে ও ধরনেরগান কখনও শোনে নাই—মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল।

ইন্টারভ্যালের সময়ে বলিল—চলুন বাইরে, চা খাবেন না?

তাহার ধারণা ছবিতে যাহারা আসে, তাহাদের চা খাইতেই হয় এবং চা খাওয়ার জন্যছুটি দেওয়া হইয়াছে। শান্তি আবদারের সুরে বলিল—আমি কিন্তু পয়সা দেব আজও!

বিপিন হাসিয়া বলিল—পয়সা ছড়াবার ইচ্ছে হয়েচে? বেশ ছড়াও—

শান্তি লজ্জিত হইল দেখিয়া বিপিন বলিল—না না, কিছু মনে কোরো না শান্তি, এমনিবল্লুম। আমি তোমাকে কিন্তু কোনো একটা জিনিস খাওয়াব—কি খাবে বলো?

শান্তি বালিকার মতো আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওই যে কাচের বোয়েমে রয়েচে, ওকে কি বলে—কেক?...বেশ, ওই কেক নিন তবে আপনার জন্যেও নিন—

সিনেমার পরে শান্তি বলিল—চলুন, একটু ইস্টিশানে বেড়িয়ে যাই। আর তো দেখতে পাব না ওসব—চলে যাচ্চি পরশু!

ডাউন প্ল্যাটফর্মে একখানা বেঞ্চির উপরে নিজে বসিয়া বলিল—বসুন এখানে।

বিপিন বসিল।

—একটা সিগারেটের বাক্স কিনে আনুন, আমি পয়সা দিচ্চি।

—না, তুমি কেন দেবে?

—আপনার পায়ে পড়ি—ক'টা আর পয়সা, দিই না কিনে!

সে এমন মিনতির সুরে বলিল যে, বিপিন তাহার অনুরোধ ঠেলিতে পারিল না।

সিগারেট টানিতে টানিতে বিপিন শান্তির নানা প্রশ্নের জবাব দিতে লাগিল—এ লাইন কোথায়গিয়াছে, ও লাইন কোথায় গিয়াছে, সিগন্যালে লাল আলো সবুজ আলো কেন, কি করিয়াআলো বদলায় ইত্যাদি।

আধঘণ্টা বসিবার পরে বিপিন বলিল—চল আমরা যাই—দেরি হয়ে গেল।

—বসুন না আর একটু—আচ্ছা, আপনাকে একটা কথা জিগ্যেস করি—

—কি ?

—আমার জন্যে আপনার মন-কেমন করে একটুও?

বিপিন বড় মুশকিলে পড়িল, এ কথার জবাব কি ধরনে দেওয়া যায়! শান্তি আরওকয়েকবার এভাবে প্রশ্ন করিয়াছে ইতিপূর্বে।

সে ইতস্তত করিয়া বলিল—তা করে বই কি-বিদেশে থাকি, তোমার মতো যত্ন—

—ওসব বাজে কথা। ঠিক কথার জবাব দিন তো দিন—নইলে থাক।

—এ কথা কেন শান্তি ?

—আছে দরকার।

করে বই কি?

—ঠিক বলছেন?

—ঠিক।

শান্তি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—চলুন যাই। রাত হয়ে যাচ্ছে।

বাসায় ফিরিয়া আহারাদির পরে অনেক রাত্রে বিপিন শুইল।

মাঝরাতে একবার কিসের শব্দে তাহার ঘুম ভাঙিল। বাহিরের রোয়াকে কিসের শব্দ হইতেছে! বিপিন জানালা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, শান্তি রোয়াকের পৈঠায় বাঁশের আলনার খুঁটি হেলান দিয়া একা বসিয়া আছে; এবং শুধু বসিয়া আছে নয়, বিপিনের মনে হইল, সে হাপুসনয়নে কাঁদিতেছে—কারণ রোয়াকের পৈঠা বিপিনের ঘরের জানালার ঠিক কোনাকুনি।

বিপিন নিঃশব্দে জানালা হইতে সরিয়া গেল। শান্তি কেন কাঁদে এত রাত্রে ? তাহাকে কিদোর খুলিয়া ডাকিয়া শান্ত করিবে? তাহাতে শান্তি লজ্জা পাইবে হয়তো—যে লুকাইয়া কাঁদিতেচায়, তাহাকে প্রকাশের লজ্জা দেওয়া কেন?

বিপিনের আর ঘুম হইল না।

হয়তো ভোরের দিকে একটু তন্দ্রা আসিয়া থাকিবে, গোপালের ডাকে তাহার ঘুমভাঙিল। শান্তি চা লইয়া আসিল, সে সদ্য স্নান করিয়াছে, পিঠের উপর ভিজা চুলটি এলানো, মুখে চোখে রাত্রিজাগরণের কোনো চিহ্ন নাই। হাসিমুখে বলিল—উঃ, এত বেলা পর্যন্ত ঘুম! কতক্ষণ থেকে থেকে শেষে ওকে বললুম ডেকে দিতে!

অদ্ভুত মেয়ে বটে শান্তি। বিপিনের মন দুঃখ, সহানুভূতি ও স্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল। সেবুঝিয়া ফেলিয়াছে অর্ধেক কথা।

শান্তিকে আর সে দেখা দিবে না। এইবারই শেষ।

মানী বুদ্ধিমতী মেয়ে সে ঠিকই বলিয়াছিল।

ডাক্তারি চলুক না চলুক, সোনাতনপুরের নিকট হইতে তাহাকে চিরবিদায় গ্রহণ করিতেহইবে। হয় ধোপাখালি, নয় যে কোনো স্থানে কিন্তু সোনাতনপুরে বা পিপলিপাড়ায় আর নয়। মানীর কথা সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে।

পরদিন দুপুরের পর সকলে দুইখানি গরুরগাড়িতে করিয়া রাণাঘাট হইতে রওনা হইয়াগ্রামের দিকে ফিরিল। কাপাসপুরের মধ্য দিয়া পূর্ব দিকে তাহাদের নিজেদের গ্রামের পথ বাহিরহইয়া গিয়াছে—রাণাঘাট হইতে ক্রোশ চার পাঁচ দূরে। এই পর্যন্ত আসিয়া বিপিন বলিল—

আপনারা যান তবে, আমি অনেকদিন বাড়ি যাইনি, একবার বাড়ি হয়ে যাব। সামান্য পথ, হেঁটেযাব।

শান্তি বলিল—কেন ডাক্তারবাবু, আমাদের ওখানে আসুন আজ। তারপর না হয় কালবাড়ি আসবেন!

বিপিন রাজি হইল না। বাড়ির সংবাদ না পাইয়া মন খারাপ আছে, বাড়ি যাইতে হইবেই। বিপিন বুঝিল, শান্তি দুঃখিত হইল।

কিন্তু উপায় নাই, শান্তিকে বড় দুঃখ হইতে বাঁচাইবার জন্য এ দুঃখ তাহাকে দিতে হইবেই যে!

শান্তি গাড়ি হইতে নামিয়া বিপিনকে প্রণাম করিল, গোপালও করিল। উহাদের বংশের নিয়ম, ব্রাহ্মণের উপর যথেষ্ট ভক্তি চিরদিন।

একটা বড় পুষ্পিত শিমুলগাছতলায় গাড়ি দাঁড়াইয়া আছে, শান্তি গাছের গুঁড়ির কাছেদাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে, গোপাল বৃদ্ধ বাপের হাত ধরিয়া নামাইয়াবিপিনের পরিত্যক্ত গাড়িখানায় উঠাইতেছে, ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষত শান্তির সম্বন্ধে এইছবিই বিপিনের স্মৃতিপটের বড় উজ্জ্বল, বড় স্পষ্ট, বড় করুণ ছবি। সেইজন্য ছবিটা অনেকদিনতাহার মনে ছিল।